সমরেশ বসু

প্রজাপতি



প্রজাপতি

সমরেশ বসু

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশক ❑
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশকাল ❑
২ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

❑ প্রচ্ছদ ❑
শেখর মণ্ডল, কলকাতা-৬

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রণ ❑
পূর্ণিমা প্রিন্টার্স
টি/২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৬৭

প্রজাপতি



'মেরো না, পায়ে পড়ি— ।'

'মারব না। স্‌সা— !'

'তবে রুমালটা দিয়ে ওরকম ঝাপ্‌টা মারছ কেন। মরে যাবে যে।'

'আরে না, মরবে না। ওকে পেড়ে ফেলব শুধু। আয়, আয়, স্‌সা— ।'

'আহ্‌, উহ্‌, ইস্‌ ! গেল, গেল এবার। এত সুন্দর প্রজাপতিটা.... ।'

'হ্যাঁ, পাশের বাড়ির চিনু যে রকম কালো বোম্বাই প্রিণ্ট শাড়িটা পরে, ঠিক— ।'

'তোমার মাথা ! কী রকম চক্‌চক্‌ করছে দেখছ, বেনারসী সিল্ক নীলাম্বরী হলে যেরকম হয়, ঠিক সেরকম রঙ। তার ওপরে রুপোলী ছাপের বুটি। কী সুন্দর। দোহাই— ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সেই রুপোলী বুটি বেনারসী নীলাম্বরীটার মত, তাই না ? কে যেন প্রেজেণ্ট করেছিল ?'

'দাদা। কিন্তু— ।'

'কোন্‌ দাদা ? আহ্‌, এইবার।'

'ইস্‌, গেল গেল !'

'যাত্তেরি, কেটে পড়ল। কোন্‌ দাদা, বললে না ?'

'কোন্‌ দাদা আবার, যে-দুই দাদা আছে।'

'ওরা তো, মায়ের পেটের বোনটিকে বেনারসী সিল্ক কিনে দেয় না। ওরা তো লাফাঙ্গা।'

'সেটা আবার কী !'

'যার ফেমিনিন জেণ্ডার লাফাঙ্গী। হেই স্‌সা— !'

'তার মানে কী ?'

'যাদের বাটপাড়ের ভয় নেই।'

'তার মানে, ল্যাঙটা ?'

'স্‌সুনটি আমার ! বুঝতে পেরেছ দেখছি। হুই স্‌সা— ।

'অসভ্য ! আচ্ছা, দাদাদের তুমি ওরকম বল কেন।'
'বলি— ।'
'আহ্ ইস্, মরেছে ?'
'নাঃ পারিনি। প্রজাপতিটা খচ্চর আছে, ওই কড়িকাঠের কাছে উঠে গেছে। তোমার সেই শাড়িটার দাম বেশী, তাই বলছিলাম। কে দিয়েছে, বললে না ? তোমার কেশবদা নাকি ?'
'যাঃ।'
'তবে, ঘুরঘুরে পাকা, সেই র‍্যাশন ইনিস্‌পেকটা তোমার অনিলদা ?'
'কী যে যা তা বল-না, ওরা দেবে কেন। কিন্তু ও কি, ও কি করছ ?'
'কী করছি।'
'পালকের ঝাড়নটা নিলে কেন ?'
'তা নইলে ওটাকে কাবু করতে পারছি না।'
'ছেড়ে দাও না, আহ্ ! কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে তোমাকে।'
'কেন ?'
'তোমার চোখগুলো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, খুনীর মত।'
'তা হবে। এই, এই, মার্ স্‌সা— ।'
'আহ্—উহ্ !'
'তবু হল না।'
'তুমি ঘেমে উঠেছ।'
'তা উঠেছি।'
'তার উপরে তোমার ওই দোনলা পাইপ প্যাণ্ট— !'
'স্‌লা একে কাপটি, তায় এখন ঘামে জেবড়ে গেছে। যেন পা টেনে ধরছে মাইরি।'
'ব্লাউজের মত বিচ্ছিরি সার্টটাও তো গায়ে লেপটে গেছে। এবার ক্ষান্ত দাও না।'
'দেবো, ধরি আগে। প্রজাপতিটা মদ্দা না মাদী বল তো ?'
'তা আবার বোঝা যায় নাকি। আহা, বেশ হয়েছে এবার, কড়িকাঠে গিয়ে চুপ করে বসে আছে।'
'বসাচ্ছি। এটার ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মাদী। জব্বর খাটাচ্ছে। খুব হাততালি দিচ্ছ, না ?'
'দেবই তো—কিন্তু ও কি, ও কি করছ সুখেনদা।'
'দেশলাই ছুঁড়ে মারছি। ওড়াবো ওকে, তবে—এইবার ! উড়েছে। আয় আয়… ।'
'আহ্ কী করছ, দিদি জামাইবাবুর বিয়ের ছবিটা দেয়াল থেকে পড়ে যাবে যে।'
'পড়বে না। তাছাড়া তোমার দিদি জামাইবাবুর তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু এটা নির্ঘাত মাদী, দেখছ, লাল লাল ফুটকিও রয়েছে।'

তোমার মুণ্ডু। ওটা মোটেই লাল না, মেজেণ্টা। কিন্তু ছবিটা তুমি ঠিক ভাঙবে।'

'না। আহ্ এবার, স্‌সা ঝেড়েছি কিন্তু— !'

'ইস্, ছি, কী করলে বল তো। একদিকের পুরো পালকটা খসিয়ে দিলে ?'

'কী করব, ওর ফরফরানির জন্যেই তো। কিন্তু দেখেছ, একটা পালকেই এখনো ওড়বার চেষ্টা করছে !'

'ছি ছি, তুমি জান প্রজাপতি মারতে নেই !'

'কী হয় ?'

'ওরা বিয়ের দেবতা না ?'

'সেই যে নেমন্তন্নর চিঠিতে লেখা থাকে, প্রজাপতয়ে নমঃ।'

শিখা কোন জবাব দিল না। এক ডানা ভাঙা প্রজাপতিটা তখন দেওয়াল ঘেঁষটে নিচে পড়ছে। শিখার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ও তখন আমার দিকেই চেয়ে রয়েছে। ঠোঁট দুটো ফোলানো, যেমন রাগ বা অভিমান করলে হয়। চোখের চাউনিও সেই রকম, একটু বাঁক খাওয়া। কালো তারা দুটো যেন একটু বেঁকে গেছে। আর সকালবেলাই কাজল পরেছে। ঠিক মনে হয়, সিনেমা সিনেমা। ভাল লাগে বেশ দেখতে।

কিন্তু আবার মনে হয়, এটা সত্যি না। সত্যি কি প্রজাপতিটার জন্যে ওর কষ্ট হচ্ছে। মনে হয় না। মনে হয়, ও যেন দেয়লা করছে। সিনেমা সিনেমা ভাব। এতক্ষণ বলে বলে, এইরকম করতে হয়। অথচ ওকে দেখে মনে হচ্ছে, প্রজাপতিটাকে বাঁচাবার জন্যে ও-ও লড়ছিল। সেই রকমই কি মনে হচ্ছে না, ওর গোলাপী আঁচল খসা দেখে। চুলের আলগা খোঁপা খুলে পড়েছে। আর ডোরা কাটা কাটা ব্লাউজটা তো দারুণ—ভাবলেই নিজের হাতটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

খেতে হবে না। দু' হাত পাইপ প্যাণ্টুলের পকেটেই পুরে দিই। কিন্তু, সত্যি, ওর ব্লাউজের নীল, লাল, হলদে রঙের ডোরাগুলো কাঁধের কাছ থেকে নামতে নামতে এমন ঠেলে উঠেছে, অদ্ভুত ! আর কেমন, উঠেছে যেন ঢেউ দিয়ে, নেমেছে গোল হয়ে। বুকের দু' দিকের কোন দিকেই কাপড় নেই। বোতাম পটিতে বোতাম নেই, ঠিক উচ্চিংড়ের মত দুটো সেফটিপিন লাগানো। যেন চেয়ে আছে। গোটা আঁচলটা বাঁ হাতের ওপরে। ব্লাউজের নিচে কটা কটা রঙের পেটটা খোলা। কিন্তু কসম খেয়ে বলতে পারি, ব্লাউজের নিচে ও আর কিছু পরেনি। পরলে ঠিক বোঝা যেত ! আর ওগুলো পরলেই আসল জিনিস সব এমন ঠাস বুনোট খোঁচা পাথরের মতন লাগে—বিচ্ছিরি !

তবে এটাও ঠিক, শিখার আছে। এদিক ওদিক করে যা-ই খাক, শরীরটা বেশ ভাল আছে। ওকে দেখলে কেন জানি না, ভোরবেলার তাজা শিশির পড়া কপি পাতার মতন লাগে। ঠিক সেই রকম ডাঁটো, একটু একটু পাউডার লাগানো, আর নরম। ওরকম পাতার চচ্চড়ি যে খেয়েছে,

সে-ই জানে কেমন লাগে। একটুও ছিবড়ে হয় না, সবটুকু খেয়ে ফেলা যায়!

ওকে সেই রকম লাগছে। আরো লাগছে এখন শুধু জামাটা পরেছে বলেই। ডোরাকাটা জামাটার কেমন টলটলে আলগা আলগা ভাব—ভাবলে মনে হয় হাতের মাথা খেয়ে ফেলি। কেননা, বোঁটা ছেঁড়া বেল কুঁড়ির কথাও মনে পড়ছে। কিন্তু ও এত এলোমেলো হয়ে পড়েছে, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে আর ঘেমে উঠেছে, যেন প্রজাপতিটাকে বাঁচাবার জন্যে ও-ও লড়ছিল।

পকেটে হাত দুটো থাবড়ে থাবড়ে, গোড়ালির নালি দিয়ে একটু হাওয়া ঢোকাতে চাইলাম: উরে স্‌সা—কী গরম লাগছে। একটা প্রজাপতি ধরতে হাঁপিয়ে গিয়েছি।

শিখা দেওয়ালের কাছে সরে গিয়ে, ডানা ভাঙা প্রজাপতিটাকে দুই আঙুলে তুলে নিল। আর একটু দূর থেকে ভাঙা ডানাটা কুড়িয়ে আনল। কীরে বাবা, প্রজাপতিটার কি মরণ নেই! শরীরের সঙ্গে লাগানো ডানাটা এখনো নাড়িয়ে চলেছে। উড়তে চায় নাকি। কোথায় যেতে চায়, বিয়ে করতে? তা তো না, প্রজাপতি হল—কী যেন বলে, এই স্‌সা-প্রজাপতি-প্রজাপতি—হ্যাঁ "প্রজাপতির সনির্বন্ধে" বলে। কী তার অর্থ, কে জানে। মোটের ওপর প্রজাপতি বিয়ে দেয়। তাহলে বিয়ে দিতে যেতে চায় বোধ হয়।

কিন্তু না, আমি ওটাকে সত্যি মারতে চাইনি। ধরতে চেয়েছিলাম! ধরতে গিয়ে মারলাম—মারলাম মানে, নিজেই মরলো। এত ফরফর করবার কী ছিল, ছেউটি ছুঁড়ির মত। যেন গায়ে হাত দিতে গেলেই সুড়সুড়ি লেগে যায়, কাতুকুতু লাগে, আর এঁকেবেঁকে ছটফটিয়ে মরে। তখন কোথায় লাগতে কোথায় লাগে, পাঁজরায় না বুকে। তারপরে নাও, 'উহ্ সুখেনদা, নিশ্বাস ফেলতে পারছি না, কী রকম লাগিয়ে দিলে।' স্‌সা—যত্‌তো ঝামেলা। সেই যেমন হল একবার, পিকনিকে যাওয়া হল, এখানকারই একটা কারখানা স্টাফের সঙ্গে। কারখানার স্টাফ মানে, মজুর বা কেরানী না, সব বিলকুল সাহেব, সবাই ইংরেজীতে—ইংরেজীতে না, স্‌সা ইনজিরিতে কথা বলে, 'বাউ' মারে, রপোর্ট কত! থাকে সব কোম্পানীর পাঁচিল ঘেরা কোয়ার্টারের মধ্যে। রঙীন মোজাইক টাইলস্-এর মেঝে, প্লাস্টিক পেইন্ট দেয়াল। সব মাথা-ভারি পোস্টের লোক থাকে সেখানে, তারা সবাই সাহেব, বউয়েরা মেমসাব, মেয়েরা মিসিবাবা, ছেলেরা সব বাবা। সব বাঙালীর বাঙ্ আর ইংরেজের রেজ—যাকে বলে বাঙ্‌রেজ।

আমাকে কি আর ওদের পিকনিকে নিয়ে যাবার কথা। না কি, কোয়ার্টারে গিয়ে যে মাঝে মধ্যে দিলালি করে আসি, তা ওদের খুব ভাল লাগে। মোটেই না। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে মরে, তার নামই হাসি। চোখের নজর দেখলেই বোঝা যায়, মনে মনে কী গালাগাল দেয়। এত খারাপ যে,

আমিও বোধহয় লজ্জা পেয়ে যাব। তবু আমাকে খাতির করতে হয়। আমার নাম সুখেন, সুখেন্দু—সুখ যুক্ত ইন্দু, স্‌সুখেন্দু—বাপের নাম ভুলে যাবে সব, এমন নাম শুনলে। এর পরে কেউ বলবে না, আমি ব্যাকরণ জানি না। আমি সুখচাঁদ। অবিশ্যি সবাই বলে সুখেন গুণ্ডা। সামনে না, আড়ালে। জানে সবাই। কারখানার স্টাফ, ম্যানেজার বল, লেবার এ্যাটভাইসার বল, সিকিউরিটি অফিসার বল, তারাও তা-ই জানে। আর সেইজন্যেই খাতির করে। তবে কিনা, আমি তো আসলে ভদ্দর লোকেরই ছেলে, সেইজন্যে একেবার গুণ্ডার মত দেখে না। তেতোর ওপরে একটু মিঠে পলেস্তারা, যেন সামাজিক মেলামেশা।

তা তো দেখাতেই হবে। আমার না হয় ঢাক ঢাক গুর গুর নেই, দু' কান কাটা। ওদের তো আর তা না। এই শহরের একটা গুণ্ডার সঙ্গে ওরা কি করে মেলামেশা করবে। ওরা যেন জানেই না, আমি কে, আমি কী। ভাবখানা, আমি একটা তাজা প্রাণের দুঃসাহসী যুবক। এ ডেয়ার ডেভিল নাইস্‌ ইয়ংম্যান। একথা বলে আবার চোপরা, কারখানার ম্যানেজার। লেবার এ্যাডভাইসার মিত্তিরও বলে। স্‌সালা, এখন হাসি পায়, রাম খিস্তি করতে ইচ্ছা করে। তার ওপরে আবার যখন দেখি, ওদের বউয়েরাও ওরকম বলে। তোদের কত্তারা বলে, তার না হয় কারণ আছে। তোরা কেন বলিস। কুটকুটুনি, না ? সত্যি, দেখলে মেয়েলোক বলতে ইচ্ছা করে না, মাগী বলতে ইচ্ছা করে। আর মনে হয়, মাগীগুলোর কস্মিনকালে গা ঘামে না, গায়ে পোকা। খাওয়া আছে, খাটুনি নেই। নরম নরম বিছানায় খালি থলথলিয়ে চিত্তির দিয়ে পড়ে থাকা।

তাছাড়া খাটাবে বা কে, সে রকম পুরুষই বা কে আছে। চোপরা বল, মিত্তির বল, ওরা তো আর মানুষ নেই। ওরা কেবল ম্যানেজার আর লেবার এ্যাডভাইসার। ওতে মেয়েমানুষ ম্যানেজ করা যায় না, লেবার করানোও যায় না। তা-ই দেখ গিয়ে, মেমসাবেরা শেদে যাওয়া চুলে কালো রঙ মেখে, বুক থেকে কপাল অবধি রঙ পালিশ দিয়ে, কাতলা মাছের পেটিওয়ালা বুক, নিজের মেয়েটির মত বানিয়ে, খাই-খাই করে বেড়াচ্ছে। 'হ্যালো সুখেন' 'ও সুখেন'—যেন সুখেন ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। সুখেন তোমাদের পীরিতের ইয়ে। ঠিক সময়ে বিয়োলে সুখেনের থেকে বড় ছেলে তোমাদের হত, সে খেয়াল নেই। চোপরার বউটা আবার বলে, আমি নাকি 'হ্যাণ্ডসাম'। মিত্তিরের বউটা গায়ে আঙুল টিপে বলে, 'তোমার শরীরটা সাংঘাতিক শক্ত, গড়নটাও সুন্দর।' আরে, ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ারের বউটা পর্যন্ত, যার চুল দাঁত কিছুই বোধ হয় আসল না, চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'তোমার চুলগুলো সুন্দর কোঁচকানো, হিরোদের মত।' স্‌সা— ! তোরা কেন, ওসব বলবে তোদের মেয়েরা। তবে জানি, মায়েরা যা বলে মেয়েরা মনে মনে তা-ই গুন গুন করে, চোখে মুখে সান্‌ সান্‌ মারে।

আসলে ওদের কত্তারা তো ভাবে, আমি একটা কাঁচা-খেকো হাউণ্ড।

তারই নাম ডেয়ার ডেভিল নাইস ইয়ংম্যান। জানে, এই গোটা মফস্বল টাউনটা, আমার হাতের কবজায়। দরকার হলে, এক কথায় আগুন লাগিয়ে দিতে পারি। রক্তে ভাসিয়ে দিতে পারি। তা-ই ভয়ে ভক্তি, ভরসাও। একটু হাতে-টাতে রাখতে চায়। তার জন্যেই খাতির বেরাদারি, আদতে পোষা কুকুরের ওপর নেক নজর। কিন্তু ওরাও জানে না—না না, জানে ঠিকই, ওদের আমি এক একটা শুয়োরের বাচ্ছা ছাড়া কিছুই মনে করি না। আমি ভাবি, মেমসাবরা কী ভাবে। সেই কুকুরটাকে খেলায় আর আদর করে, না কী ? উরে স্‌সাহ্‌, আমার সেই ছবিটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সে-ই ইংরেজি খিস্তি' ছবির বইটা, যার মধ্যে, মেয়েমানুষ আর কুকুরের ছবি ছিল। কী কাণ্ড রে বাবা ! ঝকঝকে ছাপানো ছবি। ইংরেজীতে সব লেখা। নিশ্চয়ই প্রেসেই ছাপানো, লেখাপড়া জানা লোকদেরই লেখা। যারা কেনে, পড়ে, তারাও কিছু কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও জানে। নইলে পড়বে কেমন করে। শুধু কি কুকুর নাকি। এমন কোন জন্তু জানোয়ার নেই, যাদের সঙ্গে মেয়েমানুষের ছবি ছিল না। হাতী ঘোড়া ষাঁড়···স্‌সাহ্‌ অদ্ভুত কাণ্ড। কী করে ওসব ভাল লাগে, মজা পাওয়া যায়, আমি সত্যি বুঝি না। আমার তো মনে হয়, আমার সামনে কেউ ওরকম কাণ্ড করলে, আমি দুটোকেই পিটিয়ে মেরে ফেলব। জন্তুটাকে আগে মারব। তারপরে মেয়েমানুষটাকে।

আসলে ওসব সত্যি না। কেবল বদমাইসি। তবে, একবার মহাভারতে না কিসে পড়েছিলাম, অশ্বমেধের ঘোড়া যখন ফিরে আসে, অর্থাৎ জিতে ফিরে আসে, তখন তাকে বলি দেওয়া হয়। আর তারপরে, রাজার যে আসল রানী, পাটরানী, তাকে তার সঙ্গে ওই সব করতে হয়। সেই বইটার ছবির মত। সত্যি ওরকম করত নাকি, কে জানে। নাকি খালি গুলবাজাকি ! কিন্তু রামায়ণ মহাভারতে কি মিথ্যা কথা লেখে ! কী জানি, আমি ওসব ভাবতেই পারি না। আরে, শত হলেও সেটা একটা ঘোড়া তো ! একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার ! ধূ—র, যাচ্ছেতাই। আর, বাঙ্‌রেজ আর পাঞ্জরেজ—মানে পাঞ্জাবীর পাঞ্জ আর ইংরেজের রেজ, পাঞ্জরেজ মেমসাবরা আমাকে সেরকম একটা কুকুর ভাবে নাকি। মারব মুখে লাথি। আমি থু থু দিই শুয়ারিগুলোর গায়ে।



শিখা পিছন ফিরে কী করছে, বুঝতে পারছি না। ওর খোলা চুলগুলো ঘাড়ের পাশ দিয়ে এমনভাবে এলিয়ে পড়েছে, পিছন ফিরে, মাথা নামিয়ে কী করছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। ডানা খসা প্রজাপতিটার সঙ্গে কথা

বলছে নাকি, ‘প্রজাপতিঠাকুর, আমি তোমাকে মারিনি, আমার একটা ভাল বিয়েতে বাগ্‌রা দিও না, দোহাই।’…না বাবা, জোরে হাসব না। শিখার পিছনটাও দারুণ, না? একটু একটু লম্বা ঘাড় আর কাঁধটার ঠিক মাঝখানে, স্‌লাইট উঁচু লাগছে। যেন ওখান থেকেই পিঠটা নেমেছে একদিকে। আর মাথাটা নিচু বলে, মনে হচ্ছে, ঘাড়টা নেমে গেছে আর-একদিকে। আর খুলিটার নিচে, ঘাড়ের ওপর কুচো কুচো চুলগুলো, দেখলেই মনে হয় ওখানটা খেয়ে দিই। জামাটাও এমন, পিঠের অনেকখানি দেখা যায়। দেখেই মনে হয়, পিঠটা খুব মিহিন একটু রোঁয়া রোঁয়া ভাবের। জামার নিচেটা আলগা হয়ে রয়েছে। হাত দিলেই ঢুকে যাবে। এখন ওর জামার ডোরাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন শিকের গরাদের মত। তার নিচে, আবার সেই পিঠ, শিরদাঁড়াটা একটু একটু ফুটে আছে। সকালবেলা তো এখন, চানটান করেনি। শায়াটা আল্‌গা আল্‌গা, গোলাপী রঙের মোটা শাড়িটা কোনরকমে গোঁজা। তার জন্যেই কোমরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। শিরদাঁড়ার হাড়টা সেখানেই একটু দেখা যাচ্ছে। তারপরেই পিঠটাকে চিরে, ঠিক যেন একটা সরু নালি। ওর নিশ্চয় খেয়াল নেই, শায়াটা অত ঢিলে হয়ে গেছে। পিঠের যেখানে শেষ, আর কোমরের যেখানটায় সুরু, সেই সরু জায়গাটা ছাড়িয়ে, নিচের চওড়া দিকে বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আর একটু নিচেটাই কেমন, আমি জানি। স্‌সাহ্‌ আমার হাত দুটো যেন কেঁই কেঁই করে ওঠে হ্যাঙলা কুকুরের মত।

কিন্তু, শিখা কী করছে। ওকি এদিকে ফিরবে না। আমি তো সত্যি বলছি, প্রজাপতিটাকে মারতে চাইনি। ধরতে চেয়েছিলাম। একবার অবিশ্যি খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। পালকের ঝাড়নের ছপ্‌টিটা দিয়ে পিটিয়ে ছিঁড়ে কুটে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল। বিরজুর জুয়ার আড্ডায় একদিন যেমন বিপিন হারামজাদাকে দিয়েছিলাম। একটা ছপ্‌টি দিয়ে, চোরটাকে প্রায় তুলার মতই ধুনে দিয়েছিলাম। তারপরেও ও কেমন করে বেঁচেছিল, জানি না। প্রজাপতিটার ওপর যখন রাগ হয়ে গিয়েছিল, তখনই শিখা বলেছিল আমাকে নাকি খুনীর মত দেখাচ্ছে।

তা দেখাতে পারে। আমার ব্যাপারে, সেটা একেবারে আশ্চর্যের কথা না। তবে প্রজাপতিটার ওপর আমার একবারই রাগ হয়েছিল। যখন কড়িকাঠের গায়ে গিয়ে বসেছিল। আসলে ওর ফরফরানির জন্যেই ও মরলো। ঠিক যেন ছেউটি ছুঁড়ির মত ছটফটিয়ে ওঠা। সেই যে কথা বলছিলাম, একবার যেমন হল পিকনিক করতে গিয়ে। কারখানার স্টাফ, উইথ ফ্যামিলি সব। ওরকম কিছু হলে, আমার ডাক পড়বেই। কেন পড়ে, তাও জানি। যদি কোন বিপদ আপদ হয়; আমার গুণ্ডাটাকে নিয়ে যাওয়া যাক, এই আর কী। কারখানারই এক কন্ট্রাক্টারের গ্রামের দিকে বাগানবাড়িতে পিকনিক হয়েছিল। স্‌সাহ্‌, পিকনিক নাকি ওর নাম। নিজেরা যত লোক, তার থেকে বেশী চাকরবাকর বেয়ারা বাবুর্চি। গাড়ি গিয়েছিল সাতটা।

কিন্তু সে যাক্‌গে, কথা হল মেয়েগুলোকে নিয়ে। মেয়েগুলোর মধ্যে কে যে চৌদ্দ, আর কে যে চব্বিশ, কারুর বাপের বলবার ক্ষমতা ছিল না। সাজগোজ আর পোশাকের বাহার কী। যেমন ওদের খাই-খাই ভাব, তেমনি যারা দেখবে, তাদেরও খাই-খাই ভাব। তার সঙ্গে মায়েদের রেস্‌ তো ছিলই। স্টাফের মধ্যে আবার ক'টা ছিল আইবুড়ো। বয়সের হিসাব চেয়ে লাভ নেই, ওরা সব খোকা কার্তিক। বিয়ে যখন করেনি, ওদের বয়সও হয়নি। ওদর সব বৌদিরা তো ছিলই, ভাইঝিরাও ছিল। বৌদিদের সঙ্গে খালি কথা, কথা তো না, কথার রসবড়া। চোখ ঘুরিয়ে ঢুলু ঢুলু করে, কেবল কথার রসের গাঁজলা। কিন্তু বৌদিরা যতই হ্যাঁচকা দিক, মোচড় মারুক, ঠাকুরপোদের হাত্তা সব অন্যদিকে।

উহ্‌রে বাবা, মিত্তিরের মেয়েটাকে নিয়ে ফ্যাক্টরি ওভারসিয়ার আইবুড়ো চ্যাটার্জি কী কাণ্ডটাই না করছিল। ওদিকে তো সালোয়ার কামিজের বুক পাছা ফেটে যাবার যোগাড়, কিন্তু খুকীটির কাকু কাকু বলে আদর কাড়বার কী ঘটা! এই বুক চেপে চেপে জড়িয়ে ধরে, নয় তো উরত চেপে কাকুকেই কাইচি মেরে হুড়োহুড়ি করে ফেলে দিতে চায়। কী? না, খুকি কাকুর সঙ্গে একটু হুড়যুদ্ধ করছে। আর কাকুটিও তেমনি। যা তুলে নেবার, তা তুলে নিচ্ছে। কখনো গাল টিপে দেয়, ঠোঁটে একটু টোকা মেরে দেয়, ঘাড়ে হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে দেয়। কিন্তু একটু দূরে দূরে, একেবারে দঙ্গলের মাঝখানে না। উ-ই বিচুলির ঢিবিটার কাছে, পুকুরটার আমবাগানের ছায়ায়, ঝোপঝাড়ের আশেপাশে।

কিছু বলতে যাও, তা হলে সুখেন নোঙরা ইতর। 'তোর মত একটা ছোটলোক গুণ্ডা ভাল কিছু দেখবে কী করে রে। তুই তো সব কিছু ওরকমই দেখবি।' হ্যাঁ, আমি তো খারাপই দেখব। দেখব—দেখব, তা বলে কি বলতে যাব নাকি। মাথাখারাপ! আমিও যা তুলে নেবার, তাই নেব। আমি তো আর কাকু না, সুখেনদা। কারখানার স্টাফও না, একটা গুণ্ডা। মতলব, স্‌সাহ্‌, লগে লগেই ভাইজা ফালাইলাম। একটু দূরে গিয়ে, হাত তুলে চেঁচিয়ে বললাম, 'কে কে খেতের কড়াইশুঁটি খাবে চলে এস।'

বলা মাত্রই,'আমি আমি' করে এক দল দৌড় মারলো। আমার লক্ষ্য, হয় চোপরার মেয়ে না হয় মিত্তিরের। দেখলাম, সে দুটোই আসছে। সত্যি বলছি, চারদিকে সব গাছপালা, কত রকমের সবুজ, মাঠে মাঠে মটর মুসুরি অড়হর, আর তার মধ্যে বড় বড় এক একটা হলদে চাদর বিছিয়ে রাখার মত ফুল ফোটা সর্ষের খেত—লোকে যে বলে 'সর্ষে ফুল দেখছে', মোটেই সেরকম মনে হয়নি, খুব সুন্দরই লাগছিল, আর উঁচু উঁচু আখের খেত, আর নীল ঝকঝকে আকাশ—শীতকাল তো, সবটা একেবারে দারুণ। তার মাঝখান দিয়ে মেয়েগুলো যখন ছুটে আসছিল, ঠিক রঙ-বেরঙের প্রজাপতির মত লাগছিল।

আমি কিন্তু ঠিক ছুটছিলাম। যাতে, ওদের ছুটিয়ে নিয়ে, বেশ খানিকটা দূরে চলে যাওয়া যায়। আর ওদিকে ঠিক লক্ষ্য রাখছিলাম, কাকুরাও

আসে কি না : নাহ্, খোকা কার্তিকদের ওদিকে তো ঝোলা নেমে গেছে, অতটা ছোটাছুটি পোষাচ্ছিল না। সব বুড়ো মাকড়সা, বসে আছি পথ চেয়ে, যা আসবি তা থাবায় চলে আয় ! নড়াচড়া পোষাবে না। তবে ডাকাডাকি করলো অনেক, 'যেও না, যেও না।' কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে। সব ছুটতে ছুটতে ততক্ষণে আমার কাছাকাছি।

আরে বাপু, কোয়ার্টার কম্পাউণ্ডের মেসিনে-ছাঁটা ঘাসের মাঠ তো না। টেনিস লনও না। ধাপে ধাপে আল্, থেকে থেকে ধানকাটা মাঠ, তার ওপর দিয়ে ওরা কি সেরকম ছুটতে পারে ! মিত্তিরের মেয়ে, নামটা ছিল জিনা—উহ্ রে স্সা—কী নাম, একেবারে রণরণানো। আমি ওর হাতটা ধরে ফেললাম, 'পড়ে যাবে, আমার হাত ধর।'

হাত না একেবারে ডানাটা চেপে ধরলো। ব্যস্, কাকুর পাওয়ানা সুরু হয়ে গেল, আমিও তখন চ্যাটার্জি কাকু। কনুইটা ওর শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে ছুটলাম। তারপরে একটা মটরশুঁটির খেত দেখে, ঠিক পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

অন্যদিকেও আমার লক্ষ্য ছিল ঠিক। চাষীরা দেখলেই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। এই এক কেলাসের লোক বাবা। বাড়িতে থাকলে, কিছু নিয়ে যাও। মাঠে গিয়ে হাত দিয়েছ তো, পেঁদিয়ে খাল খিচে দেবে। তা সে নিজের পাড়ার লোক, ভাই-বেরাদার হলেও মাপ নেই। আর, এদের কাছে বাবা ওসব সুখেন গুণ্ডা-টুণ্ডা চলবে না। ষাঁড়ের থেকেও গোঁয়ার। 'শহরের লোক, শহরে গে বীরত্ব ফলাও,এখেনে একেবারে পুঁতে ফেলে দেব।'

তবে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, হাত জোড় করে কত্তাটত্তা বলে মেয়েগুলোকে দেখিয়ে বলব, 'এরা তো কিছু বোঝে না কত্তা, দোষ করে ফেলেছে। নাও, দুটো টাকা নাও।'

সেটি হবে না। তুমি দিতে চাইলেই, অমনি একেবারে ল্যা ল্যা করে নিয়ে নেবে, তা পাওনি। 'কেন, আমি কি দোকান খুলে বসেছি, না হাটে এসেছি বিক্রী করতে ?' এইরকম বলবে। তারপরে হয় ক্ষ্যামা, নয় তো গালাগালি দিয়ে ভাগানো। আর যদি কত্তা তুষ্ট হন, তবে একেবারে দেবতা। 'তা নেন, পয়সার কথা বলেন কেন, ছেলেমানুষ সব, দু-চারটে মটর বৈ তো না ! তবে, অপুরুষ্টু ছিড়বেন না, পুরুষ্টুগুলোন খান।'

আমার ভাগ্যি ভালো, পঙ্গপালগুলোকে কেউ তেড়ে আসেনি। জিনা আমার পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে মটর তুলছিল। মটর তো তুলছিল না, গাছ টেনে ছিড়ছিল। আর খালি বলছিল,'সুখেনদা,আমাকে দাও। তুমি খালি নিজেই নিচ্ছ।'

অথচ একটাও নিইনি। আমার হাত থেকে ও-ই থাবা দিয়ে নিচ্ছিল। আরে, আমার তখন গাছের মটরে নজর ছিল নাকি। আমার যা পাবার ঠিকই পাচ্ছিলাম। আর কচি কচি মটর দানা ওর মুখে পুরে দিচ্ছিলাম। দিতে গিয়ে দু-একবার আদর করে গালটা টিপেও দিচ্ছিলাম। আর ও,

সেই যে এক বুলি শিখেছে, খালি 'লাভ্লি লাভ্লি' বলে, আমার পিঠের ওপর ধামসাচ্ছিল। দে দোল দোল, ধাম্সা। খুব ধামসা। এদিকে ধাম্সানি, ওদিকে কচি মটরের রসে মুখ ভরপুর। তখন হাতটা দু-একবার বেমক্কা এদিক ওদিক করলাম। ব্যস, বুঝে নিলাম, পুরোপুরি চ্যাটার্জি কাকু হয়ে গেছি। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'জিনা, চল আমরা আখের খেত থেকে আখ খেয়ে আসি।'

অমনি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। মুখে হাত চাপ দিয়ে থামিয়ে বললাম, 'খবরদার, ওদের বলো না, বেশী লোক গেলে ফসকে যাবে। তুমি আর আমি যাই চল।'

তৎক্ষণাৎ রাজী। ওর হাত ধরে অন্য দিকে ছুটতে আরম্ভ করলাম। বাকী মেয়েগুলো ঝাঁক বেঁধে কল্কল্ করে উঠলো। আমি বললাম, 'তোমরা থাক, আমরা এখুনি আসছি।'

জিনা বেশ মজাই পেল তাতে। উরে স্সাহ্, এক চোখ বুজে, চোখ মারল আমাকে। আমি তো ওর হাত ধরেছিলাম। তখন হাত দিয়ে, প্রায় বগলদাবা করে নিলাম। মাইরি, আমার যেন মনে হল, আদুরে খুকিটি শিখার থেকে বড় বড়। অথচ, জিনার বয়স তো না কি চৌদ্দ। চৌদ্দ! কিড্! কাকুরা তো তাই বলে, 'কিডি'। আর শিখা তো একুশ না বাইশ। শিখাকে সবাই যত বাড়াতে পারেনি, খুকিটিকে দেখছি, চ্যাটার্জি তার থেকে অনেক বেশী বাড়ন্ত গড়ন করে তুলেছে।

স্সাল্লা! হলুদ রঙের সরষে খেতটা পেরিয়ে, ওকে প্রায় শূন্যেই তুলে নিলাম। ও খিল খিল করে হাসলো। হাত দিয়ে আমার ঘাড়টা আঁকড়ে ধরলো। কসম! মনে হলো, সত্যি সরষে ফুল দেখছি।

না না, সরষে ফুল কী। আমার ঠিক মনে হল, আমি ক্ষ্যাপা ষাঁড় হয়ে গেছি। লাল রঙ দেখা ষাঁড়। কিছুটা দূরেই আখের খেত দেখে রেখেছিলাম। ওকে নিয়ে সেখানে গেলাম। আড়ালে গিয়ে খেতের ধারে দূর্বাঘাসওয়ালা একটা ছোট জায়গায় ওকে নামালাম। সেখান থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে দেখে নিলাম। খাসা! দরজা বন্ধ করা ঘরেও এত নিরিবিলি আর ফাঁকা মনে হয় না। বাঁ দিকে ঘন বাঁশবন। ডান দিকে আর পেছনে, খালি ধান কাটা মাঠ, অড়হর মটর সর্ষে আখের খেত। একটা মানুষ কোথাও নেই, মাথার ওপরে তো খালি আকাশ। সামনে লম্বা আখের খেত। দূর্বাঘাসের ওপর প্রজাপতিটা আমার বুকের কাছে।

জিনা তখনো হাসছিল ঘাসের ওপর পড়ে। আমিও ওর পাশে, ঠ্যাঙ ছড়িয়ে দিয়ে, একটা হাত ওর কোমরের ওপর রেখে খুব হাসছিলাম। ওকে হাসি বলে নাকি। মাতলামি বলে, সত্যি, কয়েক পাত্র চড়ালে যে রকম হয়, ঠিক সেইরকম মনে হচ্ছিল। মাথায় কিস্সু ছিল না, প্রজাপতিটার শরীর ছাড়া। ওকেই বোধহয় নেশা চড়ে যাওয়া বলে। হাসতে হাসতেই, আমি ওর দুই বিনুনি দুদিকে ছড়ানো, ঘাড়ের মাঝখানটায়

হাত দিয়েছিলাম। আঙুল দিয়ে ওখানে একটু বিলি কাটতেই, 'উহ্' বলে একেবারে চিত হয়ে পড়েছিল। বলেছিল, 'সুড়সুড়ি দিও না সুখেনদা।'

সুড়সুড়ি লাগবেই তো। কিন্তু ও চিত হয়ে পড়তেই আমি একটা হাত ওর বুকের নিচে,পেটের ওপর রেখেছিলাম। সালোয়ার কামিজের সঙ্গে যে উড়নিটা থাকে, সেটা রেখেই এসেছিল। কামিজটা ছিল বোধহয় কটস্-উলের। বেগনি রঙ, তাতে আবার ফুল ফুল ছাপ। কিন্তু ফেটে যাবার যোগাড় যে! মিসেস মিত্তির, আমার মিত্তির বউদিরও যে এত না। বলেছিলাম, 'সুড়সুড়ি দিই নি তো।' বলেই হাতটা বুকের ওপর তুলে দিয়েছিলাম। তারপরে যেন খুবই মজা করছি, এমনিভাবে আমার মুখটা চেপে দিয়েছিলাম ওর কাঁধের কাছে। অমনি কোমরটাকে ঢেউ দিয়ে তুলে, হিস্হিস্ করে হেসে উঠেছিল। ঘাসের ওপর পা দাপিয়ে, ঘাড় গলা কুঁকড়ে বলেছিল, 'উহম্, সুখেনদা, কাতুকুতু লাগছে।' আমার নেশা তখন চরমে। বলেছিলাম, 'মুখে কী মেখেছ বল তো, ব্রিলিয়াণ্ট গন্ধ।' বলেই ঠোঁট দুটো ওর গালে চেপে দিয়েছিলাম। প্রজাপতিটা হাসতে হাসতে কাত হয়ে পড়েছিল। পড়লে কী হবে, দাঁতাল কখনো ওসব মানে! আমার যেখানকার হাত সেখানেই ছিল। আমার হাত তো না, চ্যাটার্জি কাকুর হাত। তার হাতে যেমন স্নেহ, স্নেহ না, স্তেঁহ বল, আমার হাতেও তখন সেইরকম। বড্ড স্তেঁহ, বাঘের যেমন মাংসে। বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ওর ঘাড়ের নিচে দিয়ে। গালে ঘষতে ঘষতে, ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপেছিলাম। যেমন ছেলেমানুষকে আদর করতে হয়। ছেলেমানুস্ তো।

তবে জিনা কিন্তু বড় মেয়েদের মত করেনি। এরকম অবস্থায় শিখারা হলে যা করতো। এমনভাবে তাকাতো আর এমন দু-চারটে কথা বলতো, ব্যস, তুমি কাত। তাতে যেন আরো নেশা, আরো চড়া। সেখানে ধমকই ঠমক। জিনা কিন্তু হাত পা ছোঁড়াছুঁড়িই বেশী করছিল। হাসছিল, আবার উহ্ আহ্ করছিল। কাত হয়ে, উপুড় হয়ে,চিত হয়ে, মাদী বিড়ালের মত ওলট-পালট খাচ্ছিল।

খাক না, আমার কাজ আমি করে যাচ্ছিলাম। অন্ গড বলছি, তখন যদি কোন লোক এসেও পড়তো-না, আমি মানতাম না। কুকুরগুলোর যেমন অবস্থা, আমি সেই রকম হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলে খুব জঘন্য লাগে, কিন্তু কী করব, আমার মধ্যে বোধহয় একটা কুকুরও আছে। অবিশ্যি আমার থেকেও খারাপ অবস্থা অন্য লোকের দেখেছি। জীবনে প্রথম দেখা একটা ঘটনার কথা তো কোনদিনই ভুলিনি, ভুলবও না। নিজের সঙ্গে ন্যাকামি করে লাভ নেই, আসলে আমি চেষ্টা করলেও বোধহয় আর কখনো ভুলতে পারব না। মেয়েদের সঙ্গে আমার কিছু ঘটলেই, মানে শুটিং গেম যাকে বলে না, সেই কথাই বলছি, সেই প্রথম দেখা ঘটনাটার কথা মনে পড়বেই পড়বে। কেন, আমি বুঝতে পারি না। বিভূতি আমার বন্ধু, যে এখন একটা শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, আর

নয় তো গিরিন, যে এখন ঘাড়ে গর্দানে মোটা হয়ে গেছে—কী জানি ছাব্বিশ বছরেব একটা ছেলে, কী করে ঘাড়ে গর্দানে ওরকম মোটা হয়ে যায়, চশমা পরে, পাঞ্জাবী গায়ে দেয় আর কোঁচা ঝুলিয়ে বুলডগ মার্কা মুখ করে ইস্কুলে পড়াতে যায়, যে দু'জন আমার সঙ্গে ঘটনাটা দেখেছিল, তাদের নিশ্চয় ওসব কথা মনেই নেই আর।

কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। তখন কত আর বয়স হবে, আট-নয়, বড় জোর দশ। এই সন্ধ্যে প্রায় হয়ে আসে, শীতকাল, মাঠ থেকে ফিরছিলাম। ফেরার সময় হিসাবে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। বেলা থাকতে থাকতেই ফেরবার কথা। তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি। কিসের ছাই যুদ্ধ, কিছুই জানতাম না। শুনতাম মহাযুদ্ধ চলছে। ব্ল্যাক আউটের কথা একটু একটু মনে আছে, আর মিলিটারিদের যাতায়াত। বড় বড় ট্রাক, জীপ সব সময়েই দেখতাম, আর যত্তো শাদা আর কালো আমেরিকান, সাহেব আর নিগ্রো। আমাদের শহরের বেশ্যাপাড়ায় প্রায়ই তারা আসতো। কোনদিন দেখিনি, ইস্কুলে সবাই বলাবলি করতো। একটা ছেলে ছিল গণেশ মোদক, পাড়াটা ওদের বাড়ির কাছে। ও বলতো, 'কাল মিলিটারিরা মাগী পাড়ায় এসেছিল।' তখন কিন্তু খুব লজ্জা লাগতো, একটা থ্রি ফোরে পড়া ছেলে, মাগী পাড়া বলে কী করে। এখন বুঝতে পারি, ওর বাপ মা যা বলতো, ও-ও তাই বলতো। ওর বাপ মা'র কথা পরে অনেকবার শুনেছি তো।

আমরা ফিরছিলাম, আর ফেরবার পথে, সেই পাড়াটার পাশ দিয়ে আসতে হত। আরে স্‌সাহ্‌, দেখি কিনা, পাড়াটার মোড়ের কাছেই যে নর্দমা ঘেঁষে দেওয়ালটা, তার গায়ে একটা মেয়েমানুষকে ঠেসে ধরেছে একটা শাদা মিলিটারী। প্রথমটা তো ভেবেছিলাম, মেয়েমানুষটাকে বুঝি সাহেবটা মাবছে। আমরা তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মাতাল আমেরিকানটা কী যে করছিল, প্রথমটা বুঝতে পারিনি, যেন একটা খুনের মত কিছু করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার হাতের মুঠোয় কয়েকটা দশ টাকার নোট দেখা যাচ্ছিল। মেয়েমানুষটা হাত দিয়ে সাহেবটাকে ঠেলে দিতে চাইছিল, কিন্তু চীৎকার করছিল না, কেবল বলছিল, 'আহ্‌ মরণ, কুকুর না বেড়াল গো। মাতালটা ঘরে না গিয়ে এখানেই চেপে ধরেছে। এই ঘরকে চল্‌, চল্‌।' ততক্ষণে ব্যাপারটা সব এমন স্পষ্ট দেখা গেল, আর কী একটা যে বুঝলাম, তখন ঠিক জানতাম না। এই আর কি, যেন একটা খারাপ অথচ অদ্ভুত কিছু। আমরা এমনিতেই পালাতাম, কিন্তু তার আগেই, ভিখিরির মত একটা লোক কোথা থেকে তেড়ে এসে, খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'এ্যাই ছোঁড়ারা, বাপের সাঙা দেখছিস, অ্যাঁ ? পালা বলছি।'

তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালিয়েছিলাম। পালিয়ে, বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে তিনজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলছিলাম। কী কথা বলেছিলাম, সে সব কি আর এখন মনে আছে। সেই ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলেছিলাম, খানিকটা ভয়ে ভয়ে আর একটা খারাপ খারাপ

ভাব নিয়ে। খালি এই কথা মনে আছে, গিরিন বলেছিল, 'বাড়িতে এ সব বলিস না যেন, মারবে। সত্যি, গিরিন মাস্টার হবে না তো কে হবে। কিন্তু তা আর বলতে হবে না, সে জ্ঞানটি টনটনে। বাড়িতে বলা চলবে না। তবে সেই ব্যাপারটা আমি কোন দিন ভুলতে পারিনি, কোন দিন পারব বলেও মনে হয় না। ওটা একটা এমন ব্যাপার, যেন আমার গায়ে কেউ কলকে পুড়িয়ে ছাপ দিয়ে দিয়েছে। গায়ে মানে মনে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর ইস্কুল মাস্টার, তাদের নিশ্চয় মনে নেই ও সব, কারণ ওরা তো খারাপ না, আমার মত হয়নি। কিন্তু আমার যে কেন মনে গেঁথে গেল, কে জানে। এমন কি, যখন একলা থাকি, তখন যদি সেই ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়, অমনি শরীরটা গরম হয়ে রণ্‌রণ্ করে ওঠে। আর কোন মেয়ের সঙ্গে যখন খেলি, তখন একবারের জন্যে হলেও মনে পড়বে। শুধু তাই না, আমার ওরকম করতেও ইচ্ছা করে, ঠিক সেই মিলিটারিটার মত। কেন, তা বুঝতে পারি না। ও ব্যাপারটা মনে করা মানেই, ঝাঁঝালো নেশা করার মত। ঠিক একটা ম্যাজিকের মত, চট করে চড়ে যায়।

অথচ ব্যাপারটা কুকুর-টুকুরের মতই তো। খুবই জঘন্য, অথচ কী একটা নেশা, কোন তাল জ্ঞান থাকে না। কেন, বাবার ব্যাপারটা কী। আমার মা দেখতে তো দারুণ সুন্দরী ছিল। আমার তেরো বছর বয়সে মা মারা গেছে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, মায়ের রঙ ছিল কি রকম একটা সোনালী সোনালী ফরসা। সাহেবদের যেমন একটা লাল মুলো ভাবের ফরসা আছে, সেরকম না। চোখ দুটো দেখতে বেশ ছিল। বড় বড় ঠিক না, অথচ এমন একটা ভাব ছিল চাউনির মধ্যে, আর কেমন একটা ঢুলুঢুলু ভাব, কেমন আদুরি-আদুরি, মরবার কয়েকদিন আগেও মা'র চোখে কাজল ছিল। ওই সেই মিত্তিরের বউ বা চোপরার বউয়ের মতই অনেকটা ভাবভঙ্গি মায়েরও ছিল, কিন্তু ওদের যেমন গা না-ঘামানো পোকা পড়া ভাব, মায়ের সেরকম ছিল না। ঠাকুর চাকর ঝি থাকলেও মা দু'বেলা রান্না করতো। সংসার চালানোর ভার বইতে হত কিছু, তা হলেও, মায়ের একটা কি ভাব ছিল, হয়তো তার নামই সখী সখী ভাব। কী রকম বলব, একটা সুন্দর পুতুলের মত। সব সময় খালি লাল ঠোঁট দুটো যেন ফুলেই আছে। কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যেই একটা পড়ি পড়ি মরি মরি গা টিস টিস ভাব।

ওসব সবই বাবার জন্যে হয়েছিল, আমার মনে হয়। বাবা কালো, চেহারাখানিও বেশ দশাসই। এই প্রায় আমার মতই অনেকটা, তবে, তবু যা হোক, আমার গায়ের রঙটা ঠিক বাবার মত হয়নি, মায়ের মতও না, মাঝামাঝি, আর চোয়াল চিবুক ঠোঁটটোটগুলো মায়ের মতই হয়েছে। বড়দাটা ঠিক মায়ের মতই হয়েছে, অবিকল, আর মেজদাটা বাবা বসানো। ছোট বোনটা দু' বছর বয়সেই মরে গিয়েছিল, থাকলে মায়ের মতই হত, আর তারপরে এতদিনে তেইশ চব্বিশ বছরের হত, উরে স্‌সা, তা হলে আর দেখতে হত না, শহরের ছোঁড়ারা টোপ ফেলে ফেলে অস্থির করতো, রপোটের জ্বালায় টেকা যেত না। দেখছি তো সব চারদিকে, একটু চোখ

লাগবার মত হলেই হল, ছিনে জোঁকের মত সব লেগে থাকে সেই মেয়ের পিছনে। আমি নিজে লেগে থাকতে পারি, আর আমার বোনের পিছনটা কি কেউ ছেড়ে দিত। অত্তো না।

মাকে আমার এমনিতে খারাপ লাগতো না, একমাত্র বাবার বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ভাবভঙ্গি ছাড়া। মা যে দেখতে বেশ, আর বাবার বন্ধুরা যে বাবার কেলে হুমদো মুখখানি দেখতে আসতো না, মায়ের কাছে মদ্দা পায়রাগুলোর মত পেখম ছড়িয়ে ঘুরঘুর করতো, তা আমি ছেলেবেলাতেই বুঝতে পারতাম। লোকগুলোর চোখের দিকে তাকালে স্রেফ শুয়োরের বাচ্চা বলে মনে হত। মায়ের আদুরি আদুরি ঢঙ্‌ঢাঙ দেখেও এমন রাগ হত, মনে হত, মাকে একেবারে কামড়ে খামচে ছরকুটে দিই, মাইরি ! আর রাগ হত, যখন দেখতাম, বাবা মা রোজ একটা আলাদা ঘরে শুতে যেত। ছ' বছর বয়স থেকেই তো আমাকে দাদাদের সঙ্গে আলাদা ঘরে শুতে যেতে হত। বাবার মত লোককেই স্ত্রৈণ বলে কি না জানি না, তবে সেই যে একটা কথা আছে না, মাগের আঁচল ধরে থাকা, বাবার ঠিক তাই ছিল। বাবাকে মনে হত, মা-খোর। তার ওপরে, ভদ্রলোকের মেজাজটা এমন রাগী ছিল, বড় চাকরির অহঙ্কার ছিল, যেন আমরাও কেরানী চাকর বেয়ারা। আদর-টাদর করতো, কিন্তু চোয়াড়ে ভাবভঙ্গি দেখলে কাছে যেতে ইচ্ছা করতো না। বড় চাকরি, প্রচুর ঘুষ, মেলাই তেল দেবার লোক, সব মিলিয়ে লোকটাকে স্‌সাহ্‌ দারুণ ক্রুয়েল মনে হত। যেন একটা বাঘের মত। মার কম খেয়েছি নাকি ! রেগে গেলে, এমন মারতো, মারাত্মক—ওই হাতের এক একখানি থাপ্পড় খেলে আর কাউকে দেখতে হত না। আর রেগে গেলে চোখগুলো এমন জ্বল্‌জ্বল্‌ করতো, শরীর হিম হয়ে যেত। আর সেই লোককেই এখন দেখ গিয়ে— ।

তা সে যাকগে, মা-ই ছিল বাবার ওষুধ। আমি কোন দিন মনে করতে পারি না, মায়ের দিকে যেভাবে তাকাতো, আমাদের দিকে কোন দিন বাবা সেরকমভাবে তাকিয়েছে কি না, সেইরকম মিঠে মিঠে হাসি-হাসি ভাবে। সে সব তবু একরকম মেনে নেওয়া যেত, সব থেকে রাগ হত, যখন দেখতাম, দুজনে আলাদা শুতে চলে যেত। বাবার ওপর তখন কী ঘেন্না যে হত না, সমান সমান হলে বোধ হয় লড়েই যেতাম। দু-একদিন যদি আমাদের ঘরে মায়ের একটু দেরী হত, তা হলেই ঘরের বাইরে বাবার স্যাণ্ডেলের ফটর ফটর শোনা যেত। তার মানে, 'থাকতে পারছি না, কিছু মানব না, তোমাকে আসতেই হবে।' এখন অবিশ্যি বুঝতে পারি, ফাদারের তেমন দোষ ছিল না। ওটা বাঘের খিদে, বাঁধাধরা, একেবারে 'টাইম্‌লি'। আর তো কোন নেশা ছিল না, মদ না, অন্য মেয়েমানুষ না। নেশা ছিল বউ, ঘুষ, লোকের ত্যালানি।

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, আমি জিনাকে নিয়ে যেভাবে তখন আখের খেতের ধারে সাপটে পড়েছিলাম, কেউ এসে পড়লেও মানতাম না, তার

থেকে এসব লোকের অবস্থা ভাল ছিল না। মোটেই না। এরকম অনেক মানুষের কথা আমি বলতে পারি, অনেক ঘটনা, যা চোখের সামনে ভাসছে। আমাদের এই শহরেরই অনেক নামী লোকের কথা জানি, কেউ নেড়ি, লুকিয়ে লুকিয়ে, কেউ বাঘা বাঘা ভাবে, লক্ষ্য ঠিক এক দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়বেই, কোন কিছু মানবে না। আমিও মানিনি, মানতামও না। চ্যাটার্জি কাকুর কাজ আমার হাত করে যাচ্ছিল, প্রজাপতিটা তেমনি ওলট-পালট ছটফট করে যাচ্ছিল, আর হাসতে হাসতেই উহ্ আহ্ করছিল। আমার তখন সালোয়ার কামিজের ওপর এমন রাগ হচ্ছিল, প্রায় ঘেন্নাই বলতে হয়। শায়া শাড়ি তার চেয়ে অনেক ভাল, কোন ঝামেলা নেই। আমার আর তখন হাসি ছিল না। হয়তো শিখা থাকলে বলতো, 'সুখেনদা, তোমাকে খুনীর মত দেখাচ্ছে।' আমার চোখের সামনে সেই ছেলেবেলার দেখা আমেরিকান আর বেশ্যাটার চেহারা ভাসছিল। আমি সালোয়ারের ফিতেটা খুঁজে টানাটানি করছিলাম। জিনা এঁকেবেঁকে গড়িয়ে তখন প্রায় আখ খেতের মাটিতে গিয়ে পড়েছে, 'সুখেনদা, প্লীজ, হি হি হি, প্লী—জ, ভীষণ কাতুকুতু—হি হি হি—উহ্ উহ্!'

কিন্তু সালোয়ারের দড়িটা খুঁজে পাইনি। শেষটায় প্রায় জিনা চীৎকার করেই উঠেছিল, ব্যথা লাগলে বা হঠাৎ চোট লেগে গেলে যেরকম কেঁদে চেঁচিয়ে ওঠে, সেই রকম শব্দ বেরিয়েছিল ওর গলা দিয়ে, আর আচমকা এমন গুটিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল যে, আমি থমকে গিয়েছিলাম। তবে বিশ্বাস করিনি, সত্যি কিছু হয়েছে বলে, মেয়েদের ওসব ন্যাকরা আমার জানা আছে। তবু যেন কেমন একটু মনে হয়েছিল, তাই উঁকি দিয়ে ওর মুখ দেখেছিলাম। দেখেই আমার চিত্তির উলটে গিয়েছিল, প্রায় ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। জিনার মুখটা যন্ত্রণায় বেঁকে গিয়েছিল, মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, যেন নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। মরেছে, স্‌সাহ্ অক্কা পেয়ে যাবে নাকি। কী বিচ্ছিরি হয়েছিল মেয়েটার গোটা চেহারা, মুখটা মনে হয়েছিল, একটা বয়স্কা মেয়েছেলের মুখ, খুকীর ভাঁজও ছিল না। তার ওপরে বুকটার চেহারা এমন বদলে গিয়েছিল, দু'টো মালসার মত ছড়িয়ে গিয়েছিল। ওর দু'টো হাতই বুকের নিচে পাঁজরের কাছে চেপে ধরা ছিল, কোনরকমে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, 'ভীষণ লেগেছে।' তখনো ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করব কি না বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু ছেউটির মুখটা যেরকম হয়ে উঠেছিল, নীল নীল ভাব আর চোখের পাশ দিয়ে গাল অবধি একটা শিরা যেন তির্‌তির্ করে কাঁপছিল। তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোথায় লেগেছে?' তার কোন জবাব দেয়নি জিনা। একেবারে কাঠ হয়ে পড়েছিল। আর আমার তো চোরের মন, ভেবেছিলাম, লোকে বোধ হয় একেই সেই ধর্ষণ বলে। অথচ আমি তো তা করিনি। তখনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম, মরে গেলে, আখের খেতের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে দিতে হবে। দিয়ে তারপরে ভালমানুষের মত সকলের কাছে গিয়ে বলব, 'জিনা তো অনেকক্ষণ আমার কাছ থেকে চলে এসেছে, আমি তো অন্য

দিকে চলে গেছলাম। ও এখনো ফেরেনি ? তা হলে তো খুঁজে দেখতে হয়।'

তা বললে কি হয়, ঠিক কী করব তা-ই বুঝতে পারছিলাম না। সত্যি সত্যি আমি তো আর চ্যাটার্জি কাকু নই, তার হাতের কাজ-কারবার অন্যরকম। তখন যা মাথায় এসেছিল, তাই করেছিলাম। পাঁজরার যেখানটায় ও হাত চেপে রেখেছিল, সেখানটা আস্তে আস্তে ডলে দিয়েছিলাম। কী কুগ্রহ রে বাবা। জিনা ঠোঁট নেড়ে জল চাইছিল। সেখানে জল কোথায়। একমাত্র বাঁশ ঝাড়টার কাছে একটা ডোবা দেখা যাচ্ছিল। কোন রকমে সেখান থেকে রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে এসে ওর চোখে মুখে একটু দিয়েছিলাম। তাইতেই আস্তে আস্তে চাঙা হয়ে উঠেছিল। যাক বাবা, স্বস্তি। এদিকেও না, ওদিকেও না, মাঝখান থেকে খুনী হয়ে পড়ছিলাম আর কী। আখ ভেঙে খাইয়েছিলাম ঠিকই, আর স্নেহও করেছিলাম তারপরে। তখন ওর মুখ দেখে আমার আবার কী রকম কষ্টও হচ্ছিল, এক এক সময় হয়-না, কারুর কষ্ট দেখলে বুকের মধ্যে কী রকম টনটন করে সেই রকম করছিল। মনে হয়েছিল, আমি যেন ওর দাদা, আমার ছোট বোন ও, আর দাদাদের মনটা বোধহয় ছোট বোনের জন্য এরকমই টাটায়—কী জানি, জানি না ছাই। আসলে ওই চ্যাটার্জি শুয়োরটার ওপর হিংসায় আর রাগেই বোধহয় ওরকম করেছিলাম, তবে জিনাকেও কি ভাল বলা যাবে ! কাকুর আদর খেয়ে খেয়ে তো বারোটা বাজিয়ে বসে আছে। যাক গে, তখন আর সুড়সুড়ি কাতুকুতু হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি কিছুই ছিল না। কিন্তু স্নেহেও অরুচি, মেজাজ একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওসব চ্যাটার্জি কাকুরই পোষায়, চল্লিশ পঞ্চাশের খোকা কার্তিকের, মাংসের তাল নিয়ে খানিকটা রগড়ারগড়ি। ওদের দম আর কত হবে !



এই প্রজাপতিটাকে দেখে, সেই কথাই আমার মনে পড়েছে। চাইলাম ধরতে, তা একবার ছটফটানিটা দেখ। নিজের ইচ্ছায় মার খাওয়া না এ সব ! ধরে তো খেয়ে ফেলতাম না। প্রজাপতিটা কখন ঘরে এসেছিল, আর আমার কাছেপিঠেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। শিখা চোখ বড় বড় করে বলেছিল, 'কী সুন্দর প্রজাপতিটা !' তখনো আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। তারপরে প্রজাপতিটা প্রায় একবার আমার কাঁধের কাছে এসে বসেছিল। শিখা চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলেছিল, 'সুখেনদা, প্রজাপতিটা

তোমার গায়ে বসেছে, তোমার এবার বিয়ে লাগবে। আহ্ কী সুন্দর !'

তখনই আমি হাত বাড়িয়ে, রঙচঙে পোকাটাকে ধরতে চাইছিলাম। প্রজাপতি হলেও পোকাই তো ওটা। শিখার কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, প্রজাপতিটা ওর গায়ে বসলেই ভাল হত। আমার যে আবার কী রকম বিয়ে হবে, তা কি ও জানতো না। মেয়ে আমি অনেক দেখেছি, ঘেঁটেছি যাকে বলে, হাড়ে মাংসে দেখা আছে। বিয়ের কথা কোন দিন চিন্তা করিনি। তবে হ্যাঁ, যদি কোন দিন কিছু করতেই হয়, বিয়েটিয়ের মত, তা হলে শিখাকে আমি ছাড়ব না। তা ওকে যত লোকই চা'ক, আর যতই ওর পেছনে পেছনে ঘুরুক, ওকে আমি ছাড়ব না। জানি সবই, কে কে ওকে চায়। আমার দুই দাদাও ওকে চায়। বড়দা আর মেজদা। আরও অনেকের টাঁক আছে, তাল মারবার লোকের অভাব নেই। আর মেয়েমানুষ যাকে বলে, বাব্বা, যত দেখবে সবাই তাকে তালতোল্লাই দিচ্ছে, ততই রঙে রঙে উঠবে। তার ওপরে যদি সেই মেয়ের আবার একটু খেলুড়ি মেজাজ হয়, তা হলে তো কথাই নেই। খেলোয়াড়ির সঙ্গে যদি আবার একটু অভাব অনটন, আর যদি জানতে পারে, একটু খেললে পরে, সে-সব মিটবে, উহ্‌রে ফাদার, তাকে আর দেখতে হবে না। আমার তো মনে হয়, তারা বেশ্যাদের থেকেও মারাত্মক। আর এই রকম মেয়ে আজকাল এত হয়েছে-না, যেখানেই যাবে, গাদা গাদা। বেশ্যাদের বুঝি বাপু, ঘাটে কড়ি দাও, খেয়া মেরে চলে যাও। বুঝেছি বাওয়া, এ নদী এখন তোমাকে পার হতেই হবে। ব্যস্, সাফ সুরত ব্যাপার, ধোলাইয়ের নাম পেটে খাওয়া।

কিন্তু এই মেয়েগুলো কী। তারা সব রকম করবে, অথচ বেশ্যা না। শিখাও অনেকটা সেই জাতের। বাপটি স্‌সাহ্ ফেরেব্‌বাজ, কলোনী ঘেঁষে এই আট কাঠা জমিটা কীভাবে বাগিয়েছে, কেউ বলতে পারে না। তার সঙ্গে এই পুরনো একতলা বাড়িটাও। বাড়িটা এককালে এক মুসলমানের ছিল। শুনেছি, পঞ্চাশ সনের দাঙ্গার সময়, শিখার বাবা এই বাড়িটা দখল করেছিল। তারপরে, কীভাবে কীভাবে একেবারে মৌরসী দলিল করে নিয়েছে। খচ্চর-রাজ লোক একেবারে। দলিলে কাউকে সই করাতে ভোলেনি। মুসলমানের সম্পত্তি তো, ভাগীদার অনেক। বলে, টাকাও নাকি দিয়েছিল তাদের। কোত্থেকে বাবা ! টাকা বানাবার কল ছিল তোমার ঘরে ! রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লিখে তো খেতে, আর একটি ক্ষমতা ছিল, এন্‌তার ছেলেমেয়ে করেছ। তাও পাঁচটার বেশী বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। মানুষ যা করেছে, সে তো দেখাই যাচ্ছে। বড় বড় ছেলে দুটো ঘস্‌টে ঘস্‌টে কোনরকমে ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল। তাও কত বছরে কে জানে। বলে, কেরানীর চাকরি করে, আমার স্‌সাহ্ তাও বিশ্বাস হয় না, দেখ গিয়ে হয়তো বেয়ারা পিওনের কাজ করে। তবে নেহাত ভদ্রলোকের পরিচয়টা দিত হবে তো, তাই বোধহয় বলতে হয়। বড় মেয়েটার—শিখার দিদি বেলার কোথায় একটা বিয়ে দিয়েছিল ! জানি না

কার দোষ, সেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বেলা তো এখন বাড়িতেই বেশ আসর জমিয়ে তুলেছে, তবে ওর ব্যাপারটা একটু আলাদা। আমাদের আবার বেলাদিদি তো, ওর ওখানে একটু বড় বড় দাদাদেরই আসর জমে। ডাক্তার, ব্যবসাদার, ইস্তক ভুঁড়োদাস প্রিয়চরণ মোক্তারও বেলা বেলা করে নালানি-ঝোলানি করে। বেলা বিশেষ বাইরেটাইরে যায় না। আসর যা কিছু বাড়িতেই। তবে আমার মনে হয়, ডাক্তার হরনাথ চক্রবর্তীই ওকে ঠিক জায়গায় কোপ বসিয়েছে। কেননা, ডাক্তার রোজ আসে—তায় আবার ডাক্তার তো—সব সময়ে হাতে থাকা ভাল। কিন্তু এই মাঝবয়সী বুড়ো খচ্চরগুলো কেউই বেলাদিকে বিয়ে করবে না, আমি জানি। ওদিকে তো সব ধাড়িগুলোরই ঘরে একটি করে ইস্ত্রি আর এক পাল বাচ্চা রয়েছে।

বেলাদি মাঝে মাঝে আমাদের দিকেও নেক নজর হানে। আমরা, যারা শিখার পিছনে ঘুর ঘুর করি। হানবেই তো, গতরে বিষ, মনেও কোন আশা নেই। মাঝে মাঝে, তা-ই বোধহয় মনে করে, ছোঁড়াগুলোকেই একটু চান্‌কে দেখি। আ—র বেলাদি, ছোঁড়ারা কি আর সেই ছোঁড়া আছে যে তোমার বর্শার খোঁচায় বিঁধবে। আজকালকার ছোঁড়ারা সব পাঁকাল মাছ, গায়ে একটু ঝাপটা মারবে, তার পরেই পিছলে কেত্‌রে বেরিয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, বুড়োদের পোঁটিকা মাছের মত ঝাপটা না, সেটা একটু জোরেই লাগবে। তোমাকে জড়িয়ে নিয়ে কেউ যাবে না। তোমার তিরিশ বছরকে জড়াবার জন্যে ওদের পাখনা খেলবে না! তবে হ্যাঁ, জড়াবার হিম্মত যদি কারুর থাকতো, তবে ছোঁড়াদেরই। এরকম এক-আধটা কেস্ এখনো আমাদের এই শহরে ঘটে না, তা বলব না। লাখে এক। বুড়ো বাঁদরগুলোর তো কেবল মিঠে মিঠে বুলি, তার সঙ্গে আবার একটু তত্ত্বকথা। আসলে স্বাদ বদলাবার তাল। কিন্তু বেশ্যা বাড়ি যাবে না। তা-ই কি যেতে পারে, অমন সব খাসা ভদ্দরলোক, অমন ঝকঝকে গতর। লোকে চরিত্রের দোষ দেবে না? রোগের ভয় নেই? তার চেয়ে বল, ওই বুড়োদেরই এক ব্যাটাকে একদিন ধরি, পাড়ার ছেলে-ছোঁড়াদের জড় করি, একটা হৈ-হুল্লোড় পাকিয়ে, তোমার সঙ্গে সাঙা লাগিয়ে দিই! আমার নাম সুখেন—সুখেন গুণ্ডা।

কিন্তু তা হবার নয়। বেলাদির জীবনটা এভাবেই কেটে যাবে মনে হচ্ছে। বেচারি! মাইরি বলছি, আমার খুব খারাপ লাগে, কষ্টও হয়। যে কারণে একবার নির্মল—আমাদেরই বন্ধু, বুক বাজিয়ে বেলাদির নামে খিস্তি করে বলেছিল, কবে ও বেলাদির সঙ্গে কী করেছে, শুনে গদাম করে মেরেছিলাম পাছায় লাথি। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াতো। নির্মল আমাকে মারবার জন্য পকেট থেকে ছুরি বের করেছিল! উহ্ রে স্‌সাহ্, কালকা যোগী, মাস্তানি দেখাতে এসেছ আমাকে। স্রেফ লিভারের উপর ঝেড়ে আর একটা লাথি কষিয়েছিলাম। আমার মেজাজ চড়ে গেলে, ক্ষমা নেই। সঙ্গে আরো দু-একজন বন্ধু ছিল। সবাই থামিয়ে দিয়েছিল। নির্মলের

হাতের ছুরিটা ছিটকে পড়েছিল দূরে। সেটা তুলে নিয়ে, মুখ বন্ধ করে, আবার ওকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

তারপরে অবিশ্যি আমার মনে হয়েছিল, কেন মিছিমিছি ওকে মারতে গেলাম। আমরা সবাই-ই তো আমাদের কীর্তিকাহিনী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি, হাসাহাসি করি। ওর কী দোষ। বেলাদিরই বা এত চুলবুলোনি কেন যে, আমাদের সঙ্গেও তাল দিতে হবে। তা ভাবলে কী হবে, তখন কী রকম মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। নাঃ, সব ভাবলে পরে ঘেন্না ধরে যায়।

শিখার আবার এসব নেই! ওর ভাবভঙ্গি একটু আলাদা, অন্য রকম। ও তো আবার বছর দুয়েক কলেজেও পড়েছিল। অন্য রকমের ফষ্টিনষ্টি আছে, তবে সেসব আমার খুব খারাপ লাগে না। তা বলে সকলের সঙ্গেই করবে নাকি। কিন্তু দেখ গিয়ে, ওর ভাব সকলের সঙ্গে। আরে, র‍্যাশন ইন্‌স্পেকটরটাও ওকে দেখলে কুকুরের মত গলে পড়ে, যেন ল্যাজ নাড়াতে আরম্ভ করে। স্‌লার আগমন কী কারণে? না, দাদাদের সঙ্গে খাতির। শহরে আর লোক পাওনি খাতির জমাবার, যত খাতিরের লোক হল শিখার দাদারা। ক'খানা কার্ড বাড়তি রাখতে দিয়েছ দাদা! হপ্তায় হপ্তায় ক' কে জি চাল র‍্যাশন দরে শিখারা পায়! দাদাদের সঙ্গে খাতির দেখাচ্ছে। দাদারাও তো তা-ই বলবে। চার বেলা করে, এই বাজারে ভাত মারতে পারলে, বোনের ওপর দিয়ে যদি কেউ কিছু উশুল করে যায়, যাক। এদিক নেই, ওদিক আছে, দু' ভাই আবার রাজনীতিও করে। তাও কি, দু'জনে একদলের না। এ একদল, ও আর-একদল। আমাদের বাড়ির মতই। আমার দুই দাদাও তো তাই-ই। দু'জনে দুই দল করে।

আমার দাদাদের কথা না হয় আলাদা, ওরা তো আর বোন দেখিয়ে চার বেলা ভাত মারে না। এদেরই বোধ হয়, সেই মেটে রঙ, দু-মুখো ঢ্যামনা সাপ বলে। দেখেছি সাপগুলোকে, এত কুচ্ছিত দেখতে বোধ হয় কোন জীব হয় না। একে তো পচা ঘায়ের মত রঙ। লম্বায় বড় হয় না, বেঁটে আর মোটা। সামনে পেছনে বলে কিছু নেই। দু'মুখ দিয়েই চলে। আর দুটো মুখই একরকম। কোনটা মুখ আর কোনটা পাছা, কী করে বুঝবে।

শিখার দাদারা হল সেই রকম। ওর দুই দাদা, আমার দুই দাদারই সাকরেদ। আমার দুই দাদা এই শহরের দুই দলের নেতা, আর আমি গুণ্ডা। সাব্বাস! কিন্তু আমি ভাবি, দাদারা যা-ই হোক, শিখাও কেন ওরকম হবে। সেও নিশ্চয় জেনেশুনেই র‍্যাশন ইন্‌স্পেকটরটাকে চা দেয়, হেসে ঢঙে কথা বলে। সকলের সঙ্গেই তো, যে একটু তাল দিচ্ছে, অমনি নাচছে—নাচছে মানে চোখ নাচাচ্ছে, ভুরু নাচাচ্ছে, শরীর নাচাচ্ছে। মেয়ে বড় ভাল, সকলের সঙ্গেই ভাব খাতির, সবাই বড্ড ভালবাসে, একেবারে উমচু উমচু! সবাই ভালবেসে যা দেয়, তা-ই নেয়, আহ্ কী ভালবাসা গো, একেবারে গড়িয়ে যায়। এদিকে শহরে তো কানপাতা দায়। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে, গল্প লেগেই আছে। সেরকম কাণ্ড কিছু আমার

চোখে পড়েনি কোনদিন, যত রকম শোনা যায়। পড়লে কী হবে বলা যায় না। মেজাজ চড়ে গেলে, ভুকিয়ে ছেড়ে দেব, সে আমার নিজের দাদা হলেও খাতির নেই।

তবে এই মেয়েটার একটা কী আছে, অনেক ছেলেই ওর পেছনে লেগে আছে। আমার কথা বাদ, আমি তো একটা গুণ্ডা। আমার দাদাদের তো এই শহরে খুব নাম-ডাক আছে, বলতে গেলে শহরটা দু'ভাগে ওদের দু'জনেরই। অধিকাংশ লোকই দু' দলে ভাগাভাগি। ওরা পর্যন্ত শিখার দিকে নজর রেখেছে। কেন, তা-ই আমার জানতে ইচ্ছা করে, শিখার কী আছে। একটা কী যেন আছে ওর। আমি তো বলছি, যারা বেশ্যাদের থেকেও খারাপ, ওকে আমার সেই জাতেরই মনে হয়, তবু কী যেন একটা আছে, যেটা আমি বুঝতে পারি না। এই যেমন, আমি—আমি তো গুণ্ডা সবাই জানে, তবু ও আমার সঙ্গে কথা বলে, মেশে। তার চেয়েও সাফ কথা, আমার সঙ্গে ওর আছে, মানে বেশ ভালই আছে। একটা ছেলেতে আর মেয়েতে যা থাকবার, সেই রকমই প্রায় সব আছে। সেটা আমি গুণ্ডা বলে ভয়ে কি না, জানি না। কিন্তু ভয়ে ভয়ে কিছু হলে সেটা বোঝা যায়। মানে, ইচ্ছে নেই, জোর করে কাউকে যদি চুমো-টুমো খেতে হয়, তার যে কী রকম কাঠ কাঠ ভাব, তা আমার জানা আছে। সে রকম কখনো দেখিনি। শুধু তা-ই না, আমি এলে যে শিখা রাগ করে, অসন্তুষ্ট হয়, সে রকম ভাবও বেশী দেখিনি। একেবারে হয় না, তা বলব না, তবে খুব কম। আমি এলেই তো, বাকী খচ্চরদের কাটবার পালা, এমন কি আমার দাদাদেরও। তখনো কিন্তু ও আমাকে চলে যেতে বলে না, রাগ করে উঠে চলে যায় না, মুখ গোমড়া করেও বসে থাকে না। তা-ই বা কেন, ইচ্ছে করলে গা ছেড়ে দেওয়া ভাবে আলগা আলগা কথাও বলতে পারে, কাটিয়ে দেবার তাল থাকলে অনেকে যেরকম করে। কিন্তু তা-ও করে না।

না না, এ আবার একটু বেশী ভাবছি আমি। করে, দু-এক মিনিট একটু কেমন যেন হয়ে যায়, একটু হাসি-হাসি ঠাট্টা-ঠাট্টা, তার মধ্যে একটু জ্বালাও। হয়তো ঠাট্টার মত করে বলে, 'বলুন সুখেন্দুবাবু, আপনার জন্যে কী করতে পারি।' ওরকম কথা শুনলে আমার রাগই হয়, যেন ও সকলের জন্যে কিছু করতেই আছে। এতক্ষণ করছিল অন্যের জন্যে, এবার আমার জন্য করবে। খুব মেজাজ খারাপ থাকলে, আমি এক-আধটা খারাপ কথা বলি, খারাপ খিস্তি আর কি। হয় তো বলি, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, আমার সঙ্গে শুয়ে পড়তে পার, আর কী পার?' এরকম কিছু বললেই কিন্তু শিখা রেগে যায় না। এমন একরকম করে হাসে, যে হাসিতে যেন খানিকটা রাগ বা বিরক্ত ভাব থাকে, সেইভাবে হেসে বলে, 'বাড়িতে গঙ্গাজল আছে, এনে দিচ্ছি, মুখটা একটু ধুয়ে নিন।'

ওরকম করে কথা বললে, আমি আবার বিশেষ কিছু বলতে পারি না, আর তখন ও সপাসপ কথার ছপাট চালিয়ে যেতে থাকে, 'সব সময় সব

জায়গায় একই কথা বলে বেড়াচ্ছ, না ? মুখটা একটু ভাল করতে পার না, সব সময়ে নোঙরা নোঙরা কথাগুলো বলবার জন্যে যেন মুখিয়ে আছ ।'

কিন্তু যে শুয়োরগুলো তার আগে বসেছিল, সে সময়ে ওদের শুয়োর ছাড়া আমার আর কিছু মনে হয় না—আমাকেও নিশ্চয় ওদের ওরকমই একটা কিছু মনে হয়—খচ্চর কুকুর যা হোক একটা, গুণ্ডা তো বটেই, ওদের কথা মনে করে তখনো আমার রাগটা মনের মধ্যে জমেই থাকে, তাই আমি চুপ করেই থাকি । কোন্‌দিন এদের কোন-কোনটাকে আমি হাড় ভেঙে দিতাম । শিখার জন্যেই পারি না, কী জানি কেন । ও ভাল না, আমি জানি, কথা তো সেইখানেই, তবু ওর মধ্যে কী একটা আছে । সে কথা হয়তো কেবল আমারই মনে হয়, একটি বোকচন্দরের মত ওসব ভেবে মরছি, বাকীরা তাওয়ায় রুটি যা সেঁকে নিয়ে যাচ্ছে, তাওয়ার মধ্যে কী আছে, তা ভাবতে তাদের বয়েই গেছে ।

তা হতে পারে, আমার যা মনে হয়, আমি তা-ই বলছি, বোকচন্দর হই, আর যা-ই হই, ওর মধ্যে কী একটা যেন আছে, চোখের মধ্যে, কথার মধ্যে বুঝতে পারি না । অনেক সময় মনে হয়, সেইরকম নাকি, সেই বাবা বাইরে স্যাণ্ডেল ফটর ফটর করছে, আর মা আমাদের কাছে বসে আছে, তখন মাকে যেরকম লাগতো । ধ্-র, নাহ্‌ ! মায়ের সঙ্গে ওর কী । হয়তো বেশ্যাদের চাল এরকম হয়—উঁহু, না না, ওদের আমার দেখা আছে । ওরা শিখা না । আসলে, এরকম অবস্থায়, শিখার যেরকম হওয়া উচিত ছিল রপুটে মেয়ে—শহরে আরো যে রকম আছে, সে তুলনায় শিখা কেমন যেন অদ্ভুত সহজ । এমন সহজ যে, ওর যেন তা হওয়াই চলে না । গলার স্বর বদলে, ভুরু তুলে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, পাছা নাচিয়ে নাচিয়ে চলা এক ধরনের ছুঁড়ি আছে না, রাস্তায় কলেজে সবখানে যাদের দেখতে পাওয়া যায়, বুলির ধরন-ধারণ সবই একটু অন্য রকম, সেরকম একেবারেই না । কে জানে, সেসব আবার ছেলেমানুষি কি না, নাকি সেটাই ছেনালি, জানি না । কিন্তু ওসব মেকীপনার থেকে ওর সোজাসুজি ভাবের টানটা যেন বেশী । আরো কী মনে হয়, ও যেন একটা পাখী, ওর নিজের মনেই আছে । লাফাচ্ছে, পাখা ঝাপটা দিচ্ছে, উড়ছে, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, মরদা এসে ঠুকছে, ঘাড়ে উঠছে, আবার ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কোন বাচ্চা ছেলের গুলতির গুলিটা যেন ঠাস করে গায়ের কাছে পড়তেই সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে, আর যে-ই না বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তখন কেমন একটা মন-মরা, যেন সেটাও এক ধরনের ভয় পাওয়া, কী যেন বিপদ চারদিকে···উরে স্‌সাহ্‌, লে লে সুখেন, অনেক ভেবেছিস । যা বোঝা যায় না, তা নিয়ে এত ভাবার কোন মানে হয় না । মোটের ওপর, যা-ই থাক, ওর মধ্যে কী রকম একটা মায়া মমতার ভাব আছে । মায়া মমতা, সেটা যে ঠিক কী রকম, তাও ঠিক বলতে পারি না, ওই কথাটাই মনে এল, আর মায়া মমতা থাকলেই, কেমন যেন মনে হয় না, তার একটা কি দুঃখও বুঝি আছে ।

দুঃখ ! তাও আবার শিখার ! ওর আবার দুঃখ কিসের। ওকে তো শহরের গণ্ডা গণ্ডা লোক—যাকগে, আমার ওইরকম মনে হয়। আর তা-ই ও যখন বলেছিল, 'প্রজাপতিটা তোমার গায়ে বসেছে, তোমার বিয়ে লাগবে', সেটা যেন কেমন একরকম লেগেছিল। ঠাট্টা করেই থাকুক, আর যাই করুক, প্রজাপতিটা আমি ওকে ধরে দিতে চেয়েছিলাম। ওর গায়ে ছুঁইয়ে দিতে চেয়েছিলাম। দিয়ে বলতে পারতাম, 'তোমার আমার দু'জনেরই গায়ে লেগেছে, দু'জনের এক সঙ্গেই হবে।' মানে, ওর সঙ্গে আমার হবে। খচ্চর প্রজাপতিটা—না খচ্চরীটা, কিছুতেই ধরা দিল না। এখন আমি জানি শিখা কী বলবে। ওর যে রকম কথা, ঠিক বলবে, 'তোমার একটা ডানা যদি কেউ ভেঙে ফেলে, তা হলে কেমন হয়।'...

কিন্তু শিখা যে ফিরেই তাকাচ্ছে না। পিছন ফিরে কী করছে এতক্ষণ ধরে। দেখতে হয়। আমি দেওয়ালের দিকে ওর কাছে গেলাম। ওর ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, গায়ের সঙ্গে লাগানো আস্তে ডানাটা ধরে, শিখা ছেঁড়া ডানাটা যেন জোড়া লাগাবার চেষ্টায় আছে। আর প্রজাপতিটা এখনো ঝাপটাঝাপটি করছে, এক ডানাতেই ফরফর করছে। আর শিখাটা কী ভেবেছে, ও কি সত্যি ছেঁড়া ডানাটাকে জোড়া লাগাতে চায় নাকি। এসব দেখলে, ওকে কী রকম ছেলেমানুষ লাগে। একটা লেখাপড়া জানা মেয়ে যদি এরকম করে, আর এসব দেখলে, ওর যা নামডাক এই শহরে, মানে রেপুটেশন, স্‌সিখা মজুমদার, তাকে যেন ঠিক চেনা যায় না।

তবে প্রজাপতিটা, সত্যি সুন্দর, বিউটিফুল। শিখার আঙুলে প্রজাপতিটার পাখার কালো আর রুপোলি রঙ লেগে গেছে দেখতে পাচ্ছি। কেন এরকম হয়, কে জানে, প্রজাপতির গায়ের রঙটা যেন আলগা, এইমাত্র কেউ লাগিয়ে দিয়েছে, কাঁচা রঙ, তাই হাতে লেগে যায়। এর আগে, আমিও যতবার প্রজাপতির গায়ে হাত দিয়েছি, ঠিক রঙ লেগে গেছে। তা লাগুক গিয়ে ; আমার নাকটা প্রায় শিখার এলিয়ে পড়া চুলের কাছেই। গন্ধ একখানি যা লাগছে না, মিষ্টি মিষ্টি, মনে হচ্ছে, নাক ডুবিয়ে গন্ধটা নিয়ে কপ করে খেয়ে ফেলি, মাইরি ! গন্ধ খাওয়া যায় না জানি, তবু মনে হয়, গপ করে গিলে ফেলি। বললাম, 'ওটা জোড়া লাগাচ্ছ নাকি।'

শিখা নড়ল না চড়ল না, জবাব দিল না, একইভাবে তলতলে নরম গায়ের সঙ্গে, ছেঁড়া পাখনাটা ঠেকিয়ে রাখল, আর প্রজাপতিটা ঠিক ছটফট করেই চলেছে, সামনের শুঁড় দুটো কাঁপিয়ে যাচ্ছে। আমি আর একটু ঝুঁকে উঁকি দিতে চেষ্টা করলাম। শিখার মুখটা প্রায় দেওয়ালের কাছে কি না। আমার মুখ বাড়িয়ে এতটা দেখবার উপায় নেই। কিন্তু যা দেখলাম না, তাতেই মেজাজটা একদম বেকায়দা হয়ে গেল। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা-ই, শিখা ব্লাউজের ভিতরে কিছু পরেনি। আর সামনের দিকে ঝুঁকে আছে বলে, ডোরা-কাটা-কাটা শিকের গরাদ জামাটা বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে পড়েছে। আর তার ভিতর দিয়ে, উহ্‌রে বাবা, হাতে একেবারে বিদ্যুৎ

খেলে গেল। বলেছিলাম, সকালবেলার শিশির শুকিয়ে যাবার পরেই, নধর কপিপাতার মতন—ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছে। তাতে আবার যেমন, কেমন একটা পাউডার লাগানো ভাব থাকে না, ঠিক যেন সেইরকম, একটা বেশ চোখ-জুড়ানো শ্যামলা শ্যামলা চিকচিকনো রঙ। মাঝখানের ফাঁক, আর দু' পাশে গোল হয়ে ওঠা ওটা—ওটাকে সত্যি আমার মাংসপিণ্ড বলতে ইচ্ছে করে না। মাংস ভাবলেই যেন এ জিনিস সে জিনিস থাকে না, সত্যি। মাংস বলে আমার মনেই হয় না, যেন অন্য কিছু, আর কিছু। ওই যে বইয়ে লেখে না, স্তন—আরো যেন কী সব বলে না—কী—কী যেন—গুলি মারো, শিখার ওই বুক দুটোকে আমার স্তন বলতে ইচ্ছা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে, পীনপয়োধরা—নাহ্, হাতটাকে এবার কামড়ে দেব, নয়তো ক্যাত করে একটা লাথি মারব।

আচ্ছা, ওরকম গোল হয়ে বেড়ে উঠেছে বলেই, ওখানকার চামড়াটা কি ওরকম দেখায়, যেন খুব ছোট ছোট বিন্দু বুকে ছড়ানো। যেমন হয় না, গায়ে অনেক সময় কাঁটা দিয়ে উঠলে, গায়ে কী রকম কুঁড়ি কুঁড়ি ফুটে ওঠে, সেই রকম দেখাচ্ছে। আর ওখানটা—বুকের মাঝখানটা আর গোল বুক দুটো হাতমুখের রঙ থেকে বেশী ফরসা। এমন কি বাঁ দিকের জামায় এতটা ঢল খেয়েছে, বাঁ দিকের সবটুকু প্রায় পুরোই দেখা যাচ্ছে। যেখানটা ইঞ্চিখানেক জায়গা যেন গোল করে খয়েরি রঙ লাগানো, ওখানটা যে কেমন, সবই আমার জানা। ওর গা'টা তো আমার চেনা, সবরকম স্বাদই নেওয়া আছে, তবু একটা ভিখিরির মত হ্যাঙলাপনা, কিছুতেই আমার যেতে চায় না। কেন, আমি তাই ভাবি। ব্যাপারটা তো সেই একই। যতবারই কিছু করতে যাব, ঘুরে ফিরে সেই একরকমই লাগবে। অথচ মনে হয়, প্রত্যেকবারই যেন নতুন লাগবে। এই যেমন, এসব ভাবতেই মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে থাকতে পারছি না, ফুরিয়ে যাচ্ছে, এখনি হাতটা বাড়িয়ে দিই।

শিখার গায়ের ছোঁয়া প্রথম যেদিন পাই, সেই দিনটার কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমার অনশন ধর্মঘট চলছে—উ রে স্‌সাহ্, মনে করে এখন আমার চিত হয়ে শুয়ে, ওপরে পা তুলে ভ্যাক ভ্যাক করে হাসতে ইচ্ছে করছে। আমি আবার অনশন ধর্মঘটও করেছি! কলেজে সেটাই আমার লাস্ট ইয়ার। বুঝেছিলাম, ডিগ্রি কোর্স-এর ডিগ্রি ডিঙনো আমার দ্বারা আর কোনদিনই হবে না। পড়ে-টড়ে পাশ করা, ওতে অরুচি। পড়লে কী হবে, মনেই থাকতো না। আর মনে না থাকার দোষ কী। কলেজে তো ধূমধাড়াক্কা রোজই লেগে ছিল। আজ এই, কাল সেই, আর আমি তো দলের পাণ্ডা। এই যে আমি, এখনকার আমি, যাকে সবাই সুখেন গুণ্ডা বলে, তার হাতেখড়ি কলেজেই। দলাদলি আর মারামারি, তখন থেকেই। তা বলে, সবাই কি আর আমার মত গুণ্ডা হয়েছে। আমিই হয়েছি। আমার তখন সেটাই নেশা, কলেজের মাস্তান। আমার দলের বন্ধুরা আমার মাস্তানি খুব ভালবাসতো, আমি তাদের হিরো—স্‌সাহ্ হিরো

ছিলাম ! চা সিগারেটের ভাবনা ছিল না, যখন যার কাছে চাইতাম, সে-ই খাওয়াতো। চাইবারও দরকার ছিল না, নিজে থেকেই খাওয়াতো অনেকে।

ও সবে আরো নেশা ধরে গিয়েছিল, স্যারদের জন্যে। বাইরে থেকে টের পাওয়া যেত না, কিন্তু ওহ্‌রে বাবা, আমাদের দলাদলির মধ্যে ওরা ছিল সর্ষের মধ্যে ভূতের মতন। অথচ সামনাসামনি স্যারেরা এমন থাকতো, হেসে গলে, 'এই যে কেমন আছেন ভাই যশোদাবাবু।'—আর যশোদাবাবু অমনি, 'আর বলেন কেন বেণীবাবু, শরীরটা কিছুতেই...।' এই রকম সব কথা বলতো, কিন্তু ভিতরে খোঁজ নিয়ে দেখ, একেবারে হিন্দুস্থান পাকিস্তান। দিনরাত্রিই হুঙ্কার দিয়ে আছে। লড়তাম তো আমরা। যশোদাবাবু আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে কথা বলতেন, চা খাওয়াতেন, সলা পরামর্শ দিতেন, চান্স পেলে কলেজেই দু-এক কথা ফিস্‌ফিসিয়ে বলে দিতেন। আর রেগে গিয়ে কখনো বলতেন, 'ওদের মেরে ঠাণ্ডা করে দাও তো।'

আবার কী চাই। স্‌সাহ্‌ যশোদাবাবু বলেছেন ! তা ছাড়া, লম্বরটা মারতে হইবে তো। যশোদাবাবুর সাবজেকটে কোনদিন ফেল করিনি। আর কপালে থাকলে ফাইনালের সময়, যশোদাবাবুকে যে ক'দিন ইনভিজিলেন্সে পাওয়া যেত, সে ক'দিন মার কাটারি। ঝেড়ে যাও বাওয়া, এমন দিন কি হবে মা তারা ! তেমনি আবার বুনো ওলের বাঘা তেঁতুল, যদি বেণীবাবু খচ্চরটা পড়ে যেত, সবাই তো যে-যার কোল সামলাচ্ছে। আমাদের যেমন যশোদাবাবু, অন্যদের তেমনি বেণীবাবু। এই দু'জন না খালি, দলাদলিতে অনেক স্যারেরাই ছিল। দল ছাড়া, স্যারদেরও উপায় নেই। সব স্যারেরাই দল করে। পিছনে স্যারেরা আছে, স্যারেরা খাতির করছে, ওটা অনেকটা খুঁটির জোরের মতন। লেগে যাও বাবা। আমার তো আবার একটু বেশী খাতির ছিল, কেননা, ঝাঁপিয়ে পড়লে, আমার আবার মিনমিনানি ভাল লাগে না। এসপার নয় ওসপার। সেইজন্যেই বন্ধুদের কাছে বল, আর স্যারদের কাছে বল, আমার খাতিরটা একটু 'ইসপেশাল'।

পালটা গ্রুপের মধ্যেও দাঙ্গাবাজ ছোঁড়া ছিল। তার মধ্যে তো এখন একটা আমারই সাকরেদ হয়ে গেছে, শুটকা যার নাম। স্‌লার নাম দেখ দেখি, ডাকনাম আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ছেলেবেলাতে নাকি খুব শুটকো ছিল। আর এখনই বা কী হয়েছে, নধর গোপাল ? না, ওকে গাল দেব না, আমার দলের লোক, আমাকে গুরু বলে ডাকে। পালটা গ্রুপ দু'বার আমার মাথা ফাটিয়েছিল, দু'বারই সেলাই দিতে হয়েছিল। কিন্তু ওদের সাতটার মাথা ফাটিয়েছি। ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার পেছন টান ছিল না। অথচ আমি যে আগের থেকেই হাতা গুটিয়ে থাকতাম, তা না। কী যে স্‌সাহ্‌ আমার ভাল লাগতো, তা জানতাম নাকি। জানতাম, পড়তে হবে, পাশ করতেই হবে, তারপরে তুমি চুল ছাঁটো গিয়ে বা ঘাস কাটো

গিয়ে। মাইরি, আমি সত্যি কিছু বুঝতেই পারতাম না, কেন পড়ছি, কেন পাশ করতেই হবে, আর আমি কী হব ! তা-ই কলেজের রঙবাজী বেশ লাগতো। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং, নানান কথা শুনতাম। বুঝতে পারতাম, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

বড়দা কেন ব্যবসায়ী হয়েছিল, মেজদা কেন চাকরী করতে গিয়েছিল, তাও যেমন বুঝতাম না, নিজেরটাও তেমনি বুঝতাম না। বাড়িতে আসছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি—মা তো ছিলই না, বাবা তখনো রিটায়ার করেনি, বরং একটা নেশা মরে গিয়ে, মায়ের কথা বলছি, বাবা কেমন একটু নেতিয়ে পড়েছিল। তবে সেটা টের পাওয়া যেত না তখন, ঘুষ ত্যালানি সমানই চলছিল, কাজ নিয়ে আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তখন অবিশ্যি আমাকে একটু কাছে টানবার চেষ্টা করেছিল। কাঁচকলা ! আমার ওসব ভাল লাগলে তো। মা মরে যাবার পরে, তবু যা হোক, কিছুদিন ডাকলে কাছেপিঠে যেতাম। একটু বড় হয়েই ওসব আর ভালো লাগতো না। তুমি থাকো গিয়ে তোমাকে নিয়ে, আমি আছি আমাকে নিয়ে। কী দরকার বাবা জ্বালাতন করবার। বড়দাটা একটু অন্যরকম ছিল, বাবার সঙ্গে কেমন যেন ওর একটু পোট খেত। মেজদার আবার অত না। অথচ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, বড়দা যে বাবার কাছে গিয়ে বসতো, কথা বলতো, যেন ও কতই হোমরা-চোমরা দিগ্‌গজ হয়ে উঠেছে, সত্যি বড়দাটা বরাবরই কীরকম, সাধু চোর হলে যেমন হয়, সেরকম মনে হত, কিন্তু বাবা ওকে সেরকম ঠিক আমল দিতে চাইতো না। ও ভারী ভারী গলায় পাকা কথা বলে যেত, আর বাবা, যেন শুনছেই না, ঠিক যেন বাবার কোন একটা ফ্যালসা সাবরডিনেট,'স্যার স্যার' করেই যাচ্ছে, আর বাবা নিজের মনে অন্যদিকে চেয়ে হুম্ হাম্ দিয়েই যাচ্ছে। যেন বাবা ভাবছে, 'আরে সে তো অনেক শুনেছি, কিছু আমদানি-টামদানি ঘটছে ?' অনেক সময় যেমন শুনতে পেতাম, সেই যে ওভারসিয়ার না কী, বোস না ঘোষ, শেয়ালের মতন চেহারা, স্‌সাহ্ কথাও বলতো যেন হুক্কাহুয়া করে, 'স্যার ওরা বলছিল, ব্যবস্থার কিছু এদিক ওদিক হবে না, বরাবর যা হয়ে এসেছে, সে তো হবেই, কিছু না হয় বেশীই...।' ব্যস, ফাদারের অমনি ভুরু টান হল, কোঁচকালো, তারপরে মুখ তোলা হল, 'অ, তাই নাকি।'

ওসব রমজানি অনেক দেখেছি, কারণ বাড়িটা তো ছোটোখাটো একটা অফিসই ছিল। বাবা থাকলে লোকজন সব সময়েই থাকতো। তবে সেসব হত কোন কারণে অফিসে না যেতে পারলে বা শরীর খারাপ হলে। মা মরে যাবার পর অফিসের কাজকর্ম বাড়িতে আর বিশেষ হত না। তা-ই বলছি, বাড়িতে আসছি যাচ্ছি খাচ্ছি-দাচ্ছি, আবার বেরুচ্ছি। তখন দলের বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকা ছাড়া করবারই বা কী ছিল। বড়দা মেজদা বাড়িতে থাকলে, ওরা নিজেদের ঘরে নিজেদের বন্ধুদের নিয়ে থাকতো। নয়তো একলা একলা। কাছাকাছি হলে দু'জনে তর্ক আর ঝগড়া। দলের ঝগড়া, এ বলে ওকে দালাল, ও বলে একে দালাল। আমাকে আবার দু'জনেই

দু'জনের দলে টানবার চেষ্টা করতো, করছে এখনো, করেও যাবে। বড়দা যে ব্যবসা করে, আর মেজদা যে চাকরি করে, যেন সেসব আসলে কিছুই না। রাজনীতিটাই ওদের আসল কাজ! কলেজেও তো ওদের দল ছিল। ওরা সেই কলেজেরই ছাত্র ছিল, আর কলেজ থেকেই ওরা প্রথম ঝগড়া করতে আরম্ভ করেছিল। আর এখন তো এই শহরে, ওরা দু'জনে দুই দলের নেতা। ওরা যখন কথা কাটাকাটি করে, আমি তখন ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলি, 'নারদ নারদ, লেগে যা; লেগে যা।'

অমনি ওরা আমার ওপর চটে ওঠে, দু'জনেই চীৎকার করে গালাগাল দেয়। একজন বলে, 'তুই তো একটা মূর্খ।' আর একজন বলে, 'একটা গুণ্ডা।' 'একটা লম্পট।' 'একটা মাতাল।' আমি বলি, 'আর তোরা কী!' আসলে বয়স তো আমার থেকে কারুরই খুব বেশী না। বড়দা আমার থেকে সাড়ে তিন বছরের বড়। ও বলে চার বছরের। মেজদা বছর দুয়েকের। তা, আমার কলেজে পড়ার সময়, বাড়িতে প্রায় কেউই থাক্‌তো না। আমার বাড়িতে ঢুকতেই ইচ্ছা করতো না। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতাম, লেখাপড়া-টড়া করার জন্যে, বা যে কোন কারণেই হোক, আমার যেন সবই কেমন আলাদা আলাদা ছাড়া ছাড়া লাগতো। কথা নেই, যাঃ স্‌সাহ্‌, অসময়ে ঘুমোতে আরম্ভ করে দিলাম, নয় তো, রান্না হতেই খাবারের জন্য চীৎকার চেঁচামেচি, না পেলে ঠাকুরের পেছনে লাগা, ঝিকে গালাগাল দেওয়া। কী যে করব ঠিক ভেবেই পেতাম না। অনেকদিন এমনও মনে হয়েছে, ঘরদোরগুলো সব অগোছালো করে তছনছ করে দিই, বাবার টেবিলটা এলোমেলো করে রাখি, নয় তো ঘরের মধ্যে প্রস্রাব করে দিই। এসব যে একেবারে করিনি, তা না। বাবার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের তলায় একদিন দিয়েছিলাম ছরছরিয়ে। ওহ্‌, সে কী দুর্গন্ধ মাইরি! বাবা তো নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আর কী চীৎকার, বাড়িটা ফাটিয়ে ফেলে আর কী। কিন্তু সব ভ্যাবাচাকা ভ্যাবাগঙ্গারাম হয়ে গিয়েছিল। কারণ এসব তো ভাবাই যায় না, কেউ এমন কাজ করতে পারে। আমি নিজেই তো অনেকবার ভেবেছি, 'আচ্ছা, এই কাণ্ডটা করলাম কী করে।' অবিশ্যি বাড়ির সকলের অবস্থা দেখে, বাথরুমে গিয়ে খুব হেসেছিলাম, উহ্‌রে সাবাস, কী হাসি আমার। তবু বাবার টেবিলের তলায় কী করে ওরকম একটা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড করা যায়, আজও তা বুঝতে পারি না। অথচ ভাবলে, এখনো খুব হাসি পায়।

কিন্তু ওরকম, কোন কিছুর ঠিক নেই, সিনেমা দেখছি, চা-সিগারেট খাচ্ছি, আড্ডা মারছি, কলেজে যাচ্ছি, দলাদলি মারামারি করছি, মেয়েদের পেছনে লাগছি—কলেজটা কো-এডুকেশন তো। যেসব মেয়েরা আমাদের দলে ছিল, তাদের সঙ্গেও আড্ডা দিচ্ছি, দু' তিনটে স্পট ছিল, যেখানে গিয়ে একটু দিলালি করছি—প্রেম ঠিক বলা যাবে না, তখন আবার ওসব তেমন মনের মধ্যে জমে ওঠেনি। ওই আর কি, একটু সুহাগ যাকে বলে। তবে তার মধ্যে কয়েকজন ছিল, তারা রীতিমত হাত্তা

চালাতো। দুটো জায়গা ছিল, সামনে চা আর খাবারের দোকান, ভিতরে অন্য ব্যবস্থা। ওখানে আবার দল বেঁধে নয়। পেয়ার পেয়ার। দোকানদারকে তার জন্যে কিছু মালকড়ি দিতে হত, ঘণ্টা কাবারি হিসাব। সেসব সকলের জানাজানি ছিল না। জানাজানি ছিল কেবল নিজেদের গ্রুপের মধ্যে। সেসব জায়গা ছিল প্রেম করবার। তা ছাড়া দু'জনে দু'জনে সিনেমা দেখতে যাওয়া ছিল। সেটা একটু অসুবিধার ব্যাপার ছিল, শহরের মেলাই লোক, আর অনেকেই জানাশোনা। একবার তো, আমাদের গ্রুপের একটা ছেলে আর মেয়ে সিনেমা হলে ধরাই পড়ে গেল। দু'জনে খুব মুচু মুচু চালিয়েছিল, আর দুটোকেই ধরে একেবারে প্রিন্সিপালের সামনে। স্‌সাহ্‌ রগড় কাকে বলে। ওরকম ব্যাপার ভাবতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে, এত ব্যাপার ঘটেছে। আর সিনেমায় না গেলে, গ্রামের দিকে মাঠে ময়দানে।

আমারও যে ওরকম দু' একটা জুটি জোটেনি, তা না। এখন ভাবলে তো আমার খুব অবাক লাগে, একটু-আধটু চুমো-টুমো খাওয়া ছাড়া কিছু করিনি। আসলে তখন আমার ঠিক সেরকম কিছু ইচ্ছা হত না। বোধ হয় যৌবনের ফুল ফোটেনি। স্‌সত্যি ? বল, ফোড়া ওঠেনি। কিন্তু যা-ই হোক, মোটের ওপর তখন এরকম মাংস-খেকো বাঘ হইনি, এই কয়েক বছরের মধ্যেই যেরকম হয়ে উঠেছি। একবার খালি, অমিতা বলে একটা মেয়ে, স্‌সাহ্‌ অমন লিকলিকে কালকুটি মেয়েটার নাম কোন বেয়াদপ যে অমিতা রেখেছিল, জানি না। যেমন তার খটং খটং চলা, তেমনি তার চিম্‌সে পিছনের নাচানি। আমি নিজের কানে শুনেছি, শহরের রিকসাওয়ালাগুলো পর্যন্ত ধর ধর করে উঠতো। তার সঙ্গে একবার আমাকে দোকানের পিছনের ঘরে যেতে হয়েছিল। আহ্‌ একেবারে লিজ-এর মতন আমার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুখেন ছাড়া সে কিছু জানে না, সুখেন ছাড়া বাঁচবে না। গৌর বিনা প্রাণ বাঁচে না, কী যন্ত্রণা…সেইরকম আর কী। ওর ওটা কী ভাই, বুক না তক্তা। অন্য জায়গার কথা আর নাই বা বললাম।

যাকগে, তা-ই বলছি, এইসব করছি, বাড়ি আসছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, তার মধ্যে দেড়শো টাকার মাস্টার মশাই ঠিক ছিল, ফাদারের সেদিকে নজর ছিল ঠিক, টাকা যতই লাগুক, খরচ করে ছেলেকে মানুষ করতেই হবে। একজন না, আবার দু'জন মাস্টার। কোথা থেকে টাকা আসছে, সে খোঁজে যেও না। মাস্টাররা ভাবছিল, চলুক চলুক, এমন দুধেল গাইয়ের মত ছেলে না থাকলে, চলে কেমন করে। 'বুঝতে পারছ তো ? ড্যু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ?' জবাব একেবারে রেকর্ড করা, 'হ্যাঁ স্যার।' ওদিকেও জবাব রেডি করা, 'ভেরি গুড ?' একেই বোধ হয় সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি বলে। আর ভাবতাম, বাবার টাকা আছে, আশা আছে, ছেলে ন্যাকাপড়া শিখবে, চালিয়ে যাও পান্‌সি। এইসব মিলিয়ে আমার এক এক সময় কী রকম মনে হত, আমি যেন সেন্‌স্‌-এ নেই। কীরকম একটা

আলগা আলগা ভাব, গা ছাড়া, যেন হাওয়ার ওপরে চলছি। সত্যি, আমার সেরকমই মনে হত, কী করছি, কী করছি না, কিছুরই যেন ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। সেরকম অবস্থায় বাবার টেবিলের তলা যে নোঙরা করে দেব, এ আর আশ্চর্য কী। আমার তো আরো অনেক কিছুই মনে হত। মনে হত, গোটা বাড়িটা চারিদিকে নোঙরা করে দিই। বাবার টেবিলের কাগজপত্রে এমনভাবে আগুন লাগিয়ে দিই, যাতে কিছুতেই ধরতে না পারে, কী করে ওরকম কাণ্ড ঘটলো। না হয় মেজদার ঘরের বই-পত্র, বড়দার ঘরের দামী দামী জিনিসগুলো সব নষ্ট করে দিই। আমার তখন নিজেকে অনেকটা ভূতে পাওয়ার মতন মনে হত। সব সময়ে না, এক এক সময়। ওদের ওপর আমার কেমন একটা ঘেন্না ছিল, যেন ওরা যে যার নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত, দেশটা মাথায় করে চলেছে। হয় পড়ার কথা জিজ্ঞেস করবে, না হয় দু'জনে দু'জনের দলে টানবার চেষ্টা করবে। বড়দা চাইতো, কলেজে ওদের দলের ছাত্র গ্রুপের সঙ্গে যেন আমি থাকি। মেজদাও তাই চাইতো। আমার অবিশ্যি কোন দলের ওপরেই কোন টান ছিল না। যেখানে আমার পোট খাবে, মাস্তানি চলবে, আমি সেই দলেই যাব।

আমাদের কলেজে একটা সুবিধা ছিল। বড়দা মেজদাদের দল শহরের বেশ জোরদার হলেও কলেজে অন্য একটা দলের বেশ দখল ছিল। যশোদাবাবু আবার সেই দলের নেতা ছিলেন। কলেজে না, বাইরে। শুনেছি, সেই দলের তিনি বেশ হোমরাচোমরা, বাইরে সভা হলে বক্তৃতা করতেও দেখেছি। তবে যশোদাবাবুটিকে আমার কেমন একটু বেঁটে-সেটে মোটা মেটেরঙ দু'মুখো ঢ্যামনা সাপের মতন মনে হত। বয়স কত, পঞ্চাশ না ষাট, বুঝতে পারা যায় না। দাঁতগুলো সব নকল ঝকঝকে শাদা! কালো মুখটা ছিল আবার পাঁউরুটির মত ফুলো ফুলো। দেখলেই মনে হত, লোকটার রোগের শেষ নেই, আমাশা ডায়াবেটিস, তার ওপরে সব থেকে বেশী ছিল রগচটা গোছের। কিন্তু সেসব আমাদের সঙ্গে, যেন সব সময়ে একটা খেচোরাম ভাব। আমার মনে হত, ওসব লোকটার চালাকি, আমাদের কাছে খুব বড় কিচ্ছু একটা সাজবার চেষ্টা। সেই, সেই যে বলে না—ধুত্তেরি, কথাটা যে কী—হ্যাঁ, যেন একটা জীনিয়স। আঙুল তুলে তুলে, ধবধবে শাদা কৃমি কৃমি রঙ চোখ পাকিয়ে গলার শির ফুলিয়ে খালি লেকচার মারতো। কিন্তু এমনভাবে আমাদের বুদ্ধি দিত, যেন আমরা কলেজে দুটো দলকেই এলিমিনেট করে দিতে পারি। তিসরি দল যাকে বলে, আমি ছিলাম সেই দলের, আর কলেজের দলাদলিতে, আমাদের দলটাই ছিল ভারী। আমি হয়তো অন্য দলেও যেতে পারতাম, দু' একবার যে বদলাবদলিও করিনি তা নয়, তবে বড়দা মেজদার দলে আমার কিছুতেই যেতে ইচ্ছা করতো না।

আমি ওসব দল-টল জানি না, ওদের দু'জনের চরিত্তির তো আমার জানা ছিল। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কি. ওরা আমার ওপর খবরদারি

করবে, নেতাগিরি ফলাবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। দিনরাত্রি লঙ্কা ভাগাভাগি, আর স্‌সাহ্‌, গায়ে ল্যাংটা—মানে ওরা আসলে মানুষ যে রকম, চিনি তো, অথচ যেন কী একেবারে হ্যাট-কোট গায়ে দিয়ে চলেছে, সেরকম একটা ভাব, আমার দু'চক্ষের বিষ। আমি বুঝতেই পারি না, কেন ওরা দল করে, আর ওসব বলে। দল যাই হোক, তোরা নিজেরা কী, তাই দ্যাখ। কিন্তু কে বলবে, ল্যাংটা হয়েও যে বলবে আমি বেশ পোশাক-আশাক পরে সভ্য ভব্য আছি, তাদের কিছু বলবার নেই। ওদের আমার সেইরকম মনে হয়।

যশোদাবাবুটিও তাই। তবে তিনি তো আমার দাদা নন, তাই মাস্তানি করতে হল, সে দলে থাকাই আমার ভাল। কিন্তু ও লোকটারও একটা ব্যাপার আশ্চর্য, একেবারে গালাগাল দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, খচ্চরটার ন'টা ছেলেমেয়ে, মাইরি! স্‌সাহ্‌, রাগের চোটেই করেছে, নাকি সেই প্যানতাখ্যাচা বউটাকে লেকচার দিতে দিতেই এই কাণ্ড করেছে, কে জানে। ন'টা ছেলেমেয়ে! সেই পাঁউরুটি মার্কা ফুলো ফুলো মুখে, বাঁধানো দাঁতে, কৃমির মতন শাদা রক্তশূন্য চোখে দলাদলির প্যাঁচ-পয়জার কষে, আর কী করে সম্ভব! এখন তো বুঝতে পারি, মাস্তানি যে আমি ভালই পারি, তাই জেনে আমাকে সবসময় তোয়াজ করতো। বড়দা মেজদার রোয়াবির থেকে, যশোদাবাবুর ত্যালানিই আমার ভাল লাগতো। সেজন্যেই বাড়িতে দাদাদের সঙ্গে আমার কোনরকম মিল ছিল না। আমাদের কারুর সঙ্গেই কারুর মিল ছিল না, আমরা সব টুকরো টুকরো, ছেঁড়া ছেঁড়া, অথচ আমরা এক মায়ের পেটেই জন্মেছিলাম। ওই পেটে জন্মানো পর্যন্তই. কেউ কারু না। বাবাও তাই ছিল। বাবা একটা লোক, বড়দা একটা লোক, মেজদা একটা লোক, আমি একটা লোক। সব যে-যার আলাদা, যে-যার নিজেকে নিজেকে নিয়ে আছে। স্‌সাহ্‌, আমার ঐইটা বয়ে গেছে, ঠিক এরকম আমার মনে হত। সুখেন তোদের মুখে ইয়ে করে দেয়, এরকম মনে হত। কেউ ঘুষ ত্যালানিতে মজে আছে, কেউ দল আর রাজনীতি করছে, আর আমি যা ইচ্ছা তাই করছি। তারপরেও যে আমি সকলের ঘর নোঙরা করিনি, জিনিসপত্র নষ্ট করিনি, সেটাই তো যথেষ্ট।

এক একদিন, আমার মাইরি, কী রকম ভয় করতো। এখন ভাবলে খুব হাসি পায়। হয়তো দুপুরবেলা একলা ঘরে বসে আছি, হঠাৎ আমার গায়ের মধ্যে কীরকম করে উঠতো। বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠতো, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। যেখানে বসে থাকতাম, সেখান থেকে উঠতে পারতাম না। মনে হত, উঠলেই কেউ আমাকে ঘাড় মুচড়ে দেবে, চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। কেন এরকম মনে হত, আমি জানি না। হাতে পায়ে কোন জোর থাকতো না, আর বুকের কাছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে উঠতো, চোখ থেকে যেন জল এসে পড়তো, অনেকটা কান্নার মতন। অথচ আমি সবই

দেখতে পেতাম, শুনতে পেতাম, বাড়ির বাইরে লোকজন চলা... করছে, পিছনের একটা আমবাগানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করছে, মেজদা হয়তো একটা ঘরে আমাদের ঝিয়ের ষোল-সতর বছরের মেয়েটাকে সেইসব করছে—আমি কয়েকদিন দেখেছিলাম কিনা, ফ্রক পরা ধুমসো বেঁটে ভোঁদকা, জন্তুর মতন চোখ, আর পায়ে মেলাই কালো কালো লোম মেয়েটাকে মেজদা গায়ের এখানে ওখানে খামচে খামচে আদর করছে, আর মেয়েটা তাড়কা রাক্ষুসীর মত হাসছে, অথচ লজ্জা লজ্জা ভাব। ওদিকে ঝি চাকর ঠাকুরদের কথাবার্তা কাজকর্ম, সবই দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। অথচ আমার হঠাৎ কেমন একটা ভয় করে উঠতো, আর গায়ের মধ্যে থরথর করতো, মনে হত, সেই একটা লোককে দেখেছি, যে মুচ্ছো না মিরগি রুগী বলে হঠাৎ পড়ে গিয়ে, অজ্ঞান হয়ে যায়, মাটি খামচে ধরে, মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠতে থাকে, আমার যেন সেইরকম হবে।

তখনই আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতাম। জোরে হাত পা ছুঁড়ে ঘরের মধ্যে দৌড়ে লাফিয়ে এমন জোর চীৎকার করে উঠতাম, গোটা বাড়িটা হকচকিয়ে উঠতো। ছুটে ঘরের বাইরে গিয়ে, একেবারে আমাদের বাগানের মধ্যে চলে যেতাম। তখনো যদি মনে হত, ভিতরে সেই ভয়ের ভাবটা আছে, তা হলে এদিকে ওদিকে ইঁট ছুঁড়ে, গাছপালা মুচড়ে, একটা যা-তা কাণ্ড করতাম। ততক্ষণে ঠাকুর চাকর ঝি, সবাই ছুটে আসতো। কেউ বারান্দায় দাঁড়াতো, কেউ বাগানের কাছে। চেঁচিয়ে বলতো, 'কী হচ্ছে কি, অ্যাঁ? ছোট খোকা, তুমি চন্দরমল্লিকের গাছটা ছিঁড়ে ফেলবে, বাবু কী রকম রাগ করবেন জান?'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তাম। পিটপিট করে সকলের দিকে তাকাতাম। আমার ভিতরের ব্যাপারটা ততক্ষণে কেটে গেছে। কিন্তু ওদের কাউকে সে কথা বলতে পারতাম না। ওদের বলব কী, আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারতাম না, সত্যি সেরকম কিছু হয়েছে, তাই খুব জোরে হো হো করে হেসে উঠতাম। আর ওরা সব নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করতো। বুঝতে পারতাম, চোখে চোখে চেয়ে, ওরা নিজেদের মধ্যে মনে মনে বলাবলি করছে, 'দেখছো, কী রকম বদ ছেলে। কথা নেই, বার্তা নেই, কী রকম বদমাইশি জুড়েছে।' আমি কিন্তু খুব জোরে হাসতেই থাকতাম, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের দিকে চেয়ে কাঁচকলা দেখাতাম। ঝি হয়তো বলতো, 'ছি ছি ছোট খোকা, কী করলে বল তো?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলতাম, 'বেশ করেছি! আরো করব।'

সে কথা শুনে ওরা যেন অবাক হয়ে যেত। ঝি বলতো, 'তুমি এত বড় হয়েছ, তোমার কি এসব ভাল দেখায়। বাবু কী বলবেন বল তো!'

আবার কাঁচকলা দেখাতাম, বাবু আমার এই করবে! কিন্তু তখন আমি কিছুতেই ঘরের দিকে যেতাম না। পুরনো চাকর শুলা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। ওকে আমি আমার জন্মের পর থেকেই দেখে

আসছি। ও প্রায় বাবার সমবয়সী, আমরা শুলাদা বলে ডাকি। এই রকম নামের মানে কী, তা জানি না বাবা। শুটকার তবু একটা মানে বুঝি, কিন্তু শুলা যে কারুর নাম হতে পারে, এ আমার মাথায় কিছুতেই আসে না। যতদিন জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা শুলাদা, তোমার নাম শুলা কেন', কোনদিনই সে ঠিক জবাব দিতে পারেনি। খালি বলে, 'নামে কি এসে যায় গো।' ওইসব ওগো হ্যাঁগো নাগো খুব বলে সে। আমি বলতাম, 'নামে যদি কিছু না আসে যায়, তবে তোমার নামের আগে একটা 'আর' বসিয়ে দাও শুলাদা।' শুলাদার সেদিকে খুব বুদ্ধি, বলতো, 'আরশুলা বলছ? তাও হতে পারে। লোকের নাম মাছি হয়, তাও শুনেছি গো। কেন, ব্যাঙ নাম শোন নাই, পাশের বাড়ির চাকরটার নাম তো ব্যাঙ।' তখন আমার আবার অবাক লাগতো, সত্যি এরকম অদ্ভুত নাম মানুষের হয় কী করে। জিজ্ঞেস করতাম, 'আচ্ছা এরকম নাম কেন রাখে?'

শুলাদা বলতো, 'কেন আবার, ছেলেপিলে বেশী হলে, তখন বিরক্ত হয়ে লোকে ওরকম নাম রাখে। মাছি যেমন ঝাঁক বেঁধে জন্মায়, ব্যাঙ যেমন গাদা গাদা জন্মায়, সেইরকম। ভাবে, ওরকম একটা নাম রাখলে, আর ছেলেপিলে জন্মাবে না। আবার দেখতে খুব ছোটখাটোটি হলেও মাছি নাম রাখতে পারে, ব্যাঙ ব্যাঙ দেখতে হলেও ব্যাঙ নাম রাখতে পারে।'

এই রকম সব জবাব দিত। পরে আমি যখন বড় হলাম, তখন শুলাদাকে বলতাম, 'তোমার নামের শু-এর উ-কারটা কেটে দিয়ে একটা আ-কার করে দিলে বেশ হয়।' শুলাদা একটু-আধটু লেখাপড়াও জানতো। প্রথম দ্বিতীয় ভাগ পড়া ছিল, তাই মনে মনে একটু ভেবে, হেসে বলতো, 'শালা বলছ?' তারপরে আবার হাসতো, হি হি করে হেসে বলতো, 'লেখাপড়া শিখে খুব পাজী হয়েছ।' তা বলে আমি কোনদিন শুলাদাকে শালা বলে ডাকিনি, ফাজলামি করার জন্যেই বলতাম। ওর মোটা কালো গলায় কণ্ঠী আছে, তুলসী না কাঠের মালা বলে, সেই জিনিস, আর ওর চোখগুলো ঠিক গরুর মতন। গরুর মতন বড় বড়, চাউনিটাও যেন সেইরকম। অথচ গরুর চাউনি দেখলে যেমন গায়ে লাগে না, ও তো দুটো গরুর চোখ, কিছুই বুঝতে পারছে না, শুলাদার ঠিক সেরকম না। সে আমার দিকে চেয়ে থাকলেই মনে হত, সে যেন আমার ব্যাপারটা ধরে ফেলবে। তাই আমি তার দিকে বেশী তাকাতাম না। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে ও আমাকে এত বেশী কোলে পিঠে করেছে, মনে হয়, আমার নাড়িনক্ষত্র জানে। আমার দিকে চেয়ে থেকে সে বলতো, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি গো ছোট খোকা, অ্যাঁ, বল তো।' আমি বলতাম 'তোমার মুণ্ডু হয়েছে।' তারপরে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে যেতাম! আমি জানি, ওরা ভাবতো, আমি ভীষণ পাজী নচ্ছার আর একগুঁয়ে হয়ে উঠেছি। সবাইকে খালি জ্বালাতন করতে চাই। তেএঁটে বদমাইস হলে যা হয়, সেরকম আর কী। অথচ ব্যাপারটা কাউকে বলতে

পারতাম না, বোঝাতেও পারতাম না, আর আমি এমনিতেও ছটফটে দুরন্ত ধরনের ছিলাম তো, একটু হাত পা ছোঁড়া মেজাজী, ঠিক কিছুই যেন মনের মতন হত না, সকলের ওপরেই কী রকম একটা রাগ রাগ ভাব। তাই সবাই ভাবতো, আমি খালি বদমাইসি করছি।

কিন্তু মেজদা বা বড়দা—বড়দা তো তখন বেশ তুখোড় খচ্চর হয়েছে। মেজদাটা ভিন্ন জাতের, হ্যাংলা কুকুরের মতন, যা পায় তাই খায়। না হলে ঝিয়ের সেই মেয়েটাকে কেউ খামচে আদর করে! বড়দার আবার অন্যরকম, তখন ও মাঝে মধ্যে ধুতি পাঞ্জাবী পরে, আর চেহারাটা তো খানিকটা মেয়েমানুষ মার্কা, আব মেয়ে বন্ধু ওর বিস্তর। কী জানি মেয়েলি ধরনের চেহারা, ফরসা, সুন্দর, নরম নরম. মিষ্টি হাসি, ছাল ছাড়ানো আলুসেদ্ধ মতন পুরুষ দেখলে মেয়েদের এত খাই-খাই ভাব হয় কেন। ওকে দেখলেই মেয়েরা কাত। আমার তো ধারণা, বড়দার মতন ছেলেকে নিয়ে মাখামাখি করবে কাবুলের মতন পুরুষেরা। জানি না, ছেলেবেলায় সেরকম কোন পুরুষের পাল্লায় কোনদিন পড়েছে কিনা—পড়েনি কী আর! শহরে ওরকম অনেক ছেলেকেই আমি জানি। আমার তো ভাবলে কেমন গা ঘিনঘিন করে, কিসের সঙ্গে কী। তা বড়দাকে দেখেছি, শুধু মেয়েরা না, অনেক বউ, যুবতী বিবাহিতারাও ওর কাছে আসে, আড্ডা দেয়। এত মেয়ের ধকল ও সামলায় কী করে, কে জানে। এদিকে তো ছোটখাটো নরম নরম মানুষটি দেখলে মনে হয়, ভাজার মাছটি উলটে খেতে জানে না। জানে না আবার! আমি নিজের চোখে দেখেছি নন্দ ডাক্তারের মেয়ে কৃষ্ণাকে ওর ঘরের মধ্যে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমো খাচ্ছে। কেন, শুধু তাই কেন, কলেজের লেকচারার রামকেষ্টবাবুর নতুন বিয়ে করা বউকে—বেশ সুন্দর বউটা, লেখাপড়াও ভালই শিখেছে, তার ওপরে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের দাগ, সিঁথেয় আর কপালে, তাকে নিয়ে বেলেল্লাপনার আর বাকি রেখেছে কি। বড়দার সবই বড় বড়, ওসব বাজে মেয়েটেয়ের ব্যাপারে নেই। শহরের বেশ ভাল ভাল ঘরের মেয়েদের সঙ্গেই ওর আঁশনাই, সেখানেই ওর যাতায়াত। সে সবই ওর রাজনীতির দলের ব্যাপার, সবাই ওদের দলে আছে।

তবু যে কেন বড়দা বল, মেজদা বল, শিখার পেছন ওরা ছাড়ছে না, বুঝতে পারি না। যাই হোক, বড়দা বা মেজদা, যে-ই বাড়িতে থাকুক, আর তখন যদি সেই ভুতুড়ে ধরনের ভয়ে আমি ওরকম করে উঠতাম, তা হলে ওরা কী মনে করত, তাও আমি জানি। ওরা ভাবতো, ‘খচ্চরটা আমাদের পেছনে লাগবার জন্যেই এরকম করেছে।’ সেটা বুঝতে পারতাম, পরে ওদের ব্যবহারে। পারে তো আমাকে ছিড়েই ফেলে। বড়দা অবিশ্যি কথা বলতো না, ভাবটা করতো যেন কিছুই হয়নি, যে ভাব দেখলেই মনে হত, ও যেন ঠিক মায়ের মতন করছে, মা যেমন বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে সেরকম চাল চালতো বা মাকে দেখে যাদের নালানি-ঝোলানি গড়াতো, সেই শুয়োরের বাচ্চাগুলোর সামনে মা যেমন ‘গায়ে লাগছে না’ ভাব করে

থাকতো, এইরকম আর কী। তবে বড়দা কথা বলতো না। ঘুঘু, যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না, এমনি ভাব। তার মানেই হল, 'শয়তান, পেছনে লাগবার জন্যেই ওরকম করছিলি তা জানি।' মেজদার ব্যাপার আলাদা। মেজদা রেগে তাকাতো। যেন দাঁতে দাঁত পিষতো, আর তাই দেখে আমার হাসি পেত, আমি মিটিমিটি হাসতাম। হাসতে দেখলেই ও একেবারে খ্যাঁক করে উঠতো, 'মারব মুখে লাথি, হাসছিস কেন?'

আমারও ভিতরে ভিতরে রাগ হত, বলতাম, 'তুই রেগে রেগে তাকাচ্ছিস কেন?'

'তুই তখন ওরকম চেঁচিয়ে ছুটে বাড়ি মাথায় করলি কেন?'

'আমার ইচ্ছা।'

ও অমনি ঘুষি পাকিয়ে উঠতো, 'তোর দাঁত ভেঙে ফেলবো, লোফার কোথাকার। রাসকেল।'

ইচ্ছা করতো, আসল কথাটা বলে ফেলি। কিন্তু চোখে না দেখতে পেলে তো হবে না, প্রমাণ দিতে পারব না। অথচ গালাগাল শুনে সহ্য করতে পারতাম না। অনেক ছেলেবেলায় ওকে ভয়টয় পেতাম। বড্ড মারতো। কিন্তু ক্লাস নাইন টেন-এ উঠে অতটা আর ভয় পেতাম না। আর ওসব ঘটনাগুলো তখনই ঘটতো বেশী। আমিও মুখে মুখে বলে উঠতাম, 'ভাঙ তো দাঁত, তোরও চোখ গেলে দেব। তুই তো একটা লোচ্চা। বেশী বলবি তো সবাইকে চেঁচিয়ে যা-তা বলে দেব।'

বুঝতে পারতাম, গায়ে হাত তোলবার সাহস তখন আর ওর হত না। তবে একেবারেই যে মারামারি করিনি, তা না, আগে আগে হেরেই যেতাম। ওর সঙ্গে আমার শেষবার হাতাহাতি মারামারি হয়, কলেজের ব্যাপারে। ওদের দলের একটা ছেলেকে আমি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। মেজদা বাড়ি এসে আমাকে খুব তড়পেছিল, বলেছিল, রাস্তায় বেরুলে ওরা আমার মাথা ফাটিয়ে ছাড়বে। আমি তখনই ওর সঙ্গে রাস্তায় যেতে চেয়েছিলাম। আমারও রাগ চড়ে গিয়েছিল। ও আমাকে যা-তা গালাগাল দিয়েছিল, তারপরে তর্ক করতে করতে দুম করে এক ঘুষি বসিয়ে দিয়েছিল আমার থুতনির কাছে। মারতেই আমি ওর ওপরে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, এখন বুঝতে পারি, আমি যে এতটা ক্ষেপে যেতে পারি ও ভাবতেই পারেনি। একটার বদলে আমি অন্ততঃ গোটা আটেক ঝেড়েছিলাম ওকে। তাতে ওর চোখ ফুলে গিয়েছিল, ঠোঁটের কষে রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে একটা টেবিল উলটে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। খেয়ালই ছিল না, বাবা বাড়িতে আছে। তখন বাবার রিটায়ার করবার আর মাসখানেক বাকী, তাও চার বছর একস্‌টেনসনের পরে।

হয়তো লড়াইটা আরো হত, বাবা এসে চীৎকার করে দাঁড়াতেই আমরা দুজনে দু দিকে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। দুজনেই হাঁপাচ্ছিলাম, আর মেজদার চোখের কাছে ভুরু ফুলে উঠেছিল, ঠোঁটের কষে রক্ত দেখা

যাচ্ছিল, চোখ জ্বলছিল ধ্বকধ্বক করে। একবার আমার দিকে, আর একবার বাবার দিকে দেখছিল। আমি শুধু বাবাকেই দেখছিলাম, আর এক-আধবার মেজদাকে। বাবা চীৎকার করছিল, 'কী, হচ্ছে কি বাড়ির মধ্যে, অ্যাঁ ? এসব কী ব্যাপার। তোরা মারামারি করছিস, এটা কি ভদ্রলোকের বাড়ি না ?'

আমারও নিশ্চয় চোখ জ্বলছিল, আর মনে মনে বলছিলাম, 'আহ্, ভদ্দর লোকের বাড়ি !' মেজদা বলে উঠেছিল, 'আপনি জিজ্ঞেস করুন ওকে, কলেজে কী করে এসেছে। একটা ছেলেকে মাথা ফাটিয়ে এসেছে। আমি সে কথা বলেছি বলে, আমাকেও মারছে।'

মেজদার দিকে চেয়ে, ওর অবস্থা দেখে বাবা আমার ওপর ক্ষেপে উঠেছিল। বলেছিল, 'ইয়েস, আমি শুনেছি, এটা একটা গুণ্ডা হয়ে উঠছে, তোকে ও মেরেছে নাকি এভাবে ?'

মেজদা তখন অনেকটা কাঁদো কাঁদো, কষের রক্ত মুছতে মুছতে বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

বাবা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠেছিল, 'দাদাকে এভাবে মারা ? বেরোও, বেরিয়ে যাও তুমি বাড়ি থেকে। এ বাড়িতে থেকে ওসব গুণ্ডামি চলবে না। এত বড় সাহস, বাড়ির মধ্যে মারামারি !'

আমি বলেছিলাম, 'ওকে তো আমি আগে কিছুই বলিনি। ও-ই তো আমাকে আগে মেরেছে।'

'আমি কোন কথা শুনতে চাই না, তুমি চলে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।'

মস্ত বড় অফিসারটি গর্জন করে উঠেছিল, 'তারপরে দেখছি আমি, তোকে কী করে শায়েস্তা করা যায় ! ওসব আমি কিছু সহ্য করব না ! বাড়িটাকে এরা একেবারে নরক করে তুলেছে। আমি প্রত্যেককে দেখব, আর প্রত্যেককে শাস্তি দেব !'

অথচ আমি ভেবেছিলাম বাবা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনেকবার আমার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করেও এগিয়ে এসে গায়ে হাত দেয়নি। তাতে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। বাবা মারবে বলে আমি তো গা হাত পা শক্ত করে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে তা দাঁড়ালেও আমার রাগ কমেনি। ভিতরটা আমার জ্বলছিল, ফুঁসছিল। বাবা গায়ে হাত দিলে অবিশ্যি আমি কিছু বলতাম না, কিন্তু আমার ইচ্ছে করছিল, মেরে ধরে ছিঁড়ে কুটে একটা তুলকালাম কাণ্ড লাগিয়ে দিই !

সেই সময়ে বড়দা এসে দাঁড়িয়েছিল, আর ও খুব ভালো মানুষের মত, বেশ ভারিক্কি চালে বলেছিল, 'এভাবে মারামারি করার কোন মানে হয় ! ইস্, নিকুর তো ঠোঁট কেটে রক্ত বেরুচ্ছে দেখছি।'

আমাদের তিনজনের তিনটি ডাকনামও ছিল। পিকু নিকু টুকু। জানি না, সেসব নামের উদয় হয়েছিল কেমন করে, কারণ শুলাদাকে কোনদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে ওই শুলাদার কথাই ঠিক, নামে কী আসে

যায়। বড়দার কথা শুনে, মেজদা আর একবার ঠোঁট মুছেছিল। কিন্তু ফিরে তাকায়নি। বাবাও যেন ফিরে যাবে বলে শরীরটাকে দোলাচ্ছিল, আসলে উত্তেজনায় সেরকম করছিল, আর বলেছিল, 'আমি আমার বাড়িতে এসব কিছুই সহ্য করব না। যার যা খুশি তা-ই করবে, আর এসব ছোটলোকোমি, কিছুতেই টলারেট করব না। ইউ অল মাস্ট মেনটেইন দ্য ডিসিপ্লিন!'

বড়দা আবার সেই ভাবেই বলেছিল, 'কিন্তু বাইরের ব্যাপার এভাবে বাড়িতে টেনে আনা উচিত না। কলেজে যা ঘটেছে, ঘটেছে, সে সব নিয়ে বাড়িতে কথা বলার দরকার কী!'

তৎক্ষণাৎ মেজদা বলে উঠেছিল, 'হ্যাঁ, তুই তো সেকথা বলবিই। এখন তোদের দলের ছাত্ররা তো ওদের সঙ্গে কলেজে আমাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়েছে। আমাদের কোণঠাসা করবার মতলব। তা-ই বড় গায়ে লেগেছে, কলেজের ব্যাপার বাড়িতে এসেছে বলে, খুব ইয়ে দেখাচ্ছিস্।'

বড়দা বলেছিল, 'তা কেন—।'

বাবা চীৎকার করে উঠেছিল, 'শাট আপ্, চুপ কর সব। আমি কারুর কোন কথা শুনতে চাই না। ঘরে বাইরে বলে কিছু জানি না আমি। এ সবের মধ্যে কারুরই থাকা চলবে না, আই ডোন্ট লাইক অল দিজ ব্লাডি ফুলিসনেস্।'

কথাবার্তা সেই ঠিক অফিসের বড়কর্তার মতই, কিন্তু ফাদারকে সেই সময় আমার একটু অন্যরকম লেগেছিল, যে রকমটা ঠিক আগে আর দেখিনি। আগে ছিল, রাগ তো রাগই, তার মধ্যে আর কিছু নেই, বাঘটা গর্জন করছে আর ফুঁসছে! কিন্তু সেই ঝগড়ার দিনে একটু অন্যরকম, যেন রাগ তর্জন-গর্জন সবই ছিল, অথচ বাঘটা যেন দূরে কিসের শব্দ শুনছিল। এক এক সময় হয়-না, হাঁক-ডাক চলছে একদিকে, অথচ মন পড়ে আছে অন্যদিকে। কী বলে তাকে যে, ওই সেই, মানে আনমাইন্ডফুল। না কি, গজরাচ্ছে, অথচ গায়ের কোথায়, গলায় না পায়ে, কোথায় একটা কাঁটা ফুটে আছে, আর সেটা বারে বারেই খচ্‌খচ্ করছে, কে জানে স্‌সাহ্, কী ভাব বলে ওকে। মোটের ওপরে, ফাদারের রাগ ছাড়াও একটা অন্যরকম ভাব ছিল, যেন বড় অশান্তি লাগছিল। সেই পর্যন্ত বলেই চলে গিয়েছিল। আমিও তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

তবে, মেজদা বড়দাকে যা বলেছিল, সে কথাগুলো কিন্তু ঠিকই বলেছিল। ওদের দলটা তখন এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল, অনেকটা নিম্‌রাজী ছুঁড়ির মতন। মুখে কিছু বলছি না, তবে যদি কিছু করতে চাও, চালিয়ে যেতে পার। মেজদাদের দলটার সঙ্গে যখন আমাদের বেশ গরমাগরমি ভাব, ওরা যেন ভর-হওয়া ঠাকুরের মতন হয়ে গিয়েছিল। কী জানি বাবা, তোমাদের যা করবার কর, আমরা ওসবের মধ্যে নেই। এর্ নাম ছেনালি! তার মানেই, বলতে চাইছিল, 'ওদের মেরে স্‌লা উড়কু উঠিয়ে দাও। আমরা নাক গলাবো না।' এর নাম ওদের রাজনীতি আর

দলাদলি। খচ্চর! তা না হলে, বড়দা যা রাম ঘুঘু, মুখ ফুটে একটি কথাও বলতো না। কেননা, উলটো ঘটনাও তো ঘটেছে। তখন আবার বড়দা গোঁসা করেছে। তবে ও তো মেজদার মতন ছিল না, বরাবরই একটু অমায়িকভাবের ত্যাঁদড়। এখন অবিশ্যি ওদের দুজনেরই অনেক অদলবদল হয়েছে। দুজনের ব্যবসা চাকরি আর রাজনীতি, সব মিলিয়ে ওরা আগের থেকে এখন অনেক চালাক হয়েছে। তার মানে, দুজনেই অনেক ঘুঘু হয়েছে এখন। অথচ, লড়াই ওদের ভিতরে ভিতরে বেড়েছে, আর আমাকে নিয়ে টানাটানিও বেড়েছে। এখন আমার সঙ্গে দুজনেরই নরমে গরমে চলে। বুঝতে পারি, ওরা দুজনেই চায়, আমি ওদের দলে ভিড়ে পড়ি। কখনো দুজনেই আমাকে ত্যালায়, রেগুলার কমপিটিশন লেগে যায় ওদের! আমি মনে মনে বলি, 'স্‌সাহ্‌ মালপাড়ার গোঁসাই তোমরা, দেশটা তোমাদের মালপাড়া, আর আমাকেও তাই ভেবেছ।' যখন দেখে যে, কিছু হবে না, তখন গুণ্ডা বলে। অথচ গুণ্ডা বলেই আমাকে চায়। আমার তো আর কোন দল নেই। যশোদাবাবুদের দলটা তো এখন নিখাগীর মা হয়েছে। কোনরকমে নাম বজায় আছে, কয়েকজনের দল হয়েছে, বাত্‌তি সব নিভু-নিভু! জোরদার থাকলেও আমি আর থাকতাম না! কলেজ যখন ছেড়েছি, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক কী!

যাই হোক গে, মোটের উপর মেজদা জীবনে সেই আমার গায়ে শেষবার হাত তুলতে এসেছিল। বুঝতে পেরেছিল, আমার সঙ্গে লাগতে এলে খুব সুবিধা হবে না। আর সেই একটা ধারণা ছিল ওদের, আমি ওদের পেছনে লাগি। সেই ভয় পেয়ে যখন ওরকম করে উঠতাম, আর তারপরে চেঁচিয়ে ছুটে দাপিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতাম। শুধু ওরা কেন, বাড়ির ঝি ঠাকুর সবাই তাই মনে করতো। কেবল, কেন আমি জানি না, শুলাদাটা যেন একটু অন্য রকম ছিল। গাছ ফুল ফল ছিঁড়ে ফেললে, সে নিজের হাতে সব ঠিকঠাক করে রাখতো. যাতে ফাদারের চোখে কিছু না পড়ে। আর এও জানতাম, সে-ই সবাইকে সামলে রাখতো, যাতে আমার সেই সব বদমাইসির কথা বাবার কানে না যায়। সে আমাকে থেকে থেকে প্রায়ই বলতো, 'তোমার কী হয় ছোট খোকা, তোমার কি মাথা খারাপ?'

তা বলে, আমি কোনদিনই শুলাদাকে সে কথা বলিনি। আমি বুঝতে পারতাম, শুলাদা একটু অবাক হয়ে ভাবতো, ছোট খোকা বড় হচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, অথচ তার এরকম হচ্ছে কেন। ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা অদ্ভুত কিছু আছে, সে খানিকটা আন্দাজ করতে পারতো। বুঝতে পারতো না কিছুই।

এ কথাও ঠিক, সেই এক রকমের ভয় পাওয়া, আর বুক গুরগুরিয়ে-ওঠা, বুকের মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এক ধরনের যন্ত্রণা, চোখে জল এসে পড়ার ব্যাপারটা যে আমার খুব ছেলেমানুষি বয়সের তা না। তখন

ক্লাস নাইন-টেনে উঠেছি, এমন কি যখন কলেজে প্রথম ঢুকেছিলাম, তখনো কয়েকবার সেইরকম হয়েছে, কথাটা ভেবে আমার সত্যি কান্না পেয়ে গেছে। বাথরুমে ঢুকে কেঁদেও ফেলেছি। আরো এইজন্যে যে, কাউকে বলতে পারছিলাম না, কেউ বুঝতেও পারছিল না, আর বললে বোধহয় বিশ্বাসও করতো না। তারপরেই অবিশ্যি রাগের চোটে আমার গা জ্বলে যেত। আমি নিজে নিজেই বলে উঠতাম, 'বয়ে গেছে আমার। কাউকে বলতে চাই না। আমার কাউকে চাই না, কারুক্কে আমার দরকার নেই। বাবা না, দাদাদের না, কারুক্কে না। সবাইকে আমি ইয়ে করে দিই।'

কেউ কাছে থাকলে কখনো সেরকম ঘটতো না। যখনই হয়েছে, আমার একলা অবস্থায়। আমার মনে আছে, কীরকম অবস্থায় সেটা হত। হয়তো হঠাৎ বাইরের থেকে বাড়িতে এসেছি, ঘরে ঢুকেই মনে হল, আচ্ছা ইকনমিকস্-এর নোটটা একটু পড়ে রাখি। বইটা খুলতে গেলাম, ভাল লাগলো না, দুম করে বাবার ঘরে চলে গেলাম। টেবিলের ওপরে একটা অফিসের কাগজ ফ্যাস করে খানিকটা ছিঁড়ে ফেললাম, বাবার মুখটা মনে পড়ে গেল, হাসি পেল, একটু ভয়ও হল ; বেরিয়ে এসে বড়দার ঘরে গেলাম, ওর দলের নেতাদের ছবিগুলো দেখলাম দেওয়ালে, ভেংচে কাঁচকলা দেখিয়ে দিলাম ; মেজদার ঘরে গিয়ে প্যাঁচ করে একটু থুথু দিয়ে দিলাম, অবিশ্যি যদি ওরা বাড়িতে না থাকে। তারপরেই মনে হল, আচ্ছা কিছু খাই, ভাবতে ভাবতে বাথরুমে গেলাম, প্রায় কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে একটু প্রস্রাব করলাম, কারণ, পায়নি তো। তখন মনে হল, বাইরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছু খেলে কেমন হয়, আর ঠিক তখনই হয়তো সেই খারাপ একটা ব্যাপার করতে ইচ্ছা হল, বন্ধুদের কাছে শেখা, যেটা নিজে নিজেই করা যায়। ওটা তখন প্রায়ই ইচ্ছা হত, একলা থাকলেই কুকুরের নতুন গু খেতে শেখার মত। ব্যাপারটা সেরে হয়তো ছাদে গেলাম। আর তখনই জল তেষ্টা পেল, জল খেলাম। আর সেই সময়েই হয়তো একেবারে মোমেন্টে যাকে বলে, হঠাৎ একটা কীরকম ভয় করে উঠলো, আর বুক গুরগুরিয়ে···কোথা থেকে যে কী হয়ে যেত।

এখনো যে সে ভয়ের ভাবটা আমার একেবারে কেটে গিয়েছে, তা কিন্তু না। এখনো সেই গুরগুরোনিটা আমি মাঝে মাঝে টের পাই, তবে খুবই কম। কলেজের হৈ চৈ মারামারি উত্তেজনা মাথা ফাটাফাটি দলাদলি ওসব নিয়ে যতই মেতেছিলাম, ততই ব্যাপারটা কেটে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস্ স্সাহ্ গুণ্ডা হয়েছিলাম, তা না হলে হয়তো সেটা কৃমির মতন লেগেই থাকতো। যেন ও ব্যাপারটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই আমার একটা হুড়যুদ্ধু দরকার। যে কোন রকমেরই। এখনো মাঝে মাঝে যখন টের পাই, তখনই লক্ষ্য করে দেখেছি, হয়তো কোন কারণে মেজাজটা খারাপ, শরীরটা খারাপ, কিছু ভাল লাগছে না, কেমন যেন একটা ঝিম-ধরা ভাব, কিছুই করছি না, শিখার কাছেও যাচ্ছি না, ওকে গালাগাল দিচ্ছি মনে মনে, আর একলা একলা থেকেছি, তখনই হঠাৎ চমকে উঠলাম। মনে হয়, যেখানেই

থাকি, ঘরে বাইরে দোকানে, সবখানেই, কী যেন একটা এসে হাজির হয়েছে। অমনি লাফ দিয়ে উঠে হেঁকে উঠলাম, 'পেলে লেগে যা ! এই স্‌সিবে, স্‌সুটকা !'

অমনি ওরা এসে হাজির হয়। যেখানেই হোক কাছাকাছিই তো থাকে। বাড়িতে থাকলে, ঝি চাকরকেই চেঁচিয়ে গালাগাল দিয়ে উঠি, দৌড়ে বাড়ির বাইরে যাই। মিছিমিছি চেঁচাতে চেঁচাতে যাই, 'তোমাদের ডেকে পাওয়া যায় না, কোথায় থাক সব ?' তখন মনে হয়, যেন সত্যি সত্যি বলছি, সত্যি সত্যি ওদের কাউকে ডেকেছিলাম, কেউ শুনতে পায়নি। বাইরে থাকলে, অন্যরকম। ওইরকম চীৎকার করে ওদের ডাকি—ওরা এসে হাজির হলেই বলি, 'চল্ তো একটু মাল খেয়ে আসি।'

ওরা অবাক হয়ে বলে, 'সে কি রে স্‌লা, বেলা এগারটাতে মাল খাবি কী।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনই টানা যাক একটু, চল-না।'

ওরা হাসে, মজার মজার খিস্তি করে। একটু খেতে পাবার খুশিতেই যে আরো ওরকম করে, বুঝতে পারি, সময়ের জ্ঞান তো কত ! কাকে গু খাবার আগে, ভোরবেলা পেলেই খেতে পারে, তারা আবার বেলা এগারটা দেখায় আমাকে। তবে ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে, বলে, 'গুরুর যে কখন কি মতিগাতি হয়, মাইরি বুঝতে পারি না।' বলেই না শুধু, আমাকে নিয়ে ওরা একটু অবাক। আসল ব্যাপার তো বুঝতে পারে না, ভাবে, আসল গুণ্ডার ভাবভঙ্গি বোধ হয় সকলের থেকে একটু আলাদাই হয় !

এইভাবে মদ খাবার জন্যে ছুটতে গিয়ে হয়তো, হঠাৎ চোখে পড়ে যায়, কোন মেয়েকে দেখে, কোন রিকশাওয়ালা খারাপ কথা বলে ফুট কাটছে, অমনি ঠাস করে মারি গালে এক চড়, তারপরেই আর একটা ঘুষি চোয়ালে। খিস্তি করে বলি, 'স্‌সাল্লা, ভদ্রলোকের মেয়েদের টিটকারি। স্‌শহরে তোমার গাড়ি চালানোর বারোটা বাজিয়ে দেব আমি। খবরদার, আমার চোখে যেন কোনদিন আর না পড়ে।'

তার মধ্যে সাকরেদরাও হয়তো দু'চার ফাইট হাঁকিয়ে দেয়। লোকজন ট্রাফিক পুলিশ, যারা সবাই আমাকে চেনে, শহরের থানারই পুলিশ তো, আর রিকশাওয়ালারা এসে থামিয়ে দেয়। এক কাজে, দু' কাজ হয়ে যায়। তখন কী যে করি বা করব, তা কোন শিবের বাবাও বলতে পারে না। ওরকম একটা কিছু করা তখন যেন আমার দরকার হয়ে পড়ে, মাইরি। আর সবাই অবাক হয়ে ভাবে, এরকম একটা কারণে আমি এত রেগে উঠতে পারি। শুধু অবাক কেন, রীতিমত প্রশংসা, যাকে বলে হিরোর দিকে চেয়ে দেখার মতন। অথচ জানে সবাই, আমার মত হাড়ে-হারামজাদা গুণ্ডা শহরে দ্বিতীয় নেই। সে কি না, কোন একটা মেয়েকে দেখে রিকশাওয়ালা কী বলেছে, তার জন্যে একেবারে লাল ! আমি বলি, লে হালুয়া। লোকে বলে, অদ্ভুত তো !

লোকজনেরা সবাই রিকশাওয়ালাকে ধমকায়। এমন কি

রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত মার-খাওয়া লোকটাকে বলে, 'তোর স্‌সালা আঁখ নেই রে, স্‌সুখেনদার সামনে মজাকি মারতে গেছিস।' আমি তো আবার সকলেরই স্‌সুখেনদা। ভদ্র, অভদ্র, ছোট বড় অনেকেরই। আমি গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসি। কেবল সেপাইটাই একটু অন্যরকম করে তাকিয়ে থাকে। ঠিক কিছু বলতেও পারে না, অথচ আমার মাস্তানিটা সহ্যও হয় না। ওর তো ধারণা, মাথায় পাগড়ি আর গায়ে খাকি কুর্তা থাকতে, আর কেউ মাস্তানি করবে কেন। শহরে মাস্তান তো ওরাই। খালি পয়সায় রিকশা চাপছে, তা না হলেই পেটি কেসে ধরে নিয়ে গিয়ে ঠুকে দিচ্ছে, আশেপাশের দোকান থেকে যখন যা দরকার, ধারের নাম করে নিয়ে যাচ্ছে, আর কোনদিন দেবার নাম নেই; বাজারেও তাই—অবিশ্যি দোকানদার রিকশাওয়ালাদেরও দোষ আছে, তা হলেও মনে করে, ওসব ওদেরই একচেটিয়া। বাবা, কেলাস বোঝ না, তোমাকে আমাকে ফারাক করলে হয়। জানবে, আসল মাস্তান আমিই। যদি না জান, তবে আরো অন্য জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস কর।

কিন্তু রিকশাওয়ালারা ওরকম কত করে, আমার বাপ-মা-মরা দায় কেঁদে গেছে কিছু বলতে। আমি কিছু ওসব চেয়ে দেখি না, বলিও না। কত বেচালবাজ ছুঁড়ি আছে, তাদের পোশাক-আশাক ভাবভঙ্গি চলাফেরা দেখলে, আমিই কি কিছু বলতে ছেড়ে দিই নাকি! রিকশাওয়ালাদের মতন বলি না, গলাটা একটু নামিয়ে হয়তো বলি, 'স্‌সুটকা, ছুঁড়ির লেবেল খুলেছে মনে হয়।'

শুটকা তারও বাড়া, হয়তো জবাব দেয়, লেবেল মানে, সাফ হয়ে গেছে সব মাল।'

আমরা এরকমভাবে বলি, ওদের বলাটা অন্যরকম। সে সব কথা শুনলে, কানে তালা লেগে যায়, মাইরি! এমনই মোক্ষম বলে, তারপরে আর কথা চলে না। তা ছাড়া রিকশাওয়ালারা আমার আপন লোক, বিনা পয়সায় আমাকে চাপায়, পয়সা কড়ি না থাকলে অনেক সময় কিছু দেয়ও। থানার বড়বাবুকে বলে অনেক সময় ছাড়িয়েও এনেছি। আমার যেমন বড়বাবুকে নিয়ে মাথাব্যথা, বড়বাবুরও তো তেমনি আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা। কেউ কাউকে ডিসটার্ব করি না, খাঁটি ভদ্দরলোকের চুক্তি।...তাই বলছি, সেই ভয়ের ভাবটা আমার এখনো যায়নি। তবে অনেক কম, আর কালেভদ্রে টের পাওয়া যায়। গেলেই ওইরকম কিছু করি। ওটা যে কী ব্যাপার, আমি কোনদিন তা জানতে পারিনি।



দু বছর, তারপরে আরো তিন বছর, পাঁচ বছরেও যখন ডিগ্রি কোর্সের গাঁট পার হতে পারিনি, তখন আমিই স্‌সাহ্‌ হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তখন আর কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে আমার আর তেমন জমছিল না।

সেখানে দলাদলি মারামারি করতে করতে বাইরে একটা নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল। তখন বাইরেও আমাকে ডাকাডাকি করতো। আর কলেজের যে দলটা আমার সঙ্গে থেকে মারামারি করতো, সেই দলটার অনেকেই আমার সঙ্গে থাকতো, অনেকেই আজও আমাকে ছাড়েনি।

সেই যা বলছিলাম, কলেজে সেটাই আমার শেষ বছর। কত বছর আর হবে। চার-পাঁচ বছরের বেশী না। সেবার কলেজের গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে আমরা সব দল কয়টা এক হয়েছিলাম। যেমন স্‌সাহ্‌, গভর্নিং বড়ি, গোটা তিনেক লোককে তো চিনতাম, শহরের সেরা ঘুঘু, চুরি ছিঁচকেমি, মেয়েমানুষের দোষ, কোন গুণে ঘাঁট নেই, বাইরে নিপাট ভদ্দরলোক। ওদের বিরুদ্ধে আবার ভদ্রলোকের ছেলেরা আন্দোলন করবে, সে কথা ভাবলেও তো আমার গা ঘিন ঘিন করে! মন্ত্রী হয়, বড় বড় অফিসার হয়, তার না হয় একটা কথা আছে, তবু বোঝা যায়, হ্যাঁ একটা কিছু হচ্ছে। আর ওগুলো কী, বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা, মফস্বল শহরের একটা কলেজ পেয়েছে, তাতেই যতখানি কেরদানি আর কিছু গ্যাঁড়া মারা যায়। লেগেছিল তিন চারটে ব্যাপার নিয়ে। একজন প্রফেসরকে তাড়ানো নিয়ে, সে আবার মেজদাদের দলের স্যার, আর কলেজের সামনে খানিকটা জায়গা ছিল, সেটি কোন কর্তার দরকার হয়েছিল, তাই অন্যদিকে মেইন গেট করা হবে, তার মানে, একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে আমাদের অনেকখানি ঘুরে গিয়ে ঢুকতে হবে, আর কর্তাটি সেখানে একখানি বিল্ডিং হাঁকিয়ে কারবার করবেন, এমনি সব। আরও কী সব ছিল, আমার মনে নেই। আমাকে বলেছিল, হাঙার স্ট্রাইক করতে হবে। রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

তখন তো সব দল এককাট্টা। বড়দা মেজদা তো আমার ওপর খুব খুশি। আমিও যে হাঙার স্ট্রাইক করব, এটা যেন ওদের একেবারে বিশ্বাসই হয়নি। মেজদা তো ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে বলেই উঠেছিল, 'তুই হাঙার স্ট্রাইক করবি?'

ভারী খচ্চর ও, সব সময় নিজেকে বড় ভাববার তালে আছে। বলেছিলাম, 'দেখে নিস।'

আবার বলেছিল, 'একটা কেলেঙ্কারি করবি দেখছি।'

বলেছিল, কিন্তু গা জ্বালানো ভাবে বলেনি, যেন কতই দুশ্চিন্তা, আমার জন্যে যেন ওদের মহাযুদ্ধটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

বড়দা বলেছিল, 'পারবি তো?'

আমার বাবা এলেন! সব কথাতেই একটা ভারিক্কি ভাব, যেন কী একটা হয়ে পড়েছে। তবে এটা ঠিক, বড়দা তখন একটু একটু করে, ওদের দলের বেশ একটা চাঁই হয়ে উঠেছিল। ও যেন একটু গভীর জলে খেলে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল ওরা কথা শুনে। বলেছিলাম, 'তুই পারবি?'

ও এমন করে হেসেছিল, যেন আমি একটা কচি খোকা। অথচ ওর

চোখের মধ্যে যে সব সময়ে একটা খারাপ মেয়েদের মতন চোরা হাসি লেগে থাকতো, বুঝতে পারতাম। যেন বেশ্যাটা সমাজের মধ্যে এসে পড়েছে, আর সকলের দেখাদেখি হরি হরি বলতে আরম্ভ করেছে। খারাপ কথা আমি জানি না ! বলেছিল, 'পারব মানে কী রে, কলেজে তো আমরাই ফার্স্ট ব্যাচ, যারা হাঙার স্ট্রাইক করেছিল। আমিও তার মধ্যে ছিলাম।'

আমি বলেছিলাম, 'তুই কি করেছিলি, না করেছিলি, সেসব আমি দেখতে যাইনি। আমি পারব কি না, সেটা গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসিস।'

কলেজ গেটের সামনেই অনশন ধর্মঘটের ক্যাম্প হয়েছিল। পোস্টার-টোস্টার তো প্রচুর মারা হয়েছিল। তিনটে গ্রুপ থেকে, সবসুদ্ধ ছ' জন হাঙার স্ট্রাইক করেছিলাম। খেলাটা জমেছিল মন্দ না। এখন অবিশ্যি আমি ভাবতেই পারি না, ওরকম না খেয়ে চিত্তির দিয়ে পড়ে থাকব। তাও কিনা, শহরের সেই ঘাগী খচ্চরগুলোর জন্যে। স্‌লাদের ধরে কয়েক ঘা রদ্দা মেরে দিলেই তো হত ! তা না, উপোস করে শুকিয়ে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। যেন আমরা না খেলে শহরের সেইসব ইয়েদের কিছু যায়-আসে। সে ব্যাপারে দেখেছি আমার ফাদারকে, না না, হটাও ওসব ঝুট-ঝামেলা, ওসবের মধ্যে নেই। থাকবার দরকারও ছিল না। ওতে থেকে এমন কিছু আমদানির সুযোগ ছিল না। যেটুকু থাকে, তাও কয়েকজনের মধ্যে থাকে। বাকীদের খালি মনের শান্তি। বাবার কাছেও প্রস্তাব এসেছিল কি না পরে, রিটায়ার করার পরে, গভর্নিং বডিতে যাবার জন্যে।

প্রথমটা মাইরি ঘাবড়ে খুবই গিয়েছিলাম। পারব তো ! কিন্তু ভিতরে এমন একটা একসাইটমেন্ট ছিল, নেমে পড়েছিলাম। হয়তো মারামারি ফাটাফাটি না, তবু প্রায় সেইরকমই একটা উত্তেজনা। শুরু করবার আগে সভা হয়েছিল, আমাদের, আমরা যারা অনশন করেছিলাম, তাদের মালা চন্দন দিয়ে আবার সংবর্ধনা করা হয়েছিল। জীবনে ওই শেষবার, আর একবারই, আমার গলায় মালা পরানো হয়েছিল, মানে ওরকমভাবে মালা পরানোর কথা বলছি। তখন তো কোন ঝগড়াঝাটি নেই, আমার গলায় যে মেয়েটা মালা পরিয়েছিল, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়েছিল, সে আবার বড়দাদের দলের মেয়ে। মেয়েটা তার আগে কোনদিন আমার মুখের দিকে তাকায়নি। তাকাতো ঠিকই, তবে সামনাসামনি কোনদিন না। আমি কিন্তু তখন মেয়েটার অন্য কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখিনি, যেদিকে তাকানো-টাকানো যায় আর কি ! তখন যেন কেমন অন্যরকম একটা ভাব এসে গিয়েছিল। আমাদের দলের একটা মেয়ে মেজদাদের দলের একটা ছেলেকে মালা পরিয়ে দিয়েছিল। সব—কী বলে—বাঙলা কথাটাও শালাহ্ ভুলে যাই, সেই—হ্যাঁ 'ঐক্যবদ্ধ', তখন তো সবাই ঐক্যবদ্ধ, তাই সব উলটা-পালটা কারবার হয়েছিল। সবাই হাতে হাত দিয়ে আমরা চীৎকার করে উঠেছিলাম, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ। গভর্নিং বডির স্বৈরাচার, মানব না

মানব না। ছাত্র-ঐক্য জিন্দাবাদ!' তখন প্রায় আমিও বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম, সে ঐক্য আর ভাঙবে না। রক্তের মধ্যে, স্‌সাহ্‌, এমন একটা রণরণানো ভাব এসেছিল, মনে হয়েছিল, একটা অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে চলেছে।...অ-মাগো, তখন কি জানতাম, অমন কত ঐক্য হয়েছে, কত ভাঙছে। জানতাম না, তা ঠিক না, তবে আমার বেলায় মনে হয়েছিল, এই যে জোড়া লাগলো, এ আর কস্মিনকালেও ভাঙবে না। আমি আছি কিনা! তবে আর কি, তুমি যখন আছ, এ চিরদিন টিকে যাবে। বাবা এর নাম দলাদলি, জান না তো!

তা সে যাই হোক গে ছাই, আমি শিখার ছোঁয়া লাগার প্রথম দিনটার কথাই ভাবছি। শিখাকে যে ধর্মঘটের দিনই প্রথম দেখেছিলাম, তা না। আরো আগেই দেখেছি, তবে এ তো সেই শিখা, তখনো কোন দলে ছিল না, অথচ সকলের সঙ্গেই ওর ভাব ছিল। চিনতাম ওকে অনেককাল আগে থেকেই। ওর দাদাদের সঙ্গে কয়েকবার ওদের বাড়িতেও গিয়েছি। যেমন অনেক বন্ধুর বাড়িতেই গিয়েছি বা যাই, কিন্তু তাদের বোনদের সম্পর্কে তখন আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। শিখাকে দেখে তখন কিছু মনে হয়নি। কলেজে যখন এসেছে, তখনো কিছু মনে হয়নি। ওর ওপর অনেকের নজর আছে, এটা জানা ছিল। সব দলের ছেলেরাই শিখা শিখা করতো। শুনে শুনে, আমিও যে দু-চার বার নজর করিনি তা না। কই বাবা, তেমন একটা মার-কাটারি কিছু তো মনে হয়নি। হাবলা গোবলা মেয়ে, আছে না একরকমের ভাল গোছের মেয়ে—দেখতে খারাপ না, অথচ যারা প্রেম-ট্রেম করে না, হেসে ঢলে নাচিয়ে খুঁচিয়ে চলে না—যেন একেবারে রাস্তার সব প্রাণ জাগিয়ে চলে, সেরকম ভাবের। যেসব মেয়েকে দেখলেই মনে মনে খিস্তি করে উঠতে ইচ্ছা করে, আর যাদের নিয়ে ছেলেদের বেশী মাথাব্যথা, যাদের দেখলেই অন্য সব কথা মনে হয়, খারাপ খারাপ ইচ্ছা হয়, তাদের নিয়েই তো ছেলেদের রেষারেষি বেশী।

শিখাকে ঠিক সেরকম মনে হত না। তা বলে ও যে ভাল ছিল, তা বলছি না। হয়তো তখনো ও প্রেমও করতো, সবই করতো, রাতারাতি তো আর শহরে দুর্নাম রটেনি যে, শিখা অনেকের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। এখন যেমন শোনা যায়, শহরে কান পাতা যায় না। তখন এত নামডাক হয়নি, বা কলেজের অমুক ছেলের সঙ্গে ওর আছে, তাও শোনা যায়নি। অথচ দেখলেই খারাপ কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে, খারাপ কিছু করতে ইচ্ছা করে, খারাপ খারাপ কথা বলতে ইচ্ছা করে, তাও ছিল না। তার মানে এই না যে, ও দেখতে ভাল ছিল না। তা হলে আজকের এই শিখা, এই-ই শিখা হত না। তবু এক একটা মেয়ে কীরকম থাকে না, সেই যে কী বলে—একটা ইয়ে ভাব—আহ্‌, আমরা বলি না এক এক সময়, পিওর! হ্যাঁ পিওর ভাব, লক্ষ্মী লক্ষ্মী, প্রতিমা প্রতিমা—ওই সেই আবার 'ওর মধ্যে কী যেন একটা আছে' ভুতুড়ে চিন্তাটাই ঘুরে ফিরে আমার মনে আসছে, হাজার ফ্যাকড়া বের করেও যা বোঝা বা বলা আমার দ্বারা হবে

না। মোটের ওপর দেখতে ভাল, অথচ মেয়েলি মেয়েলি একরকমের গুমোর যেমন থাকে, সেরকম কিছু ছিল না। সকলের সঙ্গেই সহজে হেসে কথা বলতো, যেন সকলের সঙ্গেই তার বেশ ভাব। ওরকম মেয়ের দিকে আমার আবার তেমন ঝোঁক-টোক লাগতো না, অনেকের যেমন শিখা শিখা বাতিক ছিল। শিখা তো সেরকম ছিল না, শুটকা যেমন যেমন মাঝে মাঝে বলে, 'রঙ্গিলা ছেমড়ি।'

অথচ শিখা আবার কোন দলেরও ছিল না। দলাদলি করার যে একটা মেজাজ থাকে, লড়ে যাওয়া ভাবের, সেটা একদম ওর ছিল না। সেটা যে কেমন করে হয়, জানি না। ওর সম্পর্কে ছেলেদের এত মাথাব্যথা অথচ ও কোন দলে নেই আর তাতেও ছেলেরা ওর ওপরে রেগে যেত না, সেটাই তো কেমন একটু যেন আশ্চর্য। ও যে একলাই সেরকম ছিল তা না, অনেক মেয়েই ওরকম দলের বাইরে ছিল, কেবল ইলেকশনের সময় ভোট দিয়েই তারা খালাস। কিন্তু সেই অনেকের মধ্যে শিখাকে ঠিক ফেলা যেত না যেন। কারণ, অনেক মেয়েদের মত ও ঠিক ছিল না, ছেলেরাও ওকে ঠিক অনেক মেয়ের মতন দেখতো না। এতে কীরকম মনে হয়, ও যেন কলেজ—শিখা যেন কলেজটা। আমরা সবাই দলাদলি করছি, আগের ছেলেরাও করে এসেছে, পরেও ছেলেরা করবে, তবু কলেজটা কলেজই থেকে যাচ্ছে। আর না হলে বলতে হয়, ও যেন এই দেশটা, মানে বাঙলা দেশটা। দেশটা তো আর কোন দলে যেতে পারে না, দলাদলিও করতে পারে না, মারামারি কাটাকাটি করতে পারে না। দেশটা যেন নিজের মনেই থেকে যাচ্ছে আর বাকীরা নানান কিছু করছে। এরকম ভাবলে আবার আমার মনে হয়, দেশটা যেন জ্যান্ত মতন কিছু, সবই দেখতে পাচ্ছে। এক এক সময় মনে হয়-না, নীল আকাশটা, মেঘগুলো, গাছের পাতা-চিকচিকনো ঝাড়, সবই যেন কেমন জ্যান্ত জ্যান্ত, কেউ যেন সেখানে রয়েছে, চেয়ে চেয়ে দেখছে সব। কাউকে বললে, আমাকে ঠিক ঠ্যাঙাবে, 'স্‌লা ভূত দেখছ।' কিন্তু সত্যি বলছি, মাইরি, অনেকদিন এমন হয়েছে, হয়তো কোন মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, সেই দূরে গাছপালাগুলো বাতাসে দুলছে, আর না হয় তো হঠাৎ দেখলাম, একটা মেঘ, কালো মতন মেঘ, দূর থেকে খচ করে খুঁচিয়ে উঠলো আকাশে, তারপরে সেই খোঁচাটা বাড়তে লাগলো, বড় হতে লাগলো, বড় বড় বড়, হঠাৎ মার খ্যাচ, চিক চিক করে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো, গুর গুর করে দূর থেকে যেন বাঘ ডেকে উঠলো, তারপরেই গাছের মাথাগুলো মুচড়ে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে তাল পাকিয়ে গোঁ গোঁ করে ছুটে আসতে লাগলো, ঠিক মনে হয়, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে জ্যান্ত একটা কিছু রয়েছে। আর না হয় তো ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল, আকাশটা তখনো ভাল করে নীল হয়নি, ঘাস পাতা ফুল সবকিছুর ওপরে শিশির পড়ে রয়েছে, বাড়িঘরের দেয়ালগুলোও কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব করে রয়েছে, যাহ্‌, কেউ শুনলে কী বলবে—কিন্তু সত্যি এরকম মনে হয়, হয়তো এক-আধটা পাখী

চিরিক-পিরিক করে হঠাৎ ডেকে উঠলো, তখনো কী রকম মনে হয়-না, সব কিছুতেই একটা বেঁচে থাকা জ্যান্ত ভাব ! রাত্রের তো কথাই নেই। অন্ধকার রাত্রে খোলা জায়গায় দাঁড়ালেই মনে হয়, সব কিছু আরো ভীষণ জ্যান্ত। এরকম মনে হয়, মাটি গাছপালা ঘাস একেবারে চেয়ে আছে, অথচ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ফট করে কথা বলে উঠতে পারে, 'কী রে টুকু, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস।' উহ্‌রে স্‌সাহ্‌ ভ্যাট, ভাবতেই আমার গায়ের মধ্যে কীরকম করে উঠছে। না, ঠিক ভয়ে না, একটা কীরকম অদ্ভুত শিউরোনি লাগা ভাব, কিন্তু সত্যি আমার সেরকম মনে হয়। কাউকে বললে সে ভাববে, সুখেন মাল চড়িয়ে এসেছে। সে কথা আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না। মোটের ওপর, আমার মনে হয় দেশটা, যেটার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা নেত্য করছি, দলাদলি মারামারি বল, আর যাই বল, যত রপোট, সেটা যেন একটা জ্যান্ত কিছু। এমন কি, এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি যেন কোন্ এক জায়গায় রয়েছি, আর দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, মাটি গাছপালা আকাশ, মানুষ—অনেক মানুষ, সব মিলিয়ে গোটা একটা জিনিস চলছে। সবাই সব কিছু করছে, কিন্তু যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন কিছুই করছে না—সেই রাস্তাঘাট মাঠ গাছ বন, কারণ, তারা মারামারি করতে পারছে না, দলাদলি না, কিন্তু জ্যান্ত, বাকীরা সবই করে যাচ্ছে, আর সে দেখে যাচ্ছে।...'এই দ্যাখ সুখেন, খচড়ামি করিস না।' এ সব ভেবে, আমার নিজেরই এরকম বলে উঠতে ইচ্ছা করছে। মোটের ওপর, আমরা আর শিখা, যেন এরকমই। আমার এরকম বলতে ইচ্ছা করে। ও কোন দলেই নেই, অথচ সবাই ওর কাছে আছে।

যা-ই হোক—প্রথম শিখার ছোঁয়া যেদিন লাগলো, তারপরে তো সভা শেষ করে মালা-চন্দন পরা অবস্থাতেই, কলেজ গেটের সামনে, যেখানে ক্যাম্প করা হয়েছিল, সেখানে আমাদের বসতে দেওয়া হল। ক্যাম্প মানে, একটা সামিয়ানা মতন খাটিয়ে চারপাশে একটু ঢাকনা-টাকনা দিয়ে, ভিতরে দুটো তক্তপোষ পেতে দেওয়া হয়েছিল। কারা কারা যেন আবার বালিশ চাদর সব এনেও পেতে দিয়েছিল। যাতে আমরা শুয়ে-বসে থাকতে পারি। আমাদের গায়ে যাতে রোদ না লাগে, সেই জন্যেই কাপড়চোপড় দিয়ে, সেই ছেলেবেলায় থিয়েটার করার মত, একটা ঘেরাটোপ মতন করে নিতে হয়েছিল। তা ছাড়া রাত্রে মশা কামড়াবে, সেজন্য ধূপ-ধূনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। সেখানে আর মশারি টাঙিয়ে, ঘরের মত করে তো থাকবার দরকার ছিল না। আমাদের সব দলের বন্ধুরাই কেউ কেউ সারা রাত আমাদের কাছে থাকতো। সকলের বাড়ির লোকেরা আসতো, বাবা মা ভাই বোন, বাড়ির ছেলে না মেয়ে আছে, কী জানি বাবা, টেঁসে ফেঁসে গেলে, তারপর ? তারপর আবার কী, গভর্নিং বডির জ্যান্ত চিন্তা। একমাত্র সেই সময়েই কলেজে আমার বাবা এসে উপস্থিত। প্রথমটা তো আমার খুব লজ্জাই করছিল বাবাকে দেখে, তা ছাড়া কে একজন যখন বলে উঠেছিল, 'সুখেনের বাবা আসছে', তখন

প্রথম দুদিন একটু বেশী কষ্ট হয়েছিল, বিশেষ করে যেদিন শুরু তার পরের দিন সকালে তো মনে হয়েছিল, উহ্, এ্যাবসার্ড। দুপুরে মনে হয়েছিল, কাঁউ কাঁউ করে ভাত গিলে আসি, ঝামেলা হটাও। কিন্তু মনের কথা কাউকে বলতে পারছিলাম না। যদি স্‌সাহ্‌, মুখ ফসকে বলেই ফেলতাম, তা হলে নিশ্চয় দেয়ালীর রাত্রে কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে, জ্বালিয়ে ছোটাবার মত অবস্থা করা হত আমার। ভাতের কথা, ডাল তরকারি মাছের কথা মনে হতেই মুখের মধ্যে এত জল কেটেছিল, আর পেটের মধ্যে কীরকম জ্বালা করছিল। তবে বন্ধুরা সবসময়ে গল্প করছিল, লেবুর জল চলছিল, সিগারেট চলছিল, তাই কোনরকমে ভুলে থাকা যাচ্ছিল। তবু আমি—অন্যদের মনের কথা ঠিক জানি না, দ্বিতীয় দিনে বিকেলের সময় মনে মনে সত্যি ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম। আমি এক পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে শুয়ে যেন নিজেকে সামলাচ্ছিলাম, আর ভীষণ ভয় করছিল, গেল বুঝি আমার কাপ ছটকে। একটা সময় এসেছিল, কারুর কথাবার্তা ভাল লাগছিল না, কেউ কাছে এলে ভাল লাগছিল না। মেয়েরাও কেউ কেউ ছিল, সারাদিনই কেউ না কেউ থাকতোই। রাত্রে কেউ থাকতো না, তখন শুধু ছেলেরাই থাকতো। দিনের বেলা মেয়েদের মধ্যে শিখাকেও কয়েকবার দেখেছি, ও আমাকে লেবুর জল-টলও দিয়েছে, বিশেষ কিছু মনে হয়নি। সবাইকেই যেমন দিচ্ছিল, আমাকেও তেমনি, অন্যান্য মেয়েদের মতই। কোন মেয়েকেও যেন কাছে ভাল লাগছিল না।

তার পরের দিন, তিনদিনের দিন সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙলো, আমি দেখলাম, কাপড় ঢাকার ফাঁক দিয়ে একটা বড় নিম গাছ দেখা যাচ্ছে। তার আশেপাশে আরো কয়েকটা কী গাছ। সেখানে রোদ পড়েছে, গাছের পাতাগুলো চিকচিক করছে, কিন্তু আমার যেন চোখের পাতাগুলো কেমন টনটন করছিল, চেয়ে থাকতে পারছিলাম না, আর চোখ দিয়ে যেন জল আসছে। এমন সময় কার একটা হাত আমার গায়ে এসে পড়লো, পাশ ফিরে দেখলাম, বিজয়, সেও অনশন করেছিল। ও আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলো একটু, আর আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমিও সেইরকম ওকে জড়িয়ে ধরলাম, আর দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কেন যে ওরকমভাবে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়েছিলাম জানি না, আর একটু একটু হাসছিলাম, অথচ কেউ কোন কথা বলছিলাম না। বাকী চারজন তখন ঘুমোচ্ছিল। তখন কিন্তু একটা আশ্চর্য, সেরকম খিদেটিদে লাগছিল না। অনশনের আগের দিন রাত্রে তো পারগেটিভ নিয়ে পেটটি একেবারে ফাঁকা করে নিয়েছিলাম। তিনদিনের দিন সকালে মনে হয়েছিল, পেট বলে ব্যাপারটা নেই, ওখানে কোন কিছুই হচ্ছে না। কেমন একটা নিঝুম ভাব, আমি যেন অন্য কোথায় কীভাবে রয়েছি, একেবারে একলা একটা ঘরের মধ্যে। অথচ সবাই রয়েছে, সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একলা থাকাতে অনেক সময় যে সেই একটা ভূতুড়ে ভয়,

বুকের মধ্যে গুরগুরিয়ে ওঠা ভাব, সেটা একেবারেই হচ্ছিল না। তবু যেন মনে হচ্ছিল, আমি একটা আলাদা কিছু—মানে, আলাদা কিছুর মধ্যে আছি, যেখানে কেউ পৌঁছুতে পারবে না, খিদে না, ভয় না, আমাকে কেউ ছুঁতেও পারবে না। ঠিক বোঝাতে পারি না ব্যাপারটা, এক এক সময় মনে হয়-না, কে কি বলছে না বলছে, আমি জানি না, শুনতে চাই না, সরে যাও, আমি একলাই পারি। একলার মধ্যেও যে একটা খুব জোর আছে, সেটাই যেন আমি বুঝতে পারছিলাম, অথচ তখন তো আমি বেশ দুর্বল, তবু যে ওরকম কেন মনে হচ্ছিল, জানি না।

অনেকক্ষণ পরে আমি বিজয়কে বলেছিলাম, 'তোর গা-টা একটু গরম গরম লাগছে।' বিজয় বলেছিল, 'তোর গা-টাও।' ভলান্টিয়ারদের মধ্যে একজন বলেছিল, 'এখন ওরকম একটু হয়।'

একটু পরেই ডাক্তার এসেছিল, আমাদের শহরেরই এক ছোকরা ডাক্তার। ছোকরা হলেও বেড়াল যেমন মাছের গন্ধ চেনে; সেও তেমনি পয়সার গন্ধ চেনে, আর বাঘ যেমন রক্তের গন্ধ পায় আর চায়, মেয়েমানুষের ব্যাপারেও সে ঠিক তাই, তবে শহরের এসব ব্যাপারে লোকটা সব সময়েই হাজির থাকে, আর তাতেই লোকটাকে বেধড়ক খচ্চর জেনেও কেউ বিশেষ পেছনে লাগে না। এখন তো সে আমার বিনা পয়সার ডাক্তার। একটু-আধটু শরীর খারাপ হলে ওকেই দেখাই, ওষুধও দেয় বিনা পয়সাতেই। সেই একই ব্যাপার, গুণ্ডাটাকে হাতে রাখার জন্যে। সবাইকে হাতে রাখার জন্যে যা যা করা দরকার, সবই করতে হয়, ওটাও বোধহয় বিজনেস ট্যাকটিকস, কিন্তু এদিকে হাতে রাখতে গিয়ে কাদের ঘাড়ে যে কাঁঠাল ভাঙা হচ্ছে, তাও তারাই জানে, যারা কোমরের কষি থেকে ঘামের গন্ধ লাগা চটচটে টাকাগুলো তুলে দিচ্ছে। পাঁচের জায়গায় দশ, দশের জায়গায় কুড়ি নিচ্ছে, নেবেই, ওদিকে দাতব্য করতে গেলে, এদিকে টান না মারলে চলবে কী করে। ঘর থেকে তো আর বের করবে না, বরং ঘরের জমাতে কোন ফাঁকি রাখলে চলবে না, সেটা আগেই ঠিক রাখতে হবে।

বুঝতে পারি, এখন যে আমাকে, অসুখ-বিসুখ হলে দেখতে হয়, ওষুধ দিতে হয়, তাতে দাঁতে দাঁত পিষে, নিজেরই মাড়িতে ব্যথা হয়ে যায়, কিন্তু বল হরি, কী করি উপায়! গুণ্ডাটাকে না সামলে রাখলে, কোনদিন একটা কী কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে, বলা তো যায় না। তা সে যাক গে, আমাদের দেখতে এসেছিল ডাক্তার, দেশের আর দশের সেবা করা যাকে বলে। সকলেরই নাড়ি টিপে, বুকে নল বসিয়ে, ব্লাড প্রেসার দেখে, লেবুর জলের সঙ্গে কিছু গ্লুকোজের জলের ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছিল। আমাদের সকলের শরীরই নাকি বেশ ভাল ছিল, একজন ছাড়া। সে ছিল বড়দাদের দলের। সে যে কেন উপোস করতে রাজী হয়েছিল, কে জানে, কারণ তার তো পাখীর মতন শরীর, লগবগে রোগা, চশমা চোখে, তার ওপরে স্‌সাহ্‌ দাঁতগুলো উঁচু ফাঁক ফাঁক। মাথায় একগাদা চুল, সেই খ্যাংরা কাটির ডগায়

আলুর মত মনে হত। দেখলেই মনে হত ওর পেটে সব সময়ে কুলকুল গোঁ গোঁ হুটর পাটোর শব্দ হচ্ছে, পেটের অসুখে ভুগছে। ব্যাটা, এমনিতেই না হয় তোর খাওয়াটা কম, হজম করতে পারিস না, তা বলে অনশনের রমজানি কেন। নাম করতে হবে, না? তাহলেও ডাক্তার তাকে ওষুধ দিয়েছিল। ওদিকে ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করছিল গভর্নিং বডি। বাছাধনদের ব্যাপারটা খুব সুবিধার মনে হচ্ছিল না। শোনা যাচ্ছিল, এস ডি ও নাকি আসচে, কারণ গভর্নিং বডির উনিই তো আবার প্রেসিডেন্ট—সেই কী বলে কথাটা—মানে খুঁটোর জোরে—ভাল কথায়, পদাধিকার বলে।

কিন্তু সে সবে কিছুই আমার যাচ্ছিল না। তোমরা যা খুশি তাই করতে পার, আমাকে ছুঁতে পার না, আর আমাকে ভয় দেখাতে পার না। ছেলে আর মেয়েরা সবাই আমাদের মাঝে মাঝে মুখে লেবুর জল-টল তুলে দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওরা গান গেয়ে উঠছিল, 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান। সংকটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।'...আগেও তো কতবারই ও গানটা শুনেছিলাম, পরেও অনেকবার শুনেছি, শুনছি, শুনব আরো, শুনে শুনে কান পচেও যাবে, কারণ এই তো বোধহয় কয়েকদিন আগেই শুনলাম, একটা গলির মধ্যে কয়েকটা বাচ্চা ল্যাংটো হয়ে, রাস্তার ধারের নর্দমায় পেছন ঝুলিয়ে বসে, এক কাজে দু' কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে এক কাজ, সেটা শরীরের ব্যাপার, এদিকে প্রাণ খুলে 'ছংকোচের বিবভলতা নিজেলো অপমান', চীৎকার করে যাচ্ছিল। তাই বলছি, এখন ওই শোনা পর্যন্তই, আর কিছু মনে হয় না। অথচ সেই সময়, সেই উপোসের দিনে, গানটা শুনতে শুনতে, আমার বুকের মধ্যে কীরকম করে উঠেছিল। ওরা তুড়ি দিয়ে হাততালি দিয়ে তালে তালে গেয়েছিল, আর আমিও যেন সেই তালে তালে মনে মনে বলেছিলাম, 'না না না, কখনো না, কোন কিছুতেই মানব না।' শরীরে তো একরত্তি জোর ছিল না বলতে গেলে, অথচ ভিতরটা যেন ফুলে ফুলে উঠেছিল। তারপরে কৃষ্ণা, সেই বড়দাদের দলের মেয়েটা, যাকে ও বাড়িতে ঘরের মধ্যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাবড়ে চুমো খাচ্ছিল, সেই কৃষ্ণা গেয়েছিল, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে নোয়াই মাথা।' আবার গেয়েছিল, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' আহ্, মাইরি, আমার কেন জানি না, ফোঁড়া ফেটে গেলে যেমন পুঁজ রক্ত গলে যায়, আর শরীরের মধ্যে কী রকম একটা হতে থাকে, চোখের জলটা যেন সেভাবেই গলে গলে পড়ছিল। সে সময়ে ছুঁড়িটাকে আমার কীরকম যেন একটা ফুল ফুল মতন মনে হয়েছিল, ভোরবেলার টাটকা ফুল যেমন থাকে না, সেইরকম। সুন্দর তাজা আর মিঠে মিঠে গন্ধ। তখন অন্য সব কথা মনেই আসেনি। আমি পাশ ফিরে চোখ বুজে শুয়েছিলাম, যাতে আমার চোখের জল পড়া কেউ দেখতে না পায়। ওর গলাটাও অদ্ভুত মিষ্টি ছিল—এখন যে মেয়েটা কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেছে, বিয়েই হয়েছে না কি, খালি নিকা চালিয়ে যাচ্ছে, কে জানে।

বড়দার সঙ্গে তো আর নেই, কতদূর এগিয়েছিল, কে জানে, এখন হয়তো অন্য কোন ঘরের দরজার পাশে, অন্য কারুকে খাওয়াচ্ছে, তবু গলাটা দারুণ লেগেছিল, ঠিক যেন তারের বাজনায় আওয়াজ দেবার মতন। নাহ্, ছুঁড়ির গলাতে আওয়াজ ছিল।

এখন অবিশ্যি সমস্ত ব্যাপারটা আমার অন্যরকম লাগে, যেন থিয়েটারের একটা জমজমাট সিন। সিনেমার একটা বেশ লাগদার জায়গা, কাঁদানে কাঁদানে এক একটা জায়গা থাকে যেমন সিনেমা থিয়েটারে, বাজনা বাজছে, ওঁয়োঁয়োঁ, ওঁয়োঁয়োঁ, আর লোকটা বা মেয়েটা কেঁদে ভেস্‌সা যাচ্ছে, সেইরকম। তবে আমার মনে হয়, আমার চোখের জলটা একজন দেখতে পেয়েছিল, শিখা দেখতে পেয়েছিল, কারণ সে সময়ে ও আমাকে জল বাড়িয়ে দিয়েছিল মুখের দিকে, আমি ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলাম খাব না, আর শিখা, যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে হঠাৎ আঙুল দিয়েই আমার নাকের পাশে, চোখের কোলটা মুছে দিয়েছিল। বড়দা মেজদা অনেকবারই যাতায়াত করেছিল, আর বোধ হয় সেই একবারই দেখেছিলাম, ওরা আমাকে খাতির করেছিল, কেননা, ওটা ওদের ঠোঁট-বাঁকানো আর ভারিক্কি চালের একটা জোর জবাব হয়েছিল। তবু মেজদা ওর সেই বাঁকা হাসিটা ছাড়েনি, বলেছিল, 'টুকু তা হলে কামাল করলি।' না করলেই যেন ওর মনের মতন হত। এমন পাজী না, ওর চোখের চাউনি দেখেই বুঝতে পারতাম, ব্যাপারটা যেন একটা কিছুই না, খুবই সামান্য, সেইটা বোঝাবার চেষ্টা করত। আর বড়দার সেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, 'কীরে টুকু, কষ্ট হচ্ছে ?'—যেন কী এল, তবু যদি তোকে না জানতাম—যাকগে, সব থেকে খারাপ লেগেছিল, আমার যখন ঘুম আসছিল, তিনদিনের দিন, দুপুরের দিকে, তখন প্রতিনিধি নিয়ে ওরা ক্যাম্পের মধ্যেই তর্কবিতর্ক আরম্ভ করেছিল। এমন খিস্তি করতে ইচ্ছা করে, সকলেই হঠাৎ যেন আসল ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল। মেজদাদের দলের একটা ছেলে, সব সময়ে প্রায় ঘুষি পাকিয়ে কথা বলে—ওটাকে একবার আমি মাথা ফাটিয়েছিলাম, প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলেছিল, 'তা হলে আমরা আলাদা ক্যাম্প করব, আমরা ইউনাইটেড থাকব না।' অবিশ্যি, অন্য দলগুলোরও পেঁয়াজি ছিল, সকলেই বলে, 'আমায় দ্যাখ।' আমি তো ভেবেছিলাম, যাহ্ স্‌সাহ্, সব ভণ্ডুল হয়ে গেল বোধহয়।

তারপরে জানি না, কীভাবে ওদের মিটমাট হয়েছিল, তবে হয়েছিল একটা কিছু। আমি জানতে পারিনি, কারণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর ঘুম যখন ভেঙেছিল, চোখ তাকাবার আগেই আমি ঝিঁঝির ডাক খুব আস্তে শুনতে পেয়েছিলাম। যেন অনেক দূর থেকে শব্দটা আসছিল। আস্তে আস্তে চোখ তাকিয়েছিলাম, কেন না, হঠাৎ তাকাতে গেলেই যেন চোখের পাতা টনটনিয়ে ব্যথা করে উঠবে মনে হচ্ছিল। অবিশ্যি সে রকম একটা কিছু না যে, একেবারে চোখের পাতা ভেঙে যাবে। চোখ তাকাতে বুঝতে পেরেছিলাম, আমি পাশ ফিরে শুয়ে আছি। কারা যেন অনেক দূর থেকে

কথা বলছিল, তার মধ্যে কয়েকটা কথাই ঘুরে ফিরে শুনতে পাচ্ছিলাম, 'নিশ্চয়ই কেউ তার কেটে দিয়েছে। যে-ই কাটুক, তাকে ছাড়া হবে না।...এখন বিরিজের দোকান থেকে একটা কানেকশন লাগিয়ে নিলেই হবে।'

তার মানে, কলেজের ইলেকট্রিক লাইন থেকে টেনে, ক্যাম্পে একটা আলো জ্বালানো হয়েছিল। সেই তারটাই কেউ কেটে দিয়েছিল—কে জানে, কার এত সাহস হয়েছিল। কাছেই বিরিজের মুদি দোকান ছিল, সেখান থেকেই আবার লাইন টানার কথা হচ্ছিল। তাই পাশ ফিরে শোয়া অবস্থায় আমি যখন চোখ মেলেছিলাম, অন্ধকার মতন দেখেছিলাম, অথচ একটা আলো কোথা থেকে এসে যেন আমার চোখের পাশে পড়ছিল। তেমন জোরালো আলো না, কিন্তু আলো, বুঝতে পারছিলাম, আলোর রেশটা যেন আমার গালের ওপরেও পড়েছিল। রাস্তার আলো নিশ্চয়ই না, কারণ মনে ছিল, রাস্তার দিকটা একটা পুরো শতরঞ্চি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সামনে অন্ধকার, পাশে একটা আলো, আর ধূপ-ধূনার গন্ধ পাচ্ছিলাম, মশার জন্যে যেগুলো জ্বালানো হয়েছিল। পাশের আলোটা দেখবার জন্য, আমি আস্তে আস্তে চিত হয়েছিলাম, আর চিত হতেই, ইস্, ঠিক মনে হয়েছিল, আমার চোখের সামনে প্রায় গোল একটা লাল আলো ঝুলছে। প্রথমটা এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে, জিনিসটা কী, তা হঠাৎ বুঝতেই পারিনি। তারপরে দেখি কি, ওটা চাঁদ—গোল তাঁবার থালায় আলো পড়লে যেরকম দেখায়, ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছিল। প্রথমে চোখের সামনে মনে হলেও আসলে ওটা অনেক দূরেই ছিল, কাপড় ঢাকার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, আস্তে আস্তে আরো বুঝতে পেরেছিলাম, নিমগাছটার প্রায় মাথার কাছেই চাঁদটা রয়েছে, কারণ গাছটার মগডালের একটুখানি যেন চাঁদটার গায়ে লেগেছিল। আলোটা প্রায় সরাসরি আমার গায়ের আর মুখের ওপর পড়েছিল। তাতে আমার যেন মনে হচ্ছিল, আমি কোথায় একটা জায়গায় যেন রয়েছি। মনটা কেমন একরকম হয়ে যাচ্ছিল—এখন ভাবলে মনে হয়, পেটে ইঁদুরে ডন মারলে চাঁদকেও বোধ হয় ওরকমই লাগে, একটা কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব। ভূতুড়েই বলতে হয়, আর মনও ওইরকমই হয়ে যায়। এই যে আমি, এই আমি যেন মোটেই সেই আমি না, স্‌সাহ্, এর চেয়ে খোয়াব দেখা আর কাকে বলে। একমাত্র মালের ঝোঁকেই ওরকম মনে হতে পারে। যাই হোক, আমি যখন একরকম দেখছিলাম, তখনই শুনতে পেয়েছিলাম, 'জেগেছে!' কোন মেয়ে বলেছিল, তাতে একটা কথা বোঝা গিয়েছিল, সন্ধ্যারাত্রই হবে তখন, কারণ মেয়েরা ক্যাম্পে রয়েছে। মেয়ে তো : বেশী রাত্র অবধি থাকলে, তারপরে নিজেদের মধ্যে মাখোমাখোটি করে কাজ সারো, সিটি হবার লয়। অনশন কর, আর যা-ই কর বাবারা, ও সব ছোঁড়াছুঁড়ি একত্রে রাত্রে থাকবে, তা হবে না, মেয়েদের সবাইকেই বাড়ি চলে যেতে হত। কে যে বলেছিল 'জেগেছে', বুঝতে পারিনি, কিন্তু চাঁদকে আড়াল করে কে যেন

দাঁড়িয়েছিল। কাচের গেলাস আর চামচের শব্দ আমার কানে এসেছিল। যে দাঁড়িয়েছিল, সে একটা মেয়ে, এটা আমি বুঝতে পারছিলাম, মাথা চুল গলা কাঁধ শরীরের ভাবটা, শাড়ির আঁচল, এ সব দেখে বুঝতে পারছিলাম, কোন মেয়ে। তারপরে সে চাঁদকে পাশ কাটিয়ে, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার মুখে তাঁবায় আলো পড়া লাল আভা লেগেছিল, চিনতে পেরেছিলাম, ওটা শিখা। কিন্তু শিখা হলেও যেন শিখা না, একটা অন্য কেউ, একটা অন্য ভাব, মাইরি—ওর চোখগুলো কীরকম, অন্যরকম লাগছিল, যেন কত বড়, কুমোরদের আঁকা মূর্তির চোখের মত সেই যেন কান পর্যন্ত টানা, আর সাদা বলে কিছু নেই, চোখের সবটাই কালো, অথচ একটা চিকচিকে ভাব, আর গালটা লাল লাল, নাক ঠোঁট লাল লাল, কাপড়টা লাল লাল—যে কাপড়টা খানিকটা আমার গায়ের কাছেই লুটিয়ে পড়েছিল, কারণ শিখা নিচু হয়েছিল, আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, আমি ওর গায়ের একটা হাল্‌কা গন্ধ পেয়েছিলাম—কিসের গন্ধ তা বলতে পারব না, হয়তো গায়ের না, চুলের, বা কী জানি, আর কিছু মেখেছিল কিনা, আর ওর নিশ্বাসের হাওয়াও আমার মুখে লেগেছিল, বলেছিল, 'সুখেনদা, একটু গ্লুকোজের জল খান।'

জলের কথা শুনেই, আমার কিন্তু একটা অন্যরকম ফিলিঙস্‌ হয়েছিল, আশ্চর্য, গলাটা তো বেশ কাঠ-কাঠই লাগছিল, তবু মনে হয়েছিল, আমার তলপেটটা ভার আর জলে ভরতি হয়ে আছে যেন, তাই আমি প্রথমটা শব্দ করেছিলাম, 'অ্যাঁ?'

শিখা আবার বলেছিল, 'একটু গ্লুকোজের জল খান।'

আমি বলেছিলাম, 'না, আমি একটু পেচ্ছাব করতে যাব।'

ধূর স্‌সাহ্‌, আমি একটা কী মাইরি, এখন তো ভাবলেই অবাক লাগে, আমি কিনা একটা মেয়েকে বলেছিলাম সেই কথা। আরে, 'বাথরুমে যাব' বা 'বাইরে যাব' বল, তা না, একেবারে খোকনের মতন—কেন, 'হিসি' বললেই পারতে, বুদ্ধু! কিন্তু কথাটা যে তখন কারুর কানে খারাপ লেগেছিল এমন মনে হয়নি, আমারও মোটেই কিছু মনে হয়নি, যেন খুব সাধারণ কথাই বলেছি। কথাটা বলেই আমি উঠতে যাচ্ছিলাম, শিখা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি ধরি, তা নইলে পড়ে যেতে পারেন। ছেলেরা কেউ নেই তো, সব আলোর জন্যে গেছে, লাইন কেটে দিয়েছে কিনা।'

সেটা তো আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম। কিন্তু শিখার ধরবার কোন দরকার ছিল না, উঠে দাঁড়াবার বা চলবার শক্তি আমার ছিল, তাই ওর কথা না শুনে উঠতে উঠতেই বলেছিলাম, 'আমি পারব।'

কিন্তু শিখা শোনেনি, কোনরকমে হাতের গেলাসটা একদিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'কৃষ্ণাদি, ধরুন তো গেলাসটা।'

তখন জানতে পেরেছিলাম, কৃষ্ণাও ছিল। সে হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিতেই শিখা আমার হাত ধরেছিল। ওর সেই হাতটাও লাল লাল

দেখাচ্ছিল, ওর হাতটা ঠাণ্ডা ছিল, ঠিক যেমন মনে হচ্ছিল লাল আলোটাও যেন ঠাণ্ডা সেইরকম আর শিখাকেও যে কারণে শিখা বলে মনে হচ্ছিল না, সেই আমার অদ্ভুত মনের ভাবের মতই। ও যখন হাতটা ধরেছিল, আমার ডানাটা, তখন যেন সেই ভূতুড়ে ভূতুড়ে ভাবটাই আরো বেশী হয়েছিল, অথচ আমি যেরকম বলা উচিত, সেইভাবেই বলেছিলাম, 'আমি পারব যেতে।' শিখা সে কথার কোন জবাবই দেয়নি, খালি বলেছিল, 'ঠিক আছে।' ঠিক আছে। তার মানে কী, ওর নিজের কথা বলতে চেয়েছিল যে, 'আমার জন্যে ভাববেন না, ঠিক আছে?' আমার সেরকমই মনে হয়েছিল, তবে আমার তখন ওসব নিয়ে বেশী কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। আমি উঠে দাঁড়াতে শিখা আমাকে এমনভাবে ধরেছিল, ওর গাটা আমার গায়ের সঙ্গে লাগছিল, ওর বুকটা আমার ডানার সঙ্গে লাগছিল, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, আর আমার কীরকম একটা অদ্ভুত লাগছিল, আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। তখন ওর মুখে ছায়া পড়েছিল, মুখটা দেখতে পাইনি, কিন্তু আমার তো এখনো ভাবলে অবাক লাগে, উল্লুক তোর পেটে তিন রোজ ভাত নেই, শিখার গায়ের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়িতে তোর ওরকম লাগছিল কেন। সেটা যে ঠিক কোন মেয়ের সঙ্গে লবজবানি করার মত একটা ব্যাপার, তা না, একটা অন্যরকম ভাবের, সেই অনেকটা গান শুনে যেমন হয়েছিল না, সেইরকম যেন চোখে জল এসে পড়বে, অথচ আমার উপোসী শরীরে রক্ত যেন কেমন করে উঠেছিল—মানে গরম আর কী। হ্যাঁ, একসাইটমেণ্টই যাকে বলে—কী বলব, মার তোর মুখে লাথি, কিন্তু কী যে হয়েছিল না সত্যি, আমি অনশন করছি, প্রতিবাদ করছি, শরীর দুর্বল, একটা মেয়ে আমাকে ধরেছে, আর আমার কিনা কীরকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যেন কেঁদে ফেলি, আর শিখার সেই নরম বুকের মধ্যে মুখটা ডুবিয়ে দিই, ডুবি—য়ে দিই। একে শয়তান বলে না তো কী, কিন্তু কী করব, আমার যা সত্যি মনে হয়েছিল, তাই ভাবছি। তা বলে শিখাকে সেসব জানতে দিইনি, সে জ্ঞানটা টনটনে ছিল। ও আমার ডানা ধরে ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পের বাইরে কয়েক পা গেলেই তো একটা নর্দমা ছিল, সেটাই তখন আমাদের ইউরিনাল হয়েছিল। বাইরে যেতে, সেই তাঁবাটে আলোটা আরো বেশী করে গায়ে পড়েছিল, আমার আর শিখার দুজনেরই। আমারটা আর কে দেখছিল, ওরটাই আমি একটু একটু দেখছিলাম, কিন্তু যে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া, আশ্চর্য, তার কোন চাপই আর ছিল না। একটু আগেই যে আমার মনে হয়েছিল, গলা শুকিয়ে গেলেও জল খাবার আগে, আমাকে নর্দমার ধারে যেতে হবে সেটা বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছিল, বরং সেই উত্তেজনায় সব ব্যাপারটা একেবারে উল্‌টে গিয়েছিল। তবু আমি নর্দমার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন শিখা আমার হাত দুয়েক পিছনে দাঁড়িয়েছিল। অতটা তো আর পারে না যে, তখনো আমাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। জানি না, অবিশ্যি এখন হলে কী হবে, যদি আমি উঠে দাঁড়াতে না পারি, আর আমাকে সেই

কর্মটি করতে হয়, শিখা হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে কিনা।

এ আবার একটু খচড়ামি হয়ে গেল, তাই হাসিও পায় ভাবতে এখন আর বাবা অত চাপাচাপি করার কী আছে। একবার তো ফিতে কাটা নিয়ে কথা, কুচ—তারপরে স্‌সুভ উদ্বোধন হয়ে গেল, মন্ত্রী মশাই চলে গেলেন, এবার ভি আই পি-এরা, আর জনগণ চলে আসুন। যত 'সংকোচের বিহ্বলতা' তো সেই পর্যন্তই। কিন্তু নর্দমার কাছে গিয়ে আমার দাঁড়ানোই সার হয়েছিল, একেবারে একটু কিছু না। জানি না, কী করে শরীরের এসব ব্যাপারে এমন ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। কী রে বাবা, সেই যে বলে না, যৌবন কুরকুরোয় না পেট কুরকুরোয়? ধুঁকতে ধুঁকতেও ও আবার কী। জানি, আমাকে ফিরতে হয়েছিল, ওকে ধরেই ফিরেছিলাম, আর তখন, সব মিলিয়ে মনটার মধ্যে কেমন একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। গোলমাল মানে, মনের ভিতরটা যেন কেমন একরকম তলতলিয়ে উঠেছিল—হয় না একরকম, যেন মনটা তলতল করছে, দুলছে, ঠিক যেমন জলে হাওয়া লাগলে দোলে, সেইরকম এদিকে ওদিকে ধাক্কা লেগে লেগে যেন বেড়ে যেতে চায়, উপচে উপচে পড়তে চায়—সেটা কীরকম ভাব জানি না, সেরকমই আমার মনে হয়েছিল, অথচ তার সঙ্গে একটা কষ্ট, যেন ভিতর থেকে কিছু একটা ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে, অথচ আবার শরীরের মধ্যে এমন একটা ভাব, একটা সুখের মত, মনে হচ্ছিল, উনুনের কয়লাগুলো সব জ্বলে উঠলে যেমন একটুও ধোঁয়া থাকে না, একটাও শিস থাকে না, একেবারে লাল গনগনে আগুন, আমার শরীরের ভিতরটা যেন সেইরকম হয়েছিল। তার একটু আগেই তো সব যেন কেমন অসার অসার লাগছিল, আর তখন মনে হচ্ছিল, শরীরের সবখানে এত বেশী সার, একটু সামান্য ছুঁয়ে গেলেও ঠিক টের পাব।

এই সব ব্যাপারকে ভালবাসা বলে কিনা জানি না, তবে সব মিলিয়ে আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, শিখাকে আমি ভালবাসি, ওকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। ফেরবার সময়ও আমাকে, আমার পিঠের ওপর দিয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরেছিল, খুব সাবধানে, যাতে আমি পড়ে গেলে ও সামলাতে পারে, তাতে আমার শরীরের মধ্যে ওকে আরও বেশী টের পাচ্ছিলাম। তবু সেই ঘটনার আগেও তো, মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি—মানে সঙ্গ করা যাকে বলে, গায়ে গায়ে জড়াজড়ি, যেমন দোকানের পিছনে বা অন্য কোথাও, কিন্তু সেসব ব্যাপারের সঙ্গে, শিখার ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা মনে হয়েছিল। এমন কি, নিজেকে কেমন একটু খারাপ লেগেছিল, ছোটলোক ইতরের মতন। এটা বুঝতে তো কোন অসুবিধা ছিল না, শিখা খুব ভাল মনেই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আমার ভিতরের কথা কিছুই জানতে পারেনি, অথচ আমার ব্যাপারটা কী জঘন্য। কিন্তু আমি তো ওসব চাইনি, ভাবিওনি। ফেরবার পথে আমি চোখ তুলে তাঁবার থালার মতন চাঁদটার দিকে তাকিয়েছিলাম, সেটা তখন নিম গাছের মগডালটাকে একটু পার হয়ে গেছে। ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে

আমি শুইনি, চৌকির ওপর বসেছিলাম, শিখা বলেছিল, 'শুয়ে পড়ুন না, আমি আপনাকে জল দিচ্ছি।'

আমি বলেছিলাম, 'বসতেই ভাল লাগছে। তখনো আলো জ্বলেনি, কিন্তু ছেলেদের দু-একজন ক্যাম্পে ফিরে এসেছিল, বলেছিল, এখুনি আলো জ্বলবে। একজন এসে আমার পাশে বসেছিল, আমার গায়ে হাত রেখেছিল, আমি চুপ করে ছিলাম। বসা অবস্থায় চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার বুক আর পেটের কাছে আলো পড়ছিল, পরের দিন নাকি এস ডি ও আসবে, কিন্তু আমি কিছুই যেন শুনছিলাম না, দেখছিলাম না, কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিলাম। গ্লুকোজের জল খেয়েছিলাম শিখার হাত থেকে। গেলাসটা ও আমার হাতে দেয়নি, মুখের কাছে ধরে ধরে খাইয়ে দিয়েছিল, আর কী আশ্চর্য, আমি তখন শিখার মুখের দিকে তাকাইনি অথচ ওর মুখটাই যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আর সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল, এমন একটা সুন্দর মুখ আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি, মাইরি। আসলে কথাটা তো একদম বাজে, শিখার থেকে অনেক সুন্দর মুখ আমি দেখেছি, কিন্তু সেই সময়ে মনে হয়েছিল, শিখার মুখটা কী অদ্ভুত সুন্দর। জল খাওয়াতে ওর একটা হাত আমার গলার কাছে কাঁধের ওপর রেখেছিল, সেটা যেন আমি টেরই পাচ্ছিলাম না, অথচ ইচ্ছা হচ্ছিল শিখা আমাকে একটু জড়িয়ে ধরুক, একটু আমার গায়ে হাত দিক। ওর মুখটা যেন চোখের সামনে ভাসছিল, সুন্দর মুখ, আর সুন্দর মুখ হলেই, মুখের ভাবটাবগুলোও কেমন একরকম অদ্ভুত হয়, যেন চোখে হাসি হাসি ভাব, ঠোঁটের কোণেও সেইরকম, হাসছে না অথচ হাসি হাসি ভাব, এইরকম দেখছিলাম। পৃথিবীর যে কেউ এলেও যেমন আমাকে অনশন থেকে ফেরাতে পারতো না, দাবী না মেটা পর্যন্ত খাওয়াতে পারতো না, ঠিক তেমনি মনে হচ্ছিল, শিখার মুখটা কেউ আমার চোখ থেকে সরাতে পারবে না। জল খেতে খেতেই আলো জ্বলে উঠেছিল। দেখেছিলাম, কৃষ্ণাও একজনকে জল খাওয়াচ্ছিল। আমি তখন শিখার মুখের দিকে তাকাইনি, ইচ্ছা থাকলেও পারিনি, অথচ ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছিল। জল খাওয়া হয়ে যাবার পরে, গেলাসটা সরিয়ে নিয়েছিল, একজন একটা সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার খেতে ইচ্ছা করছিল না, বলেছিলাম, 'ভাল লাগছে না।' হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মোছবার সময়, শিখার দিকে আমি তাকিয়েছিলাম, শিখাও তাকিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর একটু খাবেন ?' আমি মাথা নেড়েছিলাম, চোখ ফেরাব ভেবেও ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, শিখা এমনভাবে চোখটা নামিয়ে নিয়েছিল যেন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর হঠাৎ কেমন হয়ে গিয়েছিল। সেটা আমি বলতে পারব না, কেমন হয়ে গিয়েছিল—না, রাগ বা বিরক্ত না, অন্যরকম, যেটা দেখলেই মনে হয়, ও বুঝি একটু কেমন অবাক হয়ে গেছে, একটু লজ্জা পেয়ে গেছে। স্‌সাহ্‌, কত কীই মনে হয়েছিল, যত্‌তো

এলেবেলে ভাবনা, বলে কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল, আ বে লে লে যাহ্ !.....



যাই হোক, সেই প্রথম দিনের ছোঁয়াছুঁয়ির কথাই বলছিলাম, ওহ্, তার যে কী এফেক্ট না, কতদিন ধরে যে চলেছিল, আর কী সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল আমার মনের মধ্যে সেও একরকমের ভূতুড়ে ব্যাপার বললেই হয়। ছ'দিন হাঙার স্ট্রাইক চলেছিল, এস ডি ও এসেছিল, শেষ পর্যন্ত গভর্নিং বডির জাদুদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছিল, তবু খচ্চরগুলোর ওপর আজও আমার রাগ যায়নি, শহরের সেই মান্যিগণ্যি লোচ্চাগুলোর জন্যে কিনা ছ'টা দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। এখন তো মান্যিগণ্যি হওয়ার পলিসি সব শিখে গেছি, ওরা সব মুখোস আঁটা বদমাইস, তার সঙ্গে স্ট্যাটাস মেনটেন করে যাওয়া, আমার বড়দা মেজদা এখন যেমনটি হয়ে উঠছে। যা, তোরা তাই কর গিয়ে, আমি গুণ্ডাই থাকব। বাবাকেও দেখেছি, তোদেরও দেখছি, আমার কাছে নতুন কিছু না, একমাত্র তফাত হল, দাদারা রাজনীতি করে, বাবা তা করতো না।

কিন্তু সেই ছ-দিনের এফেক্ট, স্‌সাহ্ ছত্রিশ দিন ধরে চলেছিল। মনের সে যে কী একটা অবস্থা না, তা সে যাই হোক গে, অবাক হতে হয় যে-স্যারটির চাকরিতে বহালের জন্যে ছ-দিন না খেয়ে ছিলাম, তার সঙ্গেই পরে পরীক্ষার হলে—ধ্-র, সে কথা যাক গে, যে মেন গেট নিয়ে অতো ঝামেলা, সেই মেন গেট ঠিকই আছে, কিন্তু পাশ ঘেঁষে যতটা জমি ছিল, যেখানে আমাদের ক্যাম্প হয়েছিল, তার ওপরেই তো গভর্নিং বডির মেম্বার বে-নামেতে সেই বিল্ডিং হাঁকিয়েছে, এখন দেখা গিয়ে, সেখানে একতলাতে কী রম্‌রমা বিজনেস চলেছে। ছেলেদের সিগারেট চা, খাতা পেন্সিল কলম লজেন্স তো বাদই দিচ্ছি, আরো কত কী রপোট চলেছে—তা যাকগে সে কথা, আমি শিখার কথাই বলছি, সেই ছ'দিনের এফেক্ট যে আমাকে কী সব কাণ্ড করে দিয়েছিল, কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, কারণ তারপরেও আরো কয়েকবার শিখা আমাকে ছুঁয়েছিল—কিন্তু গুলি মারো সে সব কথায়, মোটের ওপর তারপর থেকে আমি আর শিখাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি। থাকতে পারিনি মানে কী, একটা কুকুরের মতই প্রায় ওর পেছনেই লেগে আছি, তা বলে কি আর এদিক ওদিক টাঁক মারিনি, না শিখাই মারছে না, তবু শিখাকে আমি ছাড়তে পারিনি। কিছু যে পাইনি, তা না, তবে সেটা আমার কাছে পাওয়া বলে মানেই হয় না, সে পাওয়াটা যেন কিছুই না। অথচ আর কী-ই বা পাওয়া

যেতে পারে, ওকে তো আর কেটেকুটে মাংস বানিয়ে খেয়ে ফেলা যায় না, যদিও এক এক সময় সত্যি মনে হয়, ওর ঠ্যাঙ দুটো ধরে ছিঁড়ে ফেলে দিই—সেই কী বিচ্ছিরি ব্যাপার, কিন্তু এ কথা আমার বারে বারে মনে হয়, পাইনি, পাইনি, ওকে আমি পাইনি। কী পাইনি, তা বুঝিয়ে বলতে পারি না, ওটাও একটা ভূতুড়ে ব্যাপারের মতনই, তবে এমনি ওর শরীর-টরীর সবই আমার দেখা জানা আছে, বেশ ভালভাবেই জানা আছে, আর সে জানাটা এমন একটা জানা, সত্যি, অন্য কোন মেয়ের কাছে সেটা কখনোই জানা যায় না। কিন্তু আমি কি, স্‌সাহ্‌, তাও বুঝিয়ে বলতে পারি নাকি, কী জানা আছে। ছাই, ওসব আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না, কী জানা আছে, মোটের ওপর শিখাকে পেলে আর কোটি মেয়েও চাই না, এই আর কী, এবার বোঝ স্‌সাহ্‌, ব্যামোটা কোথায়। একে বলে ভূতে পাওয়া রোগ, ভূতুড়ে ব্যাপার। তবে এই শরীর-টরীর যে কারণে ভাবছিলাম, আমার সবই জানা আছে, এই যে শিকের গরাদের মত জামাটা ঢল খেয়ে যাওয়ায় ওর বুকের যতটা দেখা যাচ্ছে, সব আমার জানা, তবু হাতটা যেন দারুণ খিদেয় কেঁউ কেঁউ করছে, কারণ কিছুতেই খিদে মরে না, সব সময়েই নতুন নতুন মনে হয়।

কিন্তু ও কি সত্যি এদিকে ফিরবে না, একটা কথাও বলবে না ! এবার আমি ওকে জোর করে ধরে, আমার দিকে ফেরাই। দু' কাঁধের ওপর হাত রেখে আমার দিকে ফিরিয়ে ডাকি 'এই !'

শিখা তৎক্ষণাৎ দু' কনুই দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। হাতে প্রজাপতিটা ধরা, তা-ই কনুই দিয়ে আমার বুকের কাছে ধাক্কা দিয়ে, আমাকে সরাতে চাইল, আসলে ও নিজেই একটু সরে গেল আর আমার দিকে রেগে তাকালো। ওই যে সেই গান আছে না, এমন মাটিতে চাঁদের উদয়, কে দেখবি আয়, আমার ঠিক তেমনি করে বলতে ইচ্ছা করছে, 'মেয়ের এমন রাগ কে দেখবি আয়।' একেবারে ছবি, মাইরি বলছি, সেই, সেই যে বলছিলাম না, সিনেমা সিনেমা। কিন্তু শিখা তো সত্যি আর সিনেমার ছবি না, মিছি মিছি রাগ দেখাচ্ছে না, ওর রেগে যাওয়া চোখ দুটোতে জলও রয়েছে, সেই ছবির মতই। আঁচলটা তেমনি লুটিয়ে পড়েই রইল, আর লাল নীল হলুদের ডোরাকাট জামাটা বুকের কাছে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে কি না, তা-ই। ওর এরকম চেহারা, আমি আরো কয়েকবার দেখেছি, এই রকম রেগে যাওয়া লাল লাল চোখ, অথচ জল এসে পড়ায় একটা টল টল ছল ছল ভাব, নাকের পাটা একটু একটু ফোলানো, কাঁপা কাঁপা, ঠোঁট দুটো শক্ত করে টিপে রাখা। সেই একদিনের কথা আমার মনে আছে, অথচ সেটা প্রথম দিনের কথা না, বরং ও সেদিন বেশ খুশি মনেই রাজী হয়েছিল, আর তাতেই আমি বেশী ক্ষেপে গিয়েছিলাম কি না জানি না, এমন কাণ্ড করেছিলাম, যাচ্ছেতাই। আরে, খাবি তো, থালাটা ভেঙে চুরমার করে নাকি। উহ্‌, সেদিন দেখেছিলাম, আমার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে—ওটাকে ছাড়া

পাওয়া বলে না, নিষ্কৃতি পাওয়া বলে, পেয়ে উঠে ঠিক এমনি করেই তাকিয়েছিল আমার দিকে। কী সুন্দর হাসিখুশি ছিল তার একটু আগেই, আর কী মূর্তিই হয়ে উঠেছিল। কেবল একটা কথাই, নিচু গলায়, কিন্তু ফুঁসে উঠে বলেছিল, 'পশু !'

তখন আমার চোখে নেশা থাকলেও, একেবারে ল্যাজ গুটিয়ে যাওয়া, চোখ পিটপিটনো কুকুরের মতন হয়ে গিয়েছিল। সে রাগ কাটাতে অনেকদিন লেগেছিল, অনেক হাতে পায়ে ধরতে হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল ওর শরীরের ব্যাপার, আর এটা তো একটা প্রজাপতি। প্রজাপতিটার জন্যে সত্যি ও এরকম করছে, নাকি, অন্য কোন মতলবে আছে, যাতে এ-ই দিয়েই সকালবেলাটা ভাগিয়ে দিতে চায়। কারণ, জানে তো ও ওরকম করে থাকলে, আমি বিশেষ সুবিধা করতে পারব না, হয়তো চলেই যেতে হবে। অথচ, সত্যি তো আমি ওটাকে মারতে চাইনি। বললাম, 'আমি কি ওটাকে মারতে চেয়েছি নাকি, ও নিজে তো— ।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, ঠিক যেমন করে 'পশু' বলে উঠেছিল একদিন, তেমনি নিচু স্বরে ফুঁসে বলে উঠলো, 'গুণ্ডা !'

কথাটা শুনেই এমন হাসি পেয়ে গেল, আমি খ্যাল্ খ্যাল্ হেসে উঠলাম। বললাম, 'গুণ্ডা বলছ !'

ও যেন প্রায় ঝাঁকিয়ে উঠলো, 'বলব, হাজার বার বলব, একটা গুণ্ডা তুমি।'

আবার হেসে উঠে আমি বললাম, 'সে তো সবাই বলে আমাকে।'

'আমিও বলব। গুণ্ডাকে গুণ্ডাই বলব।'

'বল না বুঝি !'

'আরো বলব, তুমি গুণ্ডা, গুণ্ডা, গুণ্ডা।'

যেন একটা ছোট মেয়ে ঝগড়া করছে, ঠিক এমনি ভাবে বলছে। হাসি পেলেও, আমার ভিতরে ভিতরে একটু রাগও হচ্ছে। একটা প্রজাপতির জন্যে—অথচ ও যেরকম করছে, তাতে এটা আমি জানি, ও সত্যি ন্যাকরা করছে না। বললাম, 'ঠিক আছে, আমি তো গুণ্ডাই।'

'তা-ই এটার সঙ্গেও গুণ্ডামি করতে হবে, না ?'

মানে প্রজাপতিটার সঙ্গে। আমি ওর কাছে গেলাম, ওর গলাটা ধরতে গেলাম, ও গোটা শরীরে একটা ঝাঁকুনি মেরে বললো, 'না।'

আসলে, ওর চেহারা, রাগ, চোখ মুখ, শরীরের ঝাঁকুনি দেখে, আমার ভিতরটা অন্যরকম ভাবে তরতরিয়ে যাচ্ছিল। এ সে-ই, অনশনের দিনের মতই, ও ছিল একরকম মনে, আমার ওদিকে অন্যরকম। আমি বললাম. 'কিন্তু আমি ওটা তোমার জন্যেই ধরতে চেয়েছিলাম।'

ও তেমনি ভাবেই বললো, 'আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিলাম, না ? বারণ করলাম না তোমাকে। তবু তুমি ওই পালকের ঝুপ্‌টিটা দিয়ে মারলে, তবে ছাড়লে। রাক্ষস কোথাকার।'

আবার আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু সামলানো দরকার।

প্রেমিকাটি বড্ড রেগে গেছে, সকালবেলাটা মূলে হা-ভাত হবে। অথচ রাক্ষস কথাটা শুনে এত হাসি পেতে লাগলো, তবে রাক্ষস বলে, ও যেন একটু শান্তি পেল, আর মুখের ভাবটা একটু জুড়িয়ে এল। যেরকম জ্বলছিল, যেন ভস্ম করে ফেলবে। আর সসাহ, প্রজাপতিটার কাণ্ড দেখ, ওটা এখনো পাখা ঝাপটাচ্ছে। তবে আগের মতন আর না, ছুঁড়ির হয়ে এসেছে, তবু কীরে বাবা, ও কি এক পাখাতেই উড়বে নাকি। তারপরে, ঠিক যা ভেবেছিলাম, শিখা তা-ই বললো, 'তোমাকে যদি কেউ এভাবে মারে, এরকম আধমরা করে ফেলে দেয়, তখন তোমার কেমন লাগবে।'

'আমি কি ওর মত পালাতে যাব নাকি যে, কেউ আমাকে ওরকম মারবে।'

'ও কি পালাচ্ছিল নাকি। ও তো উড়ে উড়ে খেলছিল, নিজের মনে ছিল, কী করে জানবে, তোমার মধ্যে পিশাচটা জেগে উঠছে।'

সে কথাটা ঠিক, প্রজাপতিটার জানবার কথা নয়, আমি তখন কী চাইছিলাম। ও ওর নিজের মনেই ছিল। দেখলাম শিখা আঁচল তুলে, চোখ দুটো মুছে ফেললো, আস্তে আস্তে চেপে চেপে মুছলো, যাতে সকালবেলার পেনসিলে টানা কাজলটুকু না উঠে যায়। আমি তবু বললাম, 'তুমি দেখেছিলে, ও কী রকম ছেউটি ছুঁড়ির মত করছিল।'

কথাটা শুনে, ভুরু কুঁচকে একবার যেন অবুঝের মত তাকালো, তারপরে বললো, 'তোমার তো সবই কোন না কোন ছুঁড়ির মত, ছোটলোক কোথাকার।'

তবু ঠাণ্ডা হ মা, যা বলিস তা বল, একটু ঠাণ্ডা হ, মনে মনে এ কথাই বলি। অবিশ্যি তা-ই হয় শিখা, আগের থেকে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। তবে সে-ই যেন কী দেখে একেবারে মোহিত হয়ে যাচ্ছে, সে ভাবটা তখনো যায়নি, নজরটা আবার প্রজাপতিটার দিকেই নেমে গিয়েছিল, আর নাকের পাশে, ঠোঁটের কোণে, কষ্টের কিছু দেখলে যেরকম হয়-না, সেইরকম দেখাচ্ছিল। আমি ওর কাঁধে একটা হাত রাখলাম, তখনি ঝাপটা মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু গিয়েও, কাঁধটা একটু কোঁচকালো মাত্র। আমি বললাম, 'প্রজাপতিটার জন্যে সত্যি এত কষ্ট লাগলো।'

শিখা জবাব না দিয়ে মুখ তুললো, চুলের একটা গোছা ওর গালের ওপর এসে পড়েছে, তার পাশ দিয়ে একটা চোখ প্রায় ঢাকা দেখাচ্ছে, ও আমার দিকেই তাকালো। খানিকক্ষণ তাকিয়েই রইলো। কিছু বললো না, যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করছে—বোঝবার আবার কী আছে কে জানে, আমি মোটের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না, ওসব আমার একটু ন্যাকামি ন্যাকামিও লাগে, তবু ওই যে সেই, 'কী যেন একটা আছে ওর মধ্যে', সে চিন্তাই খেলছে। ও মুখটা নামিয়ে, আবার দেখতে থাকে, থাকতে থাকতে বলে উঠলো, 'কী সুন্দর, ইস্! তোমার কষ্ট হচ্ছে না?'

আমার দিকে না তাকিয়েই ও বললো। কিন্তু কষ্ট : কই, আমি তো সত্যি কোন কষ্ট পাচ্ছি না, বরং একটা কী রকম বিদকুটে ভাবই লাগছে

আমার, নুলোর মত ডানাটা ঝাঁপাতে দেখে। কত কী-ই তো কত সময় এখানে সেখানে মরে পড়ে থাকতে দেখি, পোকা মাকড় ইঁদুর আরশোলা, এমন কী, অনেক মানুষকেও মরে পড়ে থাকতে দেখেছি, তার জন্যে কষ্ট তো কিছুই হয়নি কখনো। একটা উলটো ভাবই আসে, গা-টা কেমন করে ওঠে, খারাপ লাগে, সেটা কষ্ট লাগা না। শিখা আবার বললো, 'আর জান, ওরা সত্যি সত্যি বিয়ের ঠাকুর।'

আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল, 'আমার ইয়ের ঠাকুর', কিন্তু চেপে গেলাম। আচ্ছা, শিখা কি সত্যি সত্যি এ কথা বিশ্বাস করে নাকি, ওর মত রেপুটেড মেয়ে, শহরের নাম-করা—খেলোয়াড়ি যাকে বলে, সেই মেয়ে কি সত্যি এসব বিশ্বাস করে আমাকে শোনাচ্ছে। ভাল একটা বিয়ে-টিয়ের জন্যে বোধহয় মেয়েরা সবাই এটা বিশ্বাস করে, যেমন বেশ্যাদেরও দেখি, গঙ্গা থেকে নেয়ে ফেরবার সময়, শিবের মাথায় একটু জল না দিয়ে পারে না। কেন, তখনো কি তার শিবের মত বর পাবার আশা নাকি। স্সাহ্—এসব আমি জানি না। শিখা আবার বলে উঠলো, 'মানে প্রেমের দেবতা।'

তার মানে, বিয়ে প্রেম, এসব নিয়ে শিখার মাথাব্যথা, একটা ভাল বিয়ে, একটা ভাল প্রেম, এসব কিছু নেই বলেই প্রজাপতিটার জন্যে ওর এত মায়া। অথচ ওর কাছে ওসবের কী দাম আছে, তা এই নুলো পোকাটাই জানে। প্রেমের তো বাবা শেষ নেই, ওদিকে বিয়ে যে স্সাহ্, কতজনের সঙ্গে পাতিয়ে বসে আছে, কে জানে। তবে, ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার তখন আর ওসব মনে থাকে না। আমি ওর চিবুকে হাত দিয়ে, মুখটা তুলে ধরি, ও আমার দিকে তাকায়। তাকিয়ে চিবুকটা নামিয়ে নেবার চেষ্টা করতে, আমি বললাম, 'এক ছক্কা উঠা লুঁ?'

চিবুকটা নামিয়ে নিতে গিয়ে, ও আমার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো, ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে—এরকম করলেই, আমার ঠোঁট চুলবুলিয়ে ওঠে, কারণ এখন ওর ঠোঁট দুটো আলগা হয়ে, সাদা কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে, আর এই ভাব করে জিজ্ঞেস করলো, 'ছক্কা মানে?'

আমি বললাম, 'সে তুমি বুঝবে না, ওসব হচ্ছে আলাদা জগতের কথা। মুচু মুচু, মুচু জান না?' বলতে বলতেই শব্দ করে, ওর ঠোঁটের ওপর ঠোঁটটা ছুঁইয়ে দিই। ও অমনি ঠোঁট দুটো আরো ফুলিয়ে বলে উঠলো, 'অসভ্য!' অসম্ভব। তখন একেবারে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শুষে নিলাম, নিতে নিতেই টের পেলাম, ঠোঁট দুটোকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু—হুম্, যা ভেবেছি, স্বাদে আর গন্ধে দুটোতেই টের পাওয়া গেল, সকালবেলা ও নিশ্চয়ই পরোটা আর বেগুন ভাজা খেয়েছে। ওকে ছেড়ে দিয়ে, সে কথাই জিজ্ঞেস করলাম, 'সকালবেলা পরোটা আর বেগুন ভাজা খেয়েছ, না?'

শিখা প্রায় ফুঁসে উঠে বললো, 'বেশ করেছি, অসভ্য কোথাকার।'

কিন্তু প্রজাপতিটা তখন ওর হাত থেকে পড়ে গেছে। ঠোঁট মুছতে

মুছতে সেটাকে খুঁজতে গিয়ে, যেই এক পা সরেছে, অমনি প্রজাপতিটাকে পা দিয়ে চাপা দিয়ে ফেললো, বিয়ের ঠাকুর, প্রেমের দেবতাটির একেবারে স্বর্গলাভ, তাও শিখার পায়ের তলায় পড়ে, পেটটা একেবারে চেপটে গেছে। শিখা ডুকরে ওঠা বলতে যা বোঝায়, সেইরকম করে উঠলো। আমি বলে উঠলাম, 'যাহ্ স্‌সাহ্ !'

নিচু হয়ে সেটাকে ধরতে গিয়েও, শিখা হাত ফিরিয়ে নিয়ে এল, আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, আসলে চমকে গিয়ে একটা কষ্টের ভাব হলেও, চেপটানো প্রজাপতিটাকে ধরতে ওর কী রকম বিঘ্নি লেগে গেছে। তবে, চেপটে গেলেও রসটস কিছু বেরোয়নি। দেখলাম, শিখা ওটাকে দেখতে দেখতে, কী রকম আনমনা হয়ে গেল, একটা যেন ভয় ভয় ভাব ওর চোখে ফুটে উঠলো, ও যে কপালে হাত ঠেকালো, নমস্কারের মত, সেটা ও নিজেই যেন জানে না। আর একটা পাখনা যে কোথায় গিয়ে পড়েছে, দেখাই গেল না। আমি এগিয়ে গিয়ে, প্রজাপতিটার পাখনা ধরে টেনে তুললাম, আস্তে আস্তে তুললাম, যাতে মেঝেতে খানিকটা আটকে না থাকে। পুরোটা তুলে, জানালার পর্দা সরিয়ে, বাইরে ফেলে দিলাম, যাহ্ আপদ বিদায় হল। ফেলে দিয়ে, আমি ফিরতেই শিখা বলে উঠলো, 'তোমার জন্যেই তো !'

কথাটার মধ্যে তেমন একটা রাগ ঝাঁজ যেন বিশেষ ফুটলো না, খালি একটা নালিশ মনে হল, তাও নালিশটা যে পুরোপুরি আমার ওপরেই, তাও যেন ঠিক মনে হল না। ওর মুখের ভাবটাও সেইরকমই প্রায়, তার ওপরে আবার চোখ জলে উলসে উঠবে কি না, কে জানে। এক প্রজাপতি নিয়ে, সকালবেলাটা মার্ডার। ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'আচ্ছা বাপু আমার জন্যেই, যা পাপ হবে, তা আমারই, হয়েছে তো ? এখন একটু চা খাওয়াও তো।'

বলতেই, ফরকে চলে গেল অন্যদিকে, যেতে যেতে বললো, 'পারব না যাও।' বলে একেবারে ঘরের বাইরে। উঠোনে, সেই কূয়াতলার কাছে। বাড়িটা সেকালের তো, অনেকখানি জায়গা, ফেরেব্‌বাজ মজুমদার এর নাম, কী কায়দা করেই না বাড়িটা বাগিয়েছিল, বেশ খানিকটা জায়গা, কয়েকটা গাছপালা, সীমানাটা রাঙচিতের বেড়া দিয়ে ঘেরা, বড় বড় রাঙচিতে, মানুষ ছাড়িয়ে ওঠা, বাইরের থেকে ভিতরের কিছু দেখা যায় না, আর কূয়াটা উঠোনের এক কোণে। পর্দাটা সরিয়ে—পর্দা যে এ বাড়িতে কেন আছে, কে জানে। আমাদের বাড়িতে আছে, তার একটা মানে বুঝি, এসব বাড়িতে আবার এত কিসের। পর্দাটা সরিয়ে দেখি, শিখা নিজেই দড়ি ফেলে কূয়া থেকে জল তুলে, নিজের পায়ের ওপর ফেলে, পা দিয়ে ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেললো। তার মানে, ওর গা ঘিনঘিন করছে, সেটা বোঝা গেল। পা ধুয়ে আবার এ ঘরেই এসে ঢুকলো, এ ঘরটাই হল ওদের বসবার ঘর, বন্ধুদের র‍্যালা রপোটের ঘরও। আমি ওদের বাপটার কথা ভাবি, লোকটা যে কখন বাড়িতে আছে, কখন নেই, কোন কাকপক্ষীও

টের পায় না। আমি তো এ ঘরে কোনদিন দেখতেই পাইনি, আর যদি বা কোন সময় ঢুকতে বেরোতে দেখা হয়ে যায়, তাহলে যেন চেনা নেই, শোনা নেই, আমিই বা কে, সে-ই বা কে, এমনি একটা ভাব করে চলে যায়। যেন সে বাড়ির মালিক না, ছেলেমেয়েরা তা ছেলেমেয়ে না, কে যায়, কে আসে, কোন দিকে লক্ষ্য নেই, তুমিও যা, আমিও তা-ই। ওদের দাদা দুটোও ঠিক সেইরকম, স্‌লাদের শিরদাঁড়া আছে কি না, বুঝতে পারি না। একেবারে বাপের মত না, একটু-আধটু কথা বলে, তার ওপরে আমি তো আবার দুই দাদারই স্‌সত্তুর, কেননা, ওর দাদারা আমার দাদাদের দুই দলে। আমার দাদারা যখন আমার কেউ না, ওরাই বা কেন হবে। তা বলে, এক-আধটা কথা কোনরকমে বলা, যেন দেখতেই পাচ্ছে না, অথচ খুব যে একটা গোসা গোসা ভাব, তাও না, ওই ওদের বাপের মতই, নির্বিকার। যেন জানেই, আমি কার কাছে এসেছি, ওদের আমার কোন দরকার নেই ; কিন্তু আমার দাদাদের বেলাও তো তা-ই, দাদারা কি ওদের কাছে আসে নাকি। দাদারা বা অন্যান্য যেসব ছেলেরা আসে, সকলেরই তো একদিকেই নজর, জানি না অবিশ্যি শিখার ছোট বোনটার দিকেও কারুর কারুর নজর আছে কি না, সেটিও বেশ তৈরী হয়ে উঠেছে, এ বছর কলেজে যেতেও আরম্ভ করেছে, তা বেশ, 'এ বড় মজার কল চলছে চলুক, মিস্তিরি ভাই থেম না।' আমার দাদাদের সঙ্গেও যে শিখার দাদারা, এ বাড়িতে বেশী কথা বলে, তা না। দলের কথা তো অন্যখানে, এখানে ওসব বিশেষ হয় না, তবে একটা কথা তো চালু রাখা যাচ্ছে, 'আমরা শিখার দাদার কাছে এসেছি।' যেমন বেলাদির পুরুষ বন্ধুরা চালু রেখেছে 'আমরা তো বেলার বাবার কাছে—হেঁ হেঁ হেঁ, মজুমদার মস্‌সাইয়ের কাছে এস্‌সেছি।' অথচ খোঁজ নিয়ে দেখ, কোন সময় কোন মজুমদারেরই পাত্তা নেই। আমার বাবা ওসব নেই, আমি শিখার কাছে আসি, কারুর বাপ দাদাদের কাছে না। কিন্তু এসব ভাবলেই, আমার মেজাজটা কী রকম গোলমাল হয়ে যায়, ভিতরটা কী রকম জ্বলতে থাকে, রাগে আর ঘেন্নায় মাথার ভিতরটা দপদপ করতে থাকে, আর এ সময়েই, একটা ভীষণ আক্রোশে শিখাকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। আমি যেন এ সময়ে নিজের মনেই দেখতে পাই, সেই কৃষ্ণার মতই, শিখাকে ধরে বড়দা চুমো খাচ্ছে, না হয় সেই ঝিয়ের মেয়েটার মতই, মেজদা খামচে খামচে শিখাকে আদর করছে। আরো যারা আসে, তারাও ওইরকমই কিছু করছে, হয়তো অনেকটা আমার মতন। কোনদিন চোখে পড়লে, কাউকেই ছেড়ে কথা কইব না আমি। ছেলেবেলায় যেমন বাগানে ব্যাঙ পিটিয়ে মেরে ফেলতাম, সেভাবেই মেরে ফেলব, কিন্তু কোনদিনই কিছু চোখে পড়েনি, অথচ এরকম একটা চিন্তা আমাকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায় না, যে কারণে, অন্যদের ছেড়ে, আমার নিজেকেই পিটিয়ে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে, মনে হয় আমাকে কেউ একটা কাঁটা খোঁচানো ফাঁদে আটকে রেখে মজা দেখছে, আর আমি মাথা কুটে মরছি সেখান থেকে বেরুবার জন্যে। তবু শিখাকে আমি বলতে পারি না, রাগারাগি

খিস্তি-খেউর করি, সেটা না করে পারি না এক এক সময়—এই এখনই যেরকম মনের অবস্থা হয়ে উঠছে—ইচ্ছা হচ্ছে ওকে যা-তা বলে গালাগালি দিয়ে উঠি। কিন্তু একটা কোন হেস্তনেস্ত করতে পারি না, কারণ সেই যে সেই একটা ভূত চেপে আছে আমার ঘাড়ে, 'ওর মধ্যে কী যেন একটা আছে।' যেটা বেলাদিকে দেখলে কখনোই মনে হয় না। বেলাদি খারাপ জানি, তবু এক-একটা আছে না, জানছি খারাপ, বজ্জাত বা খাণ্ডার না, নষ্ট অথচ একটা কী রকম কষ্টই হয় তাকে দেখলে। শিখা তাও না। তাও না, এও না, অথচ আমি যেন ওর কাছে যেতে যেতে কোথায় আটকে পড়ে আছি, নিজেই আটকে পড়ে আছি, নাকি শিখাই আটকে রেখেছে তাও বুঝতে পারি না। এ একটা জঘন্য পাপের মত মনে হয়।

শিখা পা ধুয়ে এসে ঘরে ঢুকলো, তখনো কাপড়টা খানিকটা টেনে তোলা, যেখানে ওর বেশ নিটোল পায়ের গোছার ওপরেই অল্প অল্প লোম দেখা যাচ্ছে, আর গোছার ওখানটা অনেক ফর্সা, যেন কচিলতার রঙের মত, আর তাতে অল্প অল্প লোমগুলোকে দেখাচ্ছে যেন ঠিক হালকা ছাড়া ছাড়া দূর্বার মতন। পা-টা ও মুছলো না, মিহি মিহি ধোয়া ভেজা পা, নখগুলো মাপ করে কাটা, তাতে দু-একদিন আগের পালিশ লাগানো দাগ এখনো রয়েছে। আলতার কোন দাগ নেই আজ, তবে মাঝে মাঝে ও আলতাও পরে। ও এসে টেবিলের কাছে, একটা কাঠের পুরনো চেয়ারে অনেকখানি চেপে বসলো, যাতে ওর পা মেঝে না ছোঁয়, আর সেইভাবে পা দুটো আস্তে আস্তে দোলাতে লাগলো, তাতে ওর কোমর বুক সবই এমনভাবে দোলা খেতে লাগলো যে—নিকুচি করেছে, কোন মানে হয় না। কিন্তু সেই নালিশ জানানো ভাবেই টেরে টেরে আমাকে দেখতে লাগলো, তখন আমি আবার চায়ের কথা বলতে গেলাম, আর তখুনি ও আবার বলে উঠলো, 'প্রজাপতিটা সত্যি সুন্দর ছিল।'

এখন ও খানিকটা মন-মরা মন-মরা, মুষড়ে যাওয়া ভাবে যেন বললো। আমি বললাম, 'এক কাজ কর না।'

'কী।'

তোমার সেই কেশবদার দেওয়া, রুপোলি ফুটকি নীলাম্বরীটা নিয়ে এস না।'

'ওটা মোটেই কেশবদা দেয়নি, বাজে বকো না। কিন্তু ওটা দিয়ে কী হবে, শুনি ?

কেস্‌সবেন্দু দাদা যদি না দিয়ে থাকে, তাহলে তোমার পুন্‌নেন্দুদাদা দিয়েছে। নিয়ে এস না, ওটার থেকে খানিকটা কাপড় কেটে, একটা প্রজাপতি বানিয়ে দিচ্ছি, সেটাকেই টাঙিয়ে রেখ।'

এতক্ষণ পা দোলানি ছিল, আমার শেষের কথা শুনে ওর পা দোলানি বন্ধ হয়ে গেল। ভুরু কোঁচকালো, তারপরে ঘাড়টাকে বাঁকিয়ে বললো. 'ফাজিল, কাপড় কেটে প্রজাপতি বানাবে, না ?' বলেই, পা দুটো মাটিতে ঠেকিয়ে, ঝুঁকে বললো, 'আমার কেশবদা তোমারই বড়দা, আর আমার

পূর্ণেন্দুদা, তোমারই মেজদা, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন।'

'তবে আর কী, আমি একেবারে উদ্ধার হয়ে গেলাম। তবু বললে না, কে দিয়েছে শাড়িটা।'

'ছোটলোকের মত কথা বলো না।'

'র‍্যাশন ইনস্পেকটর অনিল তো চাল দিয়েই চালায়, কাপড়ও দেয় নাকি।'

শিখার প্রায় ফর্সা মুখ এবার লাল হয়ে উঠলো, চোখ দুটোও সেইরকম। নিচু গলায়, ফুঁসে উঠে বললো, 'ইতর।'

ও চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাছে গিয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরলাম। আমি হাসতেই চাইছিলাম যাতে ওকে জ্বালিয়ে খাক করে দিতে পারি, কিন্তু হাসিটা আসলে আমার দাঁতে দাঁত পেষার মতই ভিতরটা জ্বলছিল। কাঁধের ওপর খামচে ধরে এমনভাবে ওকে চেপে রাখলাম, যাতে হাজার ছটফট কবলেও নড়তে চড়তে না পারে। বললাম, যেন বেশ নরম গলায় বললাম, 'কেন রে স্‌সিখু, আমার কথা কি সব মিথ্যা?'

বাহ্‌, নরম নরম গলায় কথা বলেও, নিজেরই মনে হল, আমি যেন বাঘের মত গর্‌ গর্‌ করে উঠলাম। শিখা রুষে উঠে মুখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকালো। ওর চোখ দুটো ঠিক আগুনের মতই দপদপ করছে, অথচ যেন কিছু খুঁজে দেখলো আমার চোখে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। সেইরকম ফুঁসে উঠে বললো, 'তোমার মত একটা গুণ্ডাকে সে কথা আমি বলব না, নীচ কোথাকার।'

বলেই ও আমাকে আবার ঠেলে উঠতে চাইল, কিন্তু তা আমি দিচ্ছি না। এখন আমার মাথার মধ্যে যে রকম টগবগিয়ে ফুটছে, আর এরকম বাইরে কারুর সঙ্গে যদি লাগতো, তবে এতক্ষণে তার লাশ পড়ে যেত, নিদেন একটা রক্তারক্তি তো বটেই। এখানে সেরকম কিছু ঘটাতে চাইছি না, ওর লাশ ফেলে দেওয়া বা মাথাটা ফাটিয়ে দেওয়া—এই কি সেই অনশনের এক সন্ধ্যায় দেখা শিখা, কথাটা হঠাৎ একবার মনে হল, আর আমি ওর জামার মধ্যে একটা হাত ঢুকিয়ে দিলাম। ও আমার সেই হাতটা টেনে তুলতে চাইল কিন্তু এত শক্তি ওর নেই, তা ছাড়া এমনভাবে ধরেছি, বেশী টানাটানি করলে ওরই লাগবে—কাদা ডলে ঠেসে ছেড়ে দেব। কোথায় সুখ, স্‌সাহ্‌, কে জানে, সুখের আমি কিছু জানি না, বুঝি না, অনেকটা তো মনে হচ্ছে, বাবার টেবিলের তলায় নোংরা করে দেবার মতই যেন কিছু করছি—কেন করছি যেমন জানা ছিল না বা টেবিলের দরকারি কাগজ টেনে ছিঁড়ে দেওয়া, সেই রকম! অথচ আমি তো ওকে আদর করতেই চেয়েছিলাম। কী যে করছি, কিছুই যেন জানি না, বুঝতে পারছি না, কেবল একটা ভীষণ রাগ, ভীষণ আক্রোশ, অথচ একটা—কী বলব—অদ্ভুত যন্ত্রণা, যেন চোখে জল এসে পড়বে খুব জোরে কোথাও লাগলে, যেমন দাঁতে দাঁত চেপে রাখতে গিয়ে জল এসে পড়ে। আমি বললাম, তেমনি নরম গলাতেই, 'আমি গুণ্ডা, আর সবাই ভাল, কেশব

পূর্ণেন্দু অনিল...... ।'

কথা বলতে বলতে হাতকে আমি থামিয়ে রাখিনি, কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই, শিখা আবার একটা ঝটকা দিল, জোরে শব্দ করে কিছু বলতে গেল আর শব্দটা বেরুনো মাত্রই আমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দিলাম—দুটো ঠোঁট, কী তার স্বাদ কিছুই জানি না, যেন প্রাণপণ শক্তিতে কিছু একটা মুখে নিয়ে শুষতে লাগলাম, আর একটু পরেই রক্তের নোনা স্বাদ পেলাম, ঠোঁটের না মাড়ির কিছুই জানি না। শুষতে শুষতেই আমার চোখে পড়লো, শিখার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, চোখের কোণ দিয়ে, গাল বেয়ে, আমার ঠোঁটের কষে এসে লাগছে, কিন্তু ও চোখ বুজে আছে, মুখে কষ্ট আর যন্ত্রণার ছাপ, তবু একটা হাত আমার বুকের ওপর রেখে তখনো ঠেলছে, পা দিয়ে আমার হাঁটুর কাছে ঠেলছে—যেন এর শেষ নেই, শেষ হবে না, কিন্তু—কিন্তু আমারই মনে হল, আমি পারছি না, আমার বুকের কাছে কী রকম করছে, চোখের সামনে যেন কিসের একটা পর্দা নেমে আসছে, আমার হাত-পায়ের জোর কমে যাচ্ছে, ঠোঁট আলগা হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রায় গড়িয়ে পড়ে গেলাম ওর কোলের ওপর, টাইট প্যাণ্ট বলে, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে পড়তে গিয়ে, পিছনে অনেকখানি পা ছড়িয়ে গেল, সেই অবস্থায শিখা উঠে দাঁড়ালো। ও যে হাঁপাচ্ছে, আমি তা শুনতে পাচ্ছি, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, তাও টের পাচ্ছি। আমিও হাঁপাতে হাঁপাতে কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঠেলে উঠলাম, আর তৎক্ষণাৎ শিখা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, যাবার আগে মনে হল, এক হাতে মাথার চুল ঠিক করতে করতে আর এক হাতে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছে মুছে কী যেন দেখছিল—বোধহয় রক্ত।



শিখা বেরিয়ে গেল, চারদিকটা অসম্ভব চুপচাপ নিঝুম মনে হতে লাগলো, কেবল মাঝে-মাঝে হঠাৎ এক একটা পাখি ডেকে উঠছিল, যে ডাক শুনে, আমার যেন কেমন মনে হল, ওরা আমার বিষয়ে বলাবলি করছে—আবার সেই ভূতুড়ে ব্যাপার, যা শুনলে লোকের মার খাওয়া ছাড়া কোন রাস্তা নেই, কিন্তু এইরকম অবস্থাটাকে আমি জানি, এইরকম নিঝুম চুপচাপ, পাখির ডেকে ওঠা, কেননা, আমার অনশনের শেষে, অনেকগুলো দিন ঠিক যেন এভাবেই কেটে ছিল, সেই সব দিনগুলোর কথাই আমার মনে পড়ছে। আমার শরীরের শক্তি ফিরে আসতে কিছুদিন দেরী হয়েছিল, কিন্তু আমার ভিতরে কীরকম একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। যেদিন অনশন শেষ হয়েছিল—ক'দিনই বা, ছ'দিন তো মাত্র,

লোকেরা তার থেকে কত বেশী দিন করে, নাম-করা নাম-করা লোকেরা, তাদেরই আবার কত কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি শোনা যায়, অদ্ভুত কাণ্ড সব—কিন্তু সে তুলনায় ক'দিনই বা অনশন করেছিলাম! স্ট্রাইক সাকসেসফুল, খুব ঢোল পিটিয়ে আমাদের মাথায় করা হল, বাড়ি ফিরে এলাম। শিখার কথা আমার মনে ছিল, কিন্তু তার জন্যে যে মনের মধ্যে খুব একটা ছটফটানি আকুলিবিকুলি ভাব, তা মোটেই ছিল না, মনে হয়েছিল আমি কী রকম একটা অন্য লোক হয়ে গেছি। আমার মনে আছে, আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'শিখা, আমি সারাজীবন তোমার কথা চিন্তা করব, তোমাকে আমি পাই না পাই, সেটা বড় কথা না, তোমাকে আমি মনের মধ্যে রেখে দেব।' সত্যি মনের মধ্যে রাখা যায়, পরে সেটা একটা ন্যাকামি মনে হয়েছিল। তবে আমার এই রকমই মনে হয়েছিল, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতে ইচ্ছা করতো না, আর সে সময়েই আমার প্রথম মনে হয়েছিল, 'আমি কেন এই পৃথিবীতে।' অনশনের কথা তো কয়েকদিন বাদে একেবারে যেন ভুলেই গিয়েছিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা একটা কোন ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল না, তখনো গভর্নিং বডিকে মেরে ঠাণ্ডা করার কথাই আমার ঠিক মনে হচ্ছিল, কেননা, সেই লোকগুলোর জন্যে না খেয়ে এত কাণ্ড করার কোন অর্থই হয় না, তবু আমার ভিতরটা কেমন ভার হয়ে উঠেছিল। আছে না একরকম, আমার মনে হয় পৃথিবীতে সব মানুষেরই বোধহয় এরকম কখনো কখনো হয়, কী যেন তার হয়েছে, সে কিছুই জানে না, বুঝতে পারে না, নিজেকে নিয়ে সে কী করবে! সে কেনই বা পৃথিবীতে এল—কারণ, এই যে আমি এসেছি—পরে এ ব্যাপারটাকে প্রায় খচরামি বলে মনে হয়েছে আমার, কেন আমি এসেছি, কেন গরুর বাচ্চা হয়, কাকের বাচ্চা হয়, এসব কথার কোন ঠিক অর্থই হয় না, কিসে কী হলে মানুষ জন্মায় বা গরুর বাচ্চা হয়, একথা সবাই জানে, তা-ই সেও কেন পৃথিবীতে এল, সেও তা জানে, যার জবাব ধাইয়ের চেয়েও বাবা মা-ই ঠিক বলতে পারে। আমার ঠিক তা মনে হয়নি, আমার মনে হয়েছিল, আমার খিদে পেলে আমি খাই, আমার কিছু করতে ইচ্ছা হলে আমি করি—না, এটাও ঠিক না, আমার যা করতে ইচ্ছা হয় তা-ই আমি কী করে করব, আমি যদি মনে করি কারখানার ম্যানেজার চোপরার মাইনে মজুরদের মতই করে দেব, আর মজুরদের মাইনে চোপরার মত, তাহলে কেউ শুনবে না; একমাত্র ঠ্যাঙানি খাব, তাহলে আলাদা কথা। সেই রকম ইচ্ছার কথাই বলছি, আমি নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিনি।

এ কথাটাও এক ধরনের ইয়ারকির মত লাগছে, কিন্তু এ কথা আমার তখন মনে হয়েছিল। তখন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতো, বা এখনো করে, তাহলেও আমি এই কথাই বলব, আমার একদম আসবার ইচ্ছা ছিল না। এই যে আমি সুখেন-সুখেন্দু,—বাবা,\কি বিচ্ছিরি নাম, যেন শুনলেই গা ঘুলিয়ে ওঠে, আমি কিনা সুখেন্দু, আমি কী জন্যে পৃথিবীতে এসেছি, আমার কী-ই বা করবার আছে, আমি বুঝতে পারছি না নিজেকে

নিয়ে কী করব। বাবা হবার ইচ্ছা নেই, কেশব বা পূর্ণেন্দু হতে চাই না, আর ওই যে সব কী বলে, বড় বড় মানুষদের—ওই আর কি, জ্ঞানী গুণী মনীষী, তা হবার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম না, ওটা অনেকটা যেন 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'-এর মতন, পড়াই সার, কাজে না,—'হ্যাঁ রে সুখেন, তুই বড় হয়ে কী হবি ?' 'স্যার, বিদ্যাসাগরের মতন হব।' 'ভাল, খু-ব ভাল।' ছেলেবেলায় ইস্কুলে এরকম সব কথার খেলা হত—এখন মনে হলে যেমন মনে হয়, স্‌সাহ্‌, যেমন স্যার তেমনি ছাত্তর। আর সে সময়টা, অনশনের পরের সেই দিনগুলোতে, তখন আমি সুখেন গুণ্ডা হইনি, তখন যা ছিলাম, সেটাও আমার ইচ্ছা ছিল না, তার চেয়ে মজার কথা, এখন যা হয়েছি, তাও আমি ইচ্ছে করে হইনি, কী রকম বলতে বলতে হতে হতে হয়ে গেলাম। কলেজে দলাদলি করতে গিয়ে, সাতটা মাথা ফাটাবার পরেই সবাই বলতে আরম্ভ করেছিল, গুণ্ডা গুণ্ডা, যে কারণে শহরের মাস্তানরাও আমাকে খাতির-টাতির দেখাচ্ছিল, তারপরে একদিন দেখলাম, আমি গুণ্ডাই হয়েছি। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে হতে চাইনি, আমি যে কী হতে চেয়েছিলাম, তা জানতাম না, আর অনশনের পরে, সেই দিনগুলোতে, ক'দিন আর, মাস দুয়েকের মত হবে, আমার সেই সব কথা মনে হয়েছিল, 'কী হবে আমার, আমাকে নিয়ে কী করব', আর এরকম মনে হতেই, হঠাৎই মনে হয়েছিল, 'আমি কেন এই পৃথিবীতে! আমি ইচ্ছা করে আসিনি।'

কথাগুলো ভাবতে যে কেবল রাগই হচ্ছিল, তা না, রাগের থেকে বেশী, আমি যেন কেমন চোখে-কানে পথ না দেখতে পাওয়া দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম, একটা বিচ্ছিরি কষ্ট হয়েছিল, এমন কি এ কথাও মনে হচ্ছিল, কোন আত্মা-টাত্মা আমার পিছনে লেগেছে বোধহয়, না হলে, এমন অসম্ভব আজগুবি কথা আমার মাথায় আসছে কেন, আমি ইচ্ছা করে পৃথিবীতে আসিনি, অথচ স্‌সাহ্‌, বেঁচে থাকাটা আমারই দায়। আরে, একি ইতরামি! কা'র ইতরামি এসব! ন্যাকামি মনে হচ্ছে না একরকমের ? তখন আমার মনে হয়েছিল, গলায় দড়ি দিই, কিন্তু সেটা দিতে পারছিলাম না বলেই তো গোলমাল লাগছিল, কারণ আমি ইচ্ছা করে মরতেও পারছিলাম না।

যখন আমার এরকম সব কথাবার্তা মনে হচ্ছিল, মনে আছে, সেই সময়ে মেজদার একটা বড় চাকরির চেষ্টা চলছিল। বাবাই করছিল সব, বড় চাকরি মানে, মস্ত বড়, এখনই ও দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়, এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে একটা ফ্যাক্টরিতে—ডিপার্টমেন্টাল হেড এখন, মেলাই ক্যাশের ছড়াছড়ি। তখন ও চাকরিটা পেয়েও গিয়েছিল। পাবেই জানা কথা, অমন যার এলেমদার ফাদার, আহ্‌ কী শাহেন শা বাপ ছেলে, ঠিক রাত্রের অন্ধকারে বাদুড়ের মত পাকা ফলটি গিয়ে খুঁজে বের করেছিল, কেন না, আমি তো জানি, দিল্লি থেকে ভায়া কলকাতা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আনতে হয়েছিল অনেক ভাল ভাল ছেলেকে লেঙ্গি মেরে।

মেজদা—পূর্ণেন্দু, তখন ভীষণ ব্যস্ত, এ বেলা কলকাতা যায়, ওবেলাই সেই ছ' মাইল দূরের ফ্যাক্টরি কোয়ার্টারে যায়, ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি, আর বাবার সঙ্গে কেবলই কনফারেন্স, বাপ-ব্যাটায় কী চুপি চুপি কথা—অথচ ওই মেজদাকেই দেখেছি, তার মাস কয়েক আগেই, ওদের দলের হয়ে বাবার অফিসে হামলা করেছিল, বাবার বিরুদ্ধে অফিসের গরীব স্টাফের হয়ে লড়াই করেছিল—সেই মেজদাকেই দেখেছিলাম, কী ভাব দুজনে, গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর, চাকরি তো না, যেন একটা কন্সপিরেসি চলেছে। তা করুক গে, কিন্তু ও সে সময়েও, যখন আমি বাড়িতেই বেশীর ভাগ সময় থাকতাম আর ওইসব বিচ্ছিরি চিন্তাগুলো কুরে কুরে খাচ্ছিল, তখনো আমাকে টোপ ফেলতো, ওদের দলে যাবার জন্যে। বড়দাও একই চার ফেলে যাচ্ছিল, ও তো তখন উড়ছিল বলতে গেলে, মস্ত বড় নেতা, দারুণ খাতির, শহরের ইয়ং লীডার। আমার মনের কথা তো ওরা বুঝতেই পারছিল না সেখানে কী হচ্ছে, আমি বলতেও পারছিলাম না, কারণ ওসব কথা আবার বলা যায় নাকি, আর বললেই বা সবাই ভাববে কী, আরো পেছনে লাগতো। তা-ই কেশব আর পূর্ণেন্দু, দুজনে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া চালিয়েই যাচ্ছিল আর আমাকে, সময় পেলেই, দুজনে আলাদা আলাদা দলে টানবার চেষ্টা করছিল। কেবল শুলাদাকেই দেখেছিলাম, কেমন করে যেন চেয়ে থাকতো। এমনিতে তো শুলাদাকে খুব বোকা বোকা লাগে দেখতে, কিন্তু চোখ দুটো কেমন যেন, মনে হত সব সময়েই একটা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখনো কয়েক মাস বাকী ছিল ফাইনাল পরীক্ষার, যে-পরীক্ষায় দু'বার গাব্বা মেরেছিলাম, তখন সেটা থার্ড টাইমের হাঁকোর। বই-টই নিয়ে বসতাম, মাস্টারমশাইরা পড়াতে আসতো, 'ড্যু ইউ ফলো মী ?' 'হ্যাঁ স্যার।' 'ভেরি গুড !' সেই একই খেলা চলছিল, তবে আমি যেন তখন খানিকটা অভ্যাসমত জবাব দিতাম, 'হ্যাঁ স্যার।' জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ ছাড়া, কোনদিন না বলতে তো শিখিনি, তবে মাস্টারমশাইরাও বুঝেছিল, ছোঁড়ার একটা কিছু গোলমাল হয়েছে, যে জন্যে প্রায়ই জিজ্ঞেসা করতো, 'তোমার শরীর-টরীর খারাপ নাকি।' তখন আবার একটা খাতিরের ব্যাপারও ছিল তো, সদ্য হাঙার স্ট্রাইক করে জিতেছি। তার চেয়েও বড় কথা, ফাদারকে যেন কেমন একটু অন্যরকম লাগতো, মাঝে মাঝে আমাকে এসে জিজ্ঞেস করতো, 'শরীর খারাপ নাকি। সারাদিন বাড়ি বসে কেন, একটু ঘুরে-টুরে এলে তো হয়। পড়াশুনো হচ্ছে তো !' সেই বারো-তের বছরের ভয় পাওয়ার মতন না হলেও, প্রায় সেরকমভাবেই আমি জবাব দিতাম, 'কিছু হয়নি। সব ঠিক আছে। বাইরে যেতে ভাল লাগে না।' ফাদারের যেন কেমন একটা ভুরু খোঁচানো চাউনি হয়ে যেত, অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকতো, সব থেকে খারাপ লাগতো, যখন দেখতাম, 'কী, চুপচাপ বসে কী করছ' এই বলে আমার সামনে বসে থাকতো। পনর মিনিট, আধঘণ্টা কেটে যেত, তাতে দুজনেরই যে অস্বস্তি, দুজনেই যেন বুঝতে পারতাম, অথচ কেউ কাউকে কিছু বলতে পারতাম

না, আমার উঠে যেতে ইচ্ছা করলেও, উঠে যেতে পারতাম না। ফাদার যে কেন বসে থাকতো ছাই, বুঝতে পারতাম না, কোন কোন দিন হঠাৎ হঠাৎ বলতো, 'তোমার দাদাদের যা হোক জীবনের একটা গতি হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি-টাজনীতি বুঝি না, আমি বুঝি প্রতিষ্ঠা, লাইফে এস্টাব্লিসড হতে হবে। পিকু অবিশ্যি চাকরি করলো না, রাজনীতি করতে গিয়ে যদি কোনদিন মার খেয়ে না মরে, তবে যাই হোক, সে মন্দ কিছু করছে না। শুনেছি, কাছেই কোথায় নাকি একটা মস্ত দীঘিসহ বিঘে দশেক জমি ইতিমধ্যেই কিনেছে, খুব ভাল কথা। আরো শুনেছি, গোটা কয়েক সাইকেল-রিকশাও নাকি ইতিমধ্যে কিনে ফেলেছে, তা দল-টল করে যদি এসব করা যায়—কী করে করছে তা জানি না, শুনি নাকি ওর খুব ক্ষমতা, তা ভাল। তারপরে নিকুও মন্দ না, থার্ড ডিভিশনে পাশই করুক, রাজনীতিই করুক, অনেক স্কলার ওরকম ভাল চাকরি আজ পাবে না। আর আমার মনে হয়, তোমার মেজদা এত বোকা না, এই চাকরি থেকে দল তার কাছে বড় হয়ে উঠবে। কথায় বলে, "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।" আপনি না খেতে পেলে, শংকরাকে ডেকে লাভ নেই; আগে নিজেরটা,নিজের সুখসুবিধে ইত্যাদি, তারপরে আর সব, তা সে রাজনীতিই হোক আর যা-ই হোক, সবাই তা-ই করে, কিছু টাকা-পয়সা চাঁদা বা একটু মিটিঙ-টিটিঙ করা, তা করুকগে না, মুখে যাই বলা যাক কাজে তো আর করতে যাচ্ছে না। আগে চাই নিজের প্রতিষ্ঠা। নেহাত তারাই বেশী চেঁচামেচি করবে, যাদের কোন গতি হচ্ছে না, যাদের এ্যামবিশন ফুলফিল হচ্ছে না, এতদিনের চাকরি-জীবনে সেটা আমি বুঝেছি, বহুলোক নিয়ে আমি এতকাল কাজ করেছি, অনেক দেখেছি, নিকুও সেসব ভালই বোঝে। যাই হোক, তারও একটা গতি হয়ে গেল, এখন বাকী রইলে তুমি···।' স্সাহ্, ভ্যারর ভ্যারর ভ্যারর, কী মাইরি, ঠিক মনে হত, কোথাকার স্যার এলেন, লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। ওসব কথা আমাকে কেন, কেশব বা পূর্ণেন্দু সম্পর্কে ফাদার যেসব কথা বলতো, সেসব যদি ওদের সামনে বলতো, তাহলে ওরা ফায়ার হয়ে যেত। দুজনেই চেঁচিয়ে উঠতো, 'বাবা, আপনি ভুল বলছেন, আপনি আমাদের ব্যাপারটা বুঝবেন না।' তা-ই কখনো হয়, ওদের ব্যাপ্‌পার কখনো বোঝা যায়? বাবার চাকরিটা তো মস্ত বড় ছিল, মস্ত চাকরি মানেই, মস্ত কাজ, মস্ত মানুষ, বাকী যা সব ঘুষ, ত্যালানি, চুরি-চোট্টামি, সেসব ব্যাপ্‌পার কেউ কি বুঝতে পারতো? কেশব কোথায়—'আমরা দেশকে গড়তে চাই, বুঝলি নিকু, কিন্তু তোদের মত দুশমনদের ঠাণ্ডা না করে তা হবে না।'—এই বলতো আর নিকু অমনি তেড়ে উঠতো, 'আরে তোদের কাছে গড়া আর গ্যাঁড়া একই কথা, জানি। তোদের ওই কুরুবংশ শেষ করে, আমরা নতুন দেশ তৈরী করব, জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে বেশী দিন চলে না।'

পিকু বলতো, 'তুই বলছিস একথা, আর তোর মত ধোঁকাবাজদের জনসাধারণ বিশ্বাস করবে?' এ হাসতো, ও-ও হাসতো, হাসি তো

না—দাঁত কিরিমিরি করার শব্দ ওসব। তারপরে, এ ওকে ধোঁকাবাজ, এ একে ধোঁকাবাজ বলে গালাগাল, তর্কবিতর্ক, সব শেষে, যে যার তালে বেরিয়ে যেত। এখন ঘরে গিয়ে দেখ, দুজনেরই সাজানো-গোছানো কী আরামের ঘর। আলমারিতে খুঁজলে, দুজনের ঘরেই ভাল ভাল জিনিস পাবে, মানে বাবা যাকে এস্টাব্লিস্‌ড বলে—তা-ই, কিন্তু ওসব কথা ওদের কাছে হিঁদুর গো-মাংস, ওরা লড়ে চলেছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে এমন জঘন্য চালাকি মনে হত, ওরা তিন বাপ-ব্যাটাই সমান, আমাকেও ওরা ধোঁকা দিতে চায়। ফাদারের ওসব বক্‌বক্‌ করার কোন দরকার ছিল না আমার কাছে, তার ভালই জানা ছিল, 'এস্টাব্লিস্‌ড' ওই গালভারি কথাটার অর্থ কী, আর ওদেরও দরকার ছিল না, আমাকে নিয়ে দলে টানাটানি করবার। একজন গ্যাঁড়াবাজ আর একজন ধোঁকাবাজ, এটা তো শুলাদা পর্যন্ত বুঝতো। দুজনেরই গোছ-গোছানি সুখের জীবন, আবার দুজনেই শহরের দুই দলের নেতা হয়ে উঠেছিল—কী করে তা কোনদিন বুঝিনি, বুঝবও না—যেন ওদের জীবনের দুটো দিক—ব্যবসা চাকরি চুরি ঘুষ একদিকে, আর একদিকে দল, আর দলের সময় মনে হত, সেটাই যেন ওদের জীবনমরণ, এ ওকে খায়, ও একে খায়—তা খাকগে না, আমাকে কেন। আমার যা খুশি তা-ই হব, তাতে ওদের কী, খচ্চর।

যাই হোক, সে-সময়টা অনশনের পরের দিনগুলোতে যখন সেই সব উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা আমাকে কী রকম কবে ফেলেছিল, যে-যাই বলতো, কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারতাম না, এমন কি, বড়দা মেজদা ঠাট্টা করে এমন কথাও বলতো, 'কীরে টুকু, দেখিস্‌ সাধু-টাধু হয়ে যাবি নাকি?' তখনো চুপ করে থাকতাম, যেন আমি একটা হারিয়ে যাওয়া ছাগল বাচ্চা, আর ভাবতাম, 'কী হচ্ছে এটা, ওরা সব কেমন মজায় আছে, আর আমার মাথায় যত সব বাজে পোকা ঢুকে বসে আছে।' সত্যি কথা বলতে কি, মনে হয়েছিল, আমাকে যেন কারা সব, মরবার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল, অথচ মরতে পারছিলাম না, অথচ বেঁচে থাকা কী জন্য তাও বুঝতে পারছিলাম না। কারণ কোন কিছুতেই কোন ইচ্ছা হত না আমার—লোকে শুনলে বলতো, সব কিছু জেনে তক্ষকটি হয়ে বসে আছি—কিন্তু তাও তো সত্যি না। এরকম একটা অবস্থা। এইটাই কেবল আশ্চর্য, সেই সময়ে সেই যে একটা ভয়ের গুরগুরানি, সেটা আমাকে একদিনও পেয়ে বসেনি, একদিনও টের পাইনি।

এখন আমার সেইরকম মনে হচ্ছে। সেই সময়ের অবস্থাটা যেন চেপে ধরছে। এখন, শিখা চলে গেছে ঘর থেকে, আমি মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি, চারদিক যেন বড় নিঝুম। চুপচাপ, দু-একটা পাখীর হঠাৎ হঠাৎ ডাক, এ সময়ে সেই ভাবটাই চেপে ধরছে। আমাকে নিয়ে কী করব। কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা কথা এখন অবিশ্যি বুঝতে পারছি, যা করব না মনে করি, তা-ই করি। যা চাই না, তাই চাই, এ সময়ে স্‌সাহ্‌,

'তুই একটা ভূত' এ কথা আমার বলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমি তো সত্যি শিখাকে ওরকম করতে চাইনি, তবু করলাম, হয়তো ওকে একেবারে খুন করতেই ইচ্ছা করছিল, আর ব্যাপারটা তো আজই প্রথম না, এরকম আরো অনেকবারই হয়েছে, অথচ কোনবারেই ভেবেচিন্তে কিছু করিনি। যেন এই জন্যেই, এই না জানা, না বোঝা থেকে এই অবস্থাটা আমার দেখা দেয়, এখন আমি কী করব—মানে, নিজেকে নিয়ে আমি কী করব!

অথচ আবার, সেই অনশনের পরে যখন মনের সেই অবস্থা যাচ্ছিল, তা প্রায় মাস দেড়েক কেটে গিয়েছিল তখন, হঠাৎ একদিন শিখা আমাদের বাড়িতে এসেছিল—ঠিক যেন অনেকদিন, মেঘলা মেঘলা অন্ধকার, স্যাঁতা, ভিজে, তারপরে হঠাৎ রোদ ওঠে, তেমনি করেই এসেছিল। সেই প্রথম ও আমাদের বাড়িতে এসেছিল, আর 'সুখেনদা, আপনার জন্যই এলাম। কেশবদা, পূর্ণেন্দুদা, ওঁদের মুখে প্রায়ই শুনি, আপনি নাকি বাড়ি থেকে বিশেস বেরোন-টেরোন না, খালি চুপচাপ থাকেন আর পরীক্ষার পড়া পড়ে যাচ্ছেন ; তা-ই এলাম।'

বড়দা, মেজদা ওদের বাড়িতে যায় সে-ই যে প্রথম জেনেছিলাম, তা না, আগেই শুনেছিলাম ওর দাদাদের কাছে, দাদারা যায়। প্রথমটা তো আমি কী রকম লাজুক—আহা হা, দেখিস, কিন্তু সত্যি লাজুক লাজুক হয়ে উঠেছিলাম শিখার সামনে, কী কথা বলব, বুঝতে পারছিলাম না, তবে হলফ করে বলতে পারি, নিজের মুখ দেখতে পাইনি বটে, একেবারে যেন ঝলমলিয়ে উঠেছিলাম, সন্দেহ নেই। ভিতরটা যে ঝলমলিয়ে উঠেছিল, সেটা তো বুঝতে পেরেছিলাম, তাতেই মনে হয়েছিল সে কথা, কারণ বললামই তো, অনেক দিনের মেঘলার পরে হঠাৎ রোদ উঠলে যেরকম মনে হয়, ঠিক সেরকম মনে হয়েছিল ওকে দেখে। ও এসে ঘরে বসেছিল, কী যে সব কথা বলেছিল, এখন একটু মনে করতেও পারি না। হয়তো 'খুব পড়ছেন' বা 'শরীর ভাল আছে তো', তার জবাবে আমি হয়তো কিছু বলেছিলাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে অনশনের সেই সন্ধ্যারাত্রের কথা ভেসে উঠেছিল, আহ্, সত্যি, কেন যে ওকে এত ভাল লেগেছিল, সেই দিনও লাগছিল, সেই প্রথম দিন যখন এসেছিল, আর আমি যেন সেই দিশেহারা কষ্টের থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম। জানি না, কেন আমার মনে হয়েছিল, শিখা যেন অনশনের সেই সন্ধ্যারাত্রে, আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল, মনে হয়েছিল অনশনের পর থেকে ও যেন রোজই আশা করতো, আমি ওদের বাড়ি যাব, কেননা ও বলেছিল, 'আমি রোজই ভাবি, সবাই একবার করে আমাদের বাড়িতে ঘুরে গেল, সুখেনদা তো এল না। কী জানি বাবা, কোন দোষ-টোষ করে ফেললাম না তো।' তার মানে, যারা অনশন করেছিল, তারা সবাই ওদের বাড়িতে একবার করে—দশ বারও হতে পারে, ঘুরে এসেছিল। আমি ওকে কী সব যেন বলেছিলাম, 'না—মানে ভাল লাগে না' এইরকম সব কথাই হবে হয়তো। ওর মধ্যে একটা যেন কী ছিল, যতবার আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিল, ততবারই

আমার ভিতরটা কী রকম করে উঠছিল। সেইসব কথা আমার মনে হয়েছিল, ওর বুকের মধ্যে আমার মুখটা ডুবিয়ে দিই। মনে হতেই আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, ওর বুকের দিকে। একটা বাসন্তী রঙের জামা, মোস্ট অর্ডিনারি, তাতে আবার জামার হাতায় ফুল আঁকা, আর একটা লাল লাল ভাবের—ঠিক লাল, না, টকটকে লাল না, লাল ভাবের শাড়ি পরে এসেছিল। আমি ওর ডানা দুটোর দিকে, নতুন চিকচিকে লতার মতন রঙের ডানা, গলা কাঁধের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর বুকের দিকে তাকিয়ে, মনটা কী রকম করে উঠেছিল—যা তার আগে কোনদিন মনে হয়নি। তার আগে তো অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশেছি, হাত মুখ দিয়েছি, কিন্তু ওর সামনে সেগুলো মনে করতে গিয়ে কেমন যেন একটা বিঘ্নি বিঘ্নি ভাবই লেগেছিল, এমন কি বিচ্ছিরি গন্ধের কথা পর্যন্ত মনে পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো যেন সত্যি মাংসপিণ্ডই।

আমি জানি না, শিখাকে জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও কোনদিন বলেনি, আমার মনের কথা ও কখনো বুঝেছিল কিনা—তাই আবার কখনো বলে নাকি, গর্দভ—মেয়েরা কি ওসব কখনো কিছু বোঝে নাকি—মাইয়াছেলে না! তবু, কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, শিখা যেন আমার মনের কথা বুঝে ফেলেছিল, এমন কি এত যে চোখ দুটোকে সামলাতে গিয়েও তাকিয়ে ফেলছিলাম, সেটাও হয়তো ধরা পড়ে গিয়েছিল। ও এসেছিল বিকালের দিকে, ফেরবার সময় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, নিজেই বলেছিল, 'যাবেন নাকি আমাদের বাড়ি অবধি।'

গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখেছিলাম, ওদের বাড়িতে ভিড়, অনেকেই সেখানে ছিল, কলেজের কয়েকজন ছেলে, বিশেষ করে মেজদাদের দল। মেজদা, আর শিখার দাদা মেজদার চেলা। আমি বসিনি, সবাই আমাকে বসতে বলেছিল, এমন কি মেজদাও—আর থাকলে হয়তো শিখাকে আরো খানিকক্ষণ দেখতে পেতাম, কিন্তু আমার মনের অবস্থা সেরকম ছিল না যে, সকলের মাঝখানে বসে বসে গ্যাঁজাবো, আর শিখাকে দেখব। চলে আসবার সময় শিখা আমার সঙ্গে ঘরের বাইরে এসেছিল, আর একটু থাকবার জন্যে বলেছিল, আমি বলেছিলাম, 'সময় পেলে তুমি আবার এসো।'

ওদের বাড়ি থেকে রাস্তা দিয়ে ফেরবার সময় আমি কোনদিকেই তাকাইনি। কারুর সঙ্গে কথাও বলিনি। মফস্বল শহরের রাস্তার আলো কেমন, সকলেই জানে। গাধাও না, ঘোড়াও না, যেগুলোকে খচ্চর শহর বললেই ভাল হয়, আলোগুলোও তেমনি, যে জন্যে মনে হয়েছিল, আমি যেন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছিলাম। আমার আশেপাশে সবই ছায়া, কেউই মানুষ না, আর, আবার সেইরকম ভাবনা ফিরে এসেছিল মনের মধ্যে, সেই দিশেহারা কষ্টের ভাবটা। অথচ আশ্চর্য এই, আমি যে খুব সাংঘাতিকভাবে শিখার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম, তাও বলতে পারি না। কারণ বোধহয় মনের সেই অবস্থায়, শিখার একটা ঝলকানি

লেগেছিল বটে, আবার আমি সেই ভাবনার মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শিখা আবার এসেছিল, তিন দিন পরে, কলেজ থেকে ফেরার পথে। শুলাদাটা আবার কী এক আশ্চর্য জীব। সে হঠাৎ শিখাকে ভীষণ খাতির করতে আরম্ভ করেছিল, বলতে গেলে আরো যেসব মেয়েরা আসতো, তাদের কোনদিন ঠিক ওভাবে খাতির দেখায়নি। তিন দিন পরে যেদিন এসেছিল, সেদিন আমি আর ওদের বাড়ি যাইনি। সেদিন শিখা বেশীক্ষণ ছিল না। ঠিক তার দু' দিন পরেই শিখা আবার এসেছিল, একেবারে ভর দুপুরে, ঘরে আমি একলা বসেছিলাম, পিছন ফিরে—সামনে বই খোলা, কিন্তু পড়ছিলাম না। হঠাৎ চেয়ারের পিছনে একটা চাপ লাগতে, পিছন ফিরে দেখেছিলাম, শিখা আমার মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে টেবিলের ওপর দেখবার চেষ্টা করছে, আমি কী পড়ছি।

আমি এমন চমকে উঠেছিলাম যে, আমার বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠেছিল, ঠিক মনে হয়েছিল একটা প্রেতাত্মা-টাত্মা কিছু এসেছে বুঝি, আর শিখা বলেছিল, 'খুব চমকে গেছেন, না?'

কিছু না বলে তখনো তাকিয়েছিলাম, তারপর হেসে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।'

'শুলাদা বললে কিনা, আপনি একলা ঘবে রয়েছেন। তাই পা টিপে টিপে এসে দেখছিলাম, কী করছেন। খুব পড়ছেন, না?'

কথার জবাব দেব কি, তখন আমার গায়ের মধ্যে কী রকম করছিল, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি না। কেবল, এটা বুঝতে পারছিলাম, শিখার গায়ের কাপড়টা আমার মাথায় ঠেকছিল আর আমার ভিতরটা কী রকম করছিল, অনেকটা ভয়ের মত, তা-ই আমি মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম, ওর দিকে তাকিয়ে থাকিনি। পাশে আর একটা চেয়ার ছিল, শিখা ঘুরে সেদিকে গিয়েছিল, কিন্তু বসেনি। আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আরো অনেকটা কাছে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'রাগ করলেন সুখেনদা?'

রাগ? আমি ওর দিকে ফিরে, তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, 'না তো।'

'তবে?'

তবে? তবে মানে কী? আমি ওর মুখের দিকে চোখ তুলতে গিয়ে, ওর বুকটা দেখেছিলাম, চেয়ারের হাতলের কাছে ওর তলপেটটা ছিল, সেখানে শাড়ির কুঁচির কয়েকটা ভাঁজ। তার একটু ওপরেই ওর সেই কচি কচি রঙের পেটের একটুখানি—ঠিক এখনকার মত, কোমর থেকে পেটের এতটা দেখা যাবার মতন জামা আগে পরতো না, তারপরে বুক, তারপরে কণ্ঠা আর গলার মাঝখানে ছোট্ট একটা গর্ত, গলা, চিবুক, মুখ, ওর চোখদুটো আমার মুখের ওপরে চেয়েছিল একটু অবাক অবাক ভাবে। কিছু খুঁজে দেখার মত, জিজ্ঞেস করার মতন! কিসের একটা হালকা গন্ধও লাগছিল, ওর গায়ের বা চুলের বা জামাকাপড়ের, যারই হোক, আমি যেন ডুবে যেতে চাইছিলাম শিখার বুকের মধ্যে, সেই অনশনের সন্ধ্যারাত্রের মত। শিখা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছে সুখেনদা!'

আমি ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলাম, কিছু না। আর আমি যেন একটা

লগবগানো মগডালের মতন, ওর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছিলাম, ওর কোমরের পিছনে হাত রেখেছিলাম। আর মাইরি, আশ্চর্য, আমার যেন কী রকম নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। অথচ ভাল লাগছিল—আবার একটা কী রকম কষ্ট, স্‌সাহ্‌, চিরদিন এরকম একটা ভুতুড়ে ব্যাপার আমার মধ্যে ঘটেই চলেছে। আর কারুর কাছে তো এরকম আজগুবি কিছু শুনিনি। আর মাথায় তো চুল ছিল, তবু কী করে এরকম হয় কে জানে, আমি ওর বুকের তলার নরম দিকটা টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু মুখটা বুকের দিকে ছিল না, পাশ ফেরানো ছিল, থাকলেও সেদিকে যে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, তাও না, একবার এ কথাও মনে হয়নি, যেটা মনে হওয়াই সব থেকে আগে উচিত ছিল, শিখা রাগ করবে কিনা। শিখা যে কী করছিল, কেমন ওর মুখটা দেখতে হয়েছিল, কিছুই জানি না। আর তা একবারও আমার মনে আসেনি। আমি যেন ওর সেই মুখটাই দেখতে পাচ্ছিলাম, যে-মুখটা অনশনের সেই রাত্রে চোখ বুজেও বার বার ভেসে উঠেছিল। তারপরে, কতক্ষণ পরে আমি জানি না, ওর একটা হাত আমার কাঁধের উপর রেখেছিল। তখন আমি সেই অবস্থাতেই মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর আমার ঠিক মনে হয়েছিল, সেই যে, সেই যে, সেই যে, সেই তাঁবাটে চাঁদের আলোয় ওর মুখটা যেমন দেখেছিলাম। কেমন যেন একটা, চোখ সেই কান পর্যন্ত টানা। অথচ চোখের ভিতরে সাদাটা নেই, সবটাই কালো চিকচিকে, মুখের রঙটা যেন কেমন, আর চারদিকে অন্ধকার। আর ও আমাকে ছুঁয়ে আছে। সেইসব ভাবনা আর শরীরের ভাবগুলো জেগে ওঠায় আমি সত্যি সত্যি ওর বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমি পাশ ফিরে দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, কোমরের ওপরে পিঠের কাছে—আর ওকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কষ্ট করে নিচু হতে হয়েছিল, যাতে আমি যেমন করে চাই ও তাই দিতে পারে। আমার কাঁধে রাখা ওর হাতটা আমার ঘাড়ে রেখেছিল। রোঁয়াগুলোসুদ্ধ শিউরে উঠেছিল। মনে করতে পারি না, তখন ওকে একবার নাম ধরে ডেকেছিলাম কিনা। আর একটা হাত ও চেয়ারের হাতলে রেখেছিল। সেখান থেকে তুলে, আমার পাঁজরের কাছে রেখেছিল—যেন সেই দিনই নতুন না, যেন কতই সহজ-স্বাভাবিক, কোনরকম লাফানি-ঝাঁপানি নেই। বরং সেই কী বলে একটা মায়া-মায়া, মমতা-মমতা ভাব, অথচ তার আগে যতগুলো ছুঁড়িকে গায়ে হাত দিতে গেছি, সে সবের ভাবভঙ্গিই আলাদা। যেমন চাউনি, স্‌সাহ্‌ তেমনি হাসি, তেমনি ছটফটানি—হাত দিতেও দেবে, আবার ছাড়িয়েও দেবে। 'ও কি, না, ছি সুখেনদা' এমনি বলবে হাসবে, সেই অনেকটা ছেউটি ছুঁড়িদের কথা বলছিলাম না!

অনেকটা সেইরকমেরই, তার চেয়েও যেন একটা বদ গন্ধ বেরুনো ব্যাপারের মতন, 'হি হি হি, ভাগ' আবার একটু ; আবার, 'বেশ মজা, না? পালাব কিন্তু, হি, হি হি', আর না হয়তো, পাশাপাশি কাছাকাছি লাগালাগি

ছোঁয়াছুয়ি সবই হচ্ছে, তবু যেন কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটছে, চালিয়ে যাও গায়ে গায়ে। সে সবের মধ্যে যেমন, কেমন একটা নোঙড়া ইতরামির গন্ধ থাকে, সেরকম কিছুই মনে হয়নি। কী বলব, ঠিক বলতে গেলে, শিখা যেন একটা রোগা ছেলেকেই, সেই অনশনে না-খাওয়া আমাকেই বুকের কাছে থাকতে দিয়েছিল, গায়ে হাত রেখেছিল। কারুর সঙ্গে ওকে মেলাতে পারিনি, কারুর সঙ্গে ওর মিল ছিল না, এমন কি, ওঁর যে ওভাবে ঝুঁকে পড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, তার জন্যে একটা কথাও বলেনি, তখন আমি, হাতটাও ওর বুকের কাছে নিয়ে এসেছিলাম, যেন আমার সবটাকে নিয়ে, আমার পুরো শরীরটাকে নিয়ে ওর বুকের মধ্যে মিশিয়ে যেতে চাইছিলাম, ডুবে যেতে চাইছিলাম। আমি মুখ তুলে ওর দিকে চেয়েছিলাম, আর ঠিক যা ভেবেছিলাম, তাই, যেরকম মুখ ভেবেছিলাম, ঠিক সেরকম মুখই দেখেছিলাম। ঠিক সেইরকম চোখ, যে-চোখ দিয়ে ও আমার দিকেই তাকিয়েছিল, অথচ একটা কথাও জিজ্ঞেস করেনি, আজও জানি না, কেন জিজ্ঞেস করেনি, কেন কোনরকম আপত্তি করেনি, যেন ও জানতো, এরকম হবে বা সেটা এমন একটা কিছু ব্যাপার না, যে কী জানি, হয়তো ওর ওইরকম ইচ্ছা করেছিল। আমি ওকে টেনেছিলাম, আমার দিকে নিচু করে টানতে গিয়ে, ও প্রায় পড়েই গিয়েছিল, হয়তো লেগেও ছিল, কিন্তু তার জন্যে ওর মুখে কোন কষ্টের ছাপ পড়েনি. যেমন করে আমার দিকে তাকিয়েছিল, তেমনি তাকিয়েই ছিল, যেন আমি যা করব, তাতে ও কোনরকম আটকাবে না, মেরে ফেললেও না। আমার শরীরের ওপর ওর অনেকখানি ভার পড়েছিল, ওর নিঃশ্বাস পড়ছিল আমার মুখে। জানি না কেন, নিশ্বাসটা যেন মিষ্টি ফলের গন্ধের মতন মনে হয়েছিল, ওর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল, আর আমার কাঁধ আর গলার কাছে, ওর বুক চেপেছিল, আমি ওকে চুমো খেয়েছিলাম। তখন চুমো খাওয়াটা আমার কাছে একটা সহজ ব্যাপার, কেননা, তার আগে অনেকবারই খেয়েছি, তবু মনে হয়েছিল, সেরকম চুমো জীবনে কখনো খাইনি। এত সুন্দর একরকম থাকে না, একেবারে নিখুঁত করে আঁকার মত ঠোঁট—না না, রঙ মাখা না, শিখা রঙ মেখে আসেনি, অথচ লাল লাল আর নিখুঁত—মানে যেন অনেকটা ধারালো মতন, আর পাতলা মতন, আর পাতলা সরু মোটেও না, একটু ফোলা ফোলা, অদ্ভুত-সুন্দর। আমি ওর সেই ঠোঁটে আমার ঠোঁট চেপে দিয়েছিলাম, তারপরে মোটেই জোরে-টোরে না, চুমো খেয়েছিলাম—কিন্তু ও হাত দিয়ে মোছেনি, তখন কেবল একবার উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল, আর ঘরের খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়েছিল। আমিও খোলা দরজার দিকে তাকিয়েছিলাম, জানি না, তার আগেই শুলাদা দেখে গেছে কি না, আমি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করেছিলাম। ও ঠিক সেখানেই, সেভাবেই দাঁড়িয়েছিল, ভেবেছিলাম, তখন কিছু বলবে, কিন্তু কিছুই বলেনি, কেবল আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি আবার ওকে দু' হাত দিয়ে বুকের কাছে

চেপে ধরেছিলাম, তখন লক্ষ্য করেছিলাম, ও আমার থেকে প্রায় ছ ইঞ্চি বেঁটে, কম না, প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু। শুধু ধরেই রেখেছিলাম, বুকের কাছে, খুব জোরে চেপে ধরে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ। কতক্ষণ, এখন মনে নেই, তারপর এক সময়ে আমি ডেকেছিলাম ওর নাম ধরে, আর ও বলেছিল, 'দিলাম তো আপনার পড়া মাটি করে।'

তারপরে যে কেউ ওরকম কথা বলতে পারে, কোনদিন ভাবিনি, যেন ব্যাপারটা তেমন কিছুই না, অথচ ও মোটে ছটফটও করেনি, ভাবটা অনেকটা, 'বেশ তো, এসব না হয় হল, পড়াটা তো মাটি হল' এইরকম। আমি আবার বলেছিলাম, 'আমি পড়ছিলাম না।' ও বলেছিল, 'আপনার পরীক্ষার তো আর বেশী দেরী নেই।' 'পড়তে ভাল লাগে না।' ও হেসেছিল। এখন আমার এভাবে বলতে ইচ্ছা করে, 'দেন ইট স্টার্টেড।'

ওর সঙ্গে আমার, সেই শুরু, দেন ইট স্টার্টেড, যেমন আমাদের শহরের বাসের সহিসেরা ড্রাইভারকে চেঁচিয়ে বলে, 'ইস্টাট', সেইরকম, আর আমি যেন কেমন একটা শান্ত আর গম্ভীরভাবের হয়ে উঠেছিলাম, ভাল ছেলেরা ভালবাসায় পড়লে যেরকম তাদের অবস্থা হয়, সেইরকম—মানে, আমার প্রেম হয়েছে, আমার জীবনের চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যাবে এবার। সেইদিন ও অনেকক্ষণ ছিল, শুলাদা ওকে চা আর খাবার খাইয়েছিল, আমি ওর সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম, কেশব বসে আছে, আরো দু' তিনজনকে নিয়ে, শিখার এক দাদাও ছিল, যে দাদা ওর দলের, বেলাদিও ছিল। আমাকে দেখবার আগেই, কেশব, আমার বড়দা বলে উঠেছিল, 'কোথায় গেছলে শিখা, আমরা তো তোমার খোঁজে থানায় লোক পাঠাব ভেবেছিলাম।' শিখা বলেছিল, 'আপনাদের বাড়িতেই সুখেনদার সঙ্গে গল্প করছিলাম।' ততক্ষণে আমি ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগেনি। মনের ভিতরে যে একটা বেশ—কী বলব, তরতরানো আমেজ ছিল, অনেকটা জলভরা গেলাসের মতন, সেই ভাবটা কেমন একটা ছানা কেটে যাওয়া ভাব হয়েছিল। তবু আমি একটুখানি বসেছিলাম, কী দু'-একটা কথাবার্তা বলেছিলাম, বড়দা ওদের দলের ছাত্রদের নিয়ে কী একটা কনফারেন্সের কথা বলাবলি করছিল, আমাকেও ওদের দলে চলে আসতে বলেছিল, আর একমাত্র শিখাই বলেছিল, 'উহ্, আপনাদের দল ছাড়া কথা নেই কেশবদা।' আমি উঠে এসেছিলাম, শিখা আমাকে সেইদিনই প্রথম তুমি বলে ডেকেছিল, আরো খানিকক্ষণ থাকতে বলেছিল, থাকিনি।

সেই থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেই থেকেই গোলমাল, সেই ভুতুড়ে ব্যাপার, যতই শিখার সঙ্গে আমার দুধের জ্বালে জমছিল, ততই সেই ছানা কেটে যাওয়াও বাড়ছিল। যে ব্যাপারটা একটু আগেই হয়ে গেল, একটা রাগ, ঘেন্না, যেন আমাকে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করেছিল, অথচ শিখাকে ছেড়েও যেতে পারছিলাম না। তারপরেই তো আস্তে আস্তে আমার খেল শুরু হয়েছিল, পড়াশুনো চুলোয়, পরীক্ষার হলে হাই বেঞ্চের ওপর একটা

ছুরি গেঁথে রেখে, বই খুলে আমি লিখতে বসেছিলাম। তার আগের দিনের পরীক্ষাতে টুকতে গিয়ে একটা ছেলের খাতা কেড়ে নিয়েছিল বলে, ছেলেটা কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল রেল লাইনে, একেবারে চলন্ত গাড়ির তলায় মাথা পেতে দিয়েছিল। এই স্‌লাদের যে কী বলতে ইচ্ছা করে-না, ওকে আবার ধরেছিল যশোদাবাবু—ধরবেই তো, ও তো অন্য দলের ছেলে ছিল, আমি টুকছি জেনেও, আমার কাছে এগোননি। কিন্তু ছেলেটা মরতে গিয়েছিল কী করতে, বুঝি না, যশোদাবাবুকে ধরে পেঁদিয়ে দিলেই তো হত, সে সাহস ছিল না, মাথাখানিকে ছেত্‌রে দিয়ে, তিন-চার টুকরো লাস হয়ে উল্লুকটা চলে গিয়েছিল মুদ্দাফরাসদের কাঁধে চেপে। আমি তো জানতাম, আমার দ্বারা পাশ করা হবে না, আর ঠিক করেছিলাম, ওটাই শেষ বছর, আর পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে পারব না, তাই ছোরা নিয়ে গিয়েছিলাম, দলের স্যার না থাকল, বে-দলের স্যারকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হবে তো। আর স্‌সাহ্‌, সেদিন ইনভিজিলেন্টে এসেছিল সেই স্যারটি, যার চাকরি বহালের জন্যে হাঙার স্ট্রাইক করেছিলাম। সে স্যার তো আমার মেজদার দলের, আর সেই কয়েক মাসের মধ্যেই, আমাদের জোড় খাওয়া, সেই যাকে বলে ঐক্য, ভেঙে গিয়েছিল, আবার মারামারি কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই অনস্‌সনই কর, আর যা-ই কর, স্যারটি কোন কথাই শুনতে রাজী ছিল না। তা ছাড়া মাল সেদিকে বেশ দড়, চাকরিতে বহাল হয়েই, আগে টেক্কা মেরেছিল প্রিন্সিপালকে, তারপরে একেবারে গভর্নিং বড়ির পেয়ারের লোক হয়ে উঠেছিল। আমাকে এসেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'ছুরিটা এভাবে এখানে গাঁথা কেন।' বলেছিলাম, 'পেন্সিল-টেন্সিল কাটতে হবে কিনা, তাই।' স্‌সাহ্‌, একেবারে বাঘের মতন তাকিয়েছিল আমার দিকে—আমিও তার চেয়ে কিছু কম না, জানতাম ও আমাকে রেয়াত করবে না, তবু আমি বই খুলেই বসেছিলাম, ও আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল, কিন্তু কাছে ঘেঁষেনি, বলেছিল আমার খাতা বাতিল করে দেবে। তবু আমি শুনিনি, চালিয়েই যাচ্ছিলাম, শেষ পর্যন্ত ভাইসকে ডেকে আনা হয়েছিল, আমার খাতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, মেজদাদের দলের ছেলেরা খুশি হয়েছিল, আমি বাইরে এসে প্রথমে ঠিক করেছিলাম, ছুরিটা একেবারে শুকনো নিয়ে ফিরব না। কিন্তু বন্ধুরা সবাই বারণ করেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, সেই আমার শেষ পরীক্ষা, বাবার মুখটা মনে পড়ছিল, আর ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল, একটা কিছু না করতে পারলে শান্তি পাচ্ছিলাম না। আর ঠিক তখুনি সেই স্যারটি ক্লাস থেকে একবার বেরিয়ে আসছিল, আমি ডেকে বলেছিলাম, 'এই, এই যে দ্যাখ, এই দ্যাখ বলে প্যান্টের বোতাম খুলে দেখিয়েছিলাম। মাইরি, লোকটা ভাবতেই পারেনি, ওরকম একটা কাণ্ড কেউ করতে পারে, প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল, আর পাগলের মত ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, 'আই উইল সী ইউ রাসকেল।' আমি বলেছিলাম, 'আরে যা যা, পেঁদিয়ে খাল খিচে দেব।' স্যারটি দৌড়ুতে

দৌড়ুতে প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে গিয়েছিল, আমিও বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাওয়া।

রাস্তায় গিয়ে খুব হাসাহাসি করেছিলাম বটে, কিন্তু এটাও ঠিক, ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তিও যেন হয়েছিল, যেমন হয়-না, একটা খচখচানি মতন, অথচ লোকটার মুখ মনে করে হাসিও ঠিকই পাচ্ছিল, তবু কেমন যেন একটা খচখচ করছিল। আমি সেখান থেকে সোজা শিখাদের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম, সব কথা শুনে ও খুব ভয় পেয়েছিল, আমিও ওকে নিয়ে সেদিন তেমন মেতে উঠতে পারিনি। সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ঢুকতেই ফাদার তো একেবারে গর্জন করে উঠেছিল, হাতের কাছে কী একটা ছিল—প্লাস্টিকের কলমদানি না কী যেন, সেটাই ছুঁড়ে মেরে বলেছিল, 'বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে।'

একটু বোধহয় লেগেছিল, কপালে, মাথা নিচু করে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম, ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বাবা সেখানে এসেও বন্ধ দরজার ওপর জোরে ধাক্কা মেরেছিল, আর বারে বারে চেঁচাচ্ছিল, 'বেরিয়ে যা বলছি, বেরিয়ে যা, কুলাঙ্গার ছোটলোক ইতর।' আমি কিন্তু ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিলাম, যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না, অথচ হাতটাতগুলো কীরকম শক্ত হয়ে উঠেছিল, দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল—হ্যাঁ রাগই, কিন্তু কার ওপরে তা যেন বুঝতে পারছিলাম না। দাদারা বাড়ি ছিল না, বাবা তেমনি চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'আমি দরজা ভেঙে ফেলব বলছি, টেলিফোন করে পুলিশ ডাকব এখনি, হারামজাদা, গুণ্ডা, লম্পট, তুই কি মানুষের বাচ্চা, তুই—' এ সময়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, বাবা মাকে নিয়ে শুয়ে আছে। বাবা চেঁচিয়েই যাচ্ছিল, 'তুই একটা কুকুর। এ বাড়ির ছেলেদের নামে যা কেউ কোনদিন বলতে পারেনি, তোর জন্যে তাও শুনতে হচ্ছে। বেরিয়ে যা, যা বলছি, বেরো।'

আস্তে আস্তে মুঠো করা হাতটা আমি খুলেছিলাম, দরজার কাছে গিয়ে, খিল খুলে দিয়েছিলাম। খুলে দিতেই বাবা কিল চড় মারতে আরম্ভ করেছিল, আর আমি বারান্দা পেরিয়ে উঠোনের দিকে নেমে যাচ্ছিলাম, শুলাদা ঠাকুর ঝি—ঝিয়ের মেয়েটা তার কয়েকদিন আগেই ডাক্তারের কাছ থেকে পেট খসিয়ে এসেছিল, টাকা পয়সা মেজদাই দিয়েছিল, ঝিটার মেজাজ তাই ভাল ছিল, ভয় কেটে গিয়েছিল—আহা, মেজদার শাশুড়ি গো—ওরা সবাই দাঁড়িয়ে দেখছিল, কারুর সামনে আসবার সাহস ছিল না। আমি ছুটিনি, দৌড়ুইনি, যেমন হেঁটে যেতে হয়, তেমনি বারান্দা দিয়ে উঠোনে নেমে গিয়েছিলাম, বাবা সমানে মারতে মারতে চলেছিল, অথচ আমার যেন লাগছিল না, যেন আমার ভিতরে এমন একটা গোলমাল চলছিল, মারধোরগুলো মোটেই কিছু মনে হচ্ছিল না। আমি যখন বাগানের কাছে, তখন বাবার একবার হোঁচট লেগেছিল, সেখানে যুঁইয়ের ঝাড় ছিল, আর দরজা অবধি আসতে আসতে, বাবা যেন হাঁপিয়ে

পড়েছিল। দরজার বাইরে আর বাবা আসেনি, মনে হয়েছিল, বাবা তখন ওই সেই যাকে বলে বায়ু ত্যাগ করেছিল একবার, আর সেখান থেকেই বলেছিল, 'আর যেন এ বাড়িতে তোর মুখ দেখতে না হয়।' বাবা বলছিল, আমি শুনছিলাম, কিন্তু কী যে ঠিক ঘটছিল কিছুই বুঝতে পারিনি, হেঁটেই চলেছিলাম, আর কিছু দূর যাবার পর দেখেছিলাম, আবার শিখাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছি। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করেনি, কারণ আমি জানতাম, তখন ওদের বাড়িতে আড্ডা চলেছে, তাই আবার ফিরেছিলাম, যেখানে আমার দলের বন্ধুরা আড্ডা দেয়, চা খায়—দল মানে, রাজনীতির না, এমনি, যারা আমার ভক্ত। সেরকম একটা জায়গায় গিয়ে শুটকার দেখা পেয়েছিলাম,—শুটকা, আশ্চর্য, ব্যাটার একটা সুন্দর নামও আছে—মৃণ্ময় গুপ্ত, উহ্ রে স্‌সাহ্, মইরা যামু। শুটকাই আমাকে প্রথম বলেছিল, আমার মুখে লাল লাল দাগ, সত্যি, এত জোর ছিল ফাদারের হাতে। সেইদিন প্রথম আমি মদ খেয়েছিলাম, এ ব্যাপারে শুটকাই আমার গুরু, ওই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল একটা জায়গায়—যে জায়গাটার নাম তার আগেও আমি শুনেছি, হলধরের জুয়ার আড্ডায়, আর এও শুনেছিলাম, হলধর আসলে কেশবের মাইনে করা লোক, মানে আমার বড়দার। তবে কেশব সেখানে যায়-টায় না, আড্ডাটাকে সবদিক থেকে রক্ষা করা—এই আর কি, পুলিশ-টুলিশের হাত থেকে, ও শুধু মাসে মাসে নিজের হিসাবের টাকাটা নিয়েই খালাস, বাকী যা কিছু সবই হলধরের। শুটকা একটা ঘরে আমাকে সেখানেই নিয়ে গিয়েছিল, তবে কোন জুয়ার ঘরে না, অন্য একটা ঘরে, আর বলেছিল, 'গুরু, একটু মাল খা। পেটে একটু মাল পড়লে দেখবি সব ঠিক আছে।'

আমার একবারও মনে হয়নি, দারুণ কিছু একটা পাপ করছি, আর খেয়ে বেশ ভালই লেগেছিল। কোথায় কীভাবে যে রাতটা কেটে গিয়েছিল, ভাল করে মনে করতেই পারিনি। শুটকাটা একটা ম্যানেজার লোক, সেখান থেকে রিক্সায় করে কোথায় যে নিয়ে গিয়েছিল, পাশের আর একটা শহরে, আমাদের শহরের বাইরে—যেখানে একটা বাড়িতে রাত কেটেছিল—না, বেশ্যাবাড়ি না, বাড়িটা আসলে রামকৃষ্ণ বলে একটা লোকের, যার কাজ হচ্ছে, রেলের ওয়াগন ভেঙে চুরি করা। ওদের একটা দলও আছে, আর এখন এও জানি, রামকৃষ্ণের সঙ্গে—হ্যাঁ, একে বলে নাম, রামকৃষ্ণ ওয়াগন ব্রেকার, যার সঙ্গে কেশবের ভাল লেনদেনই আছে। কেশব ওসব চোরাই মাল রামকৃষ্ণের কাছ থেকে কেনে, বেচে অন্য জায়গায়, অন্যভাবে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে, শত হলেও একটা দলের নেতা তো, একটা ইজ্জত আছে, তার পক্ষে খোলাখুলি কিছুই করা চলে না। কিন্তু শুটকার ওপর আমার একটু রাগ হয়েছিল, ও খালি আমার বাবার নামটা সব জায়গায় বলছিল, আমি অমুকের ছেলে, না হয়তো অমুকের ভাই। তাতে খাতির করেছিল সবাই, তবে আমার ভাল লাগেনি, রাগ হচ্ছিল, বলেছিলাম, পরিচয় পাড়বার কী আছে।'

সেই প্রথম রামকেষ্টর সঙ্গে আমার ভাব, প্রায় চারদিন ছিলাম ওর ওখানেই, অবিশ্যি কোনদিন ওয়াগন ভাঙতে যাইনি, এদিক ওদিক নানান জায়গায় ঘুরেছি। তার মধ্যে শুটকা রোজই এসে জানাতো, আমাকে খুব খোঁজাখুঁজি চলেছে, কেশব পূর্ণেন্দু তো খুঁজছিলই, শুলাদাও শহরের সব জায়গায় সব বাড়িতে বাড়িতে খোঁজ করেছিল, কারণ ফাদার নিজেই নাকি সবাইকে খোঁজ করতে বলেছিল, এমন কি শিখাও খোঁজাখুঁজি করেছে, শুটকাকে জিজ্ঞেস করেছে, সে জানে কিনা, কোথায় আছি, শুটকা বলেনি, তবে শুটকাই আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিল বারে বারে, আমি শুনিনি। তারপরে একদিন শুটকার সঙ্গে শুলাদা একেবারে রামকেষ্টর বাড়ি এসে হাজির হয়েছিল, আর এই এক ধরনের লোক আছে পৃথিবীতে, শুলাদাদের মতন, কিছুতেই এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আমারও একটা কেমন ছিল, ওকে আমি এড়িয়ে যেতে পারতাম না। ও যেন অন্যরকম কিছু, ওই কালো কুচকুচে রঙ, গলায় কণ্ঠী, গরুর মতন ড্যাবা ড্যাবা চোখ, আর ওগো হ্যাঁগো করে কথা বলা—ওকে আমার মানুষ বলে গণ্য করতে ইচ্ছা করে না, অথচ ওর সঙ্গে ঠিক যেন পেরেও উঠি না। আমার মনে হয় শুলাদা আমার মাকে মনে মনে ভালবাসতো—মানে পুরুষেরা যেরকম মেয়েদের ভালবাসে, সেইরকমই, তবে তার মধ্যে একটা অন্যরকম ভাব ভক্তি ছেদ্দাটেদ্দা মেশানো, তার ওপরে চাকর-বাকর হলে যা হয়, চিরদিন মাথা নিচু করেই ছিল, মাকে ঠাকরুণ বলে ডাকতো, আর মায়ের কথার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকতো, মা ওকে শূল বলে ডাকতো।

শুলাদাই আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নাকি একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, তখন তো রিটায়ার করে গেছে, সারাদিনই বাড়িতে, সবাইকেই খালি এক কথা নাকি জিজ্ঞেস করছিল, 'টুকুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল ?' আমি মাথা নিচু করেই গিয়েছিলাম, কারুর সঙ্গে কোন কথা হয়নি। ফাদার যেন জানতেই পারেনি আমি বাড়ি ফিরে গিয়েছি, দেখা-সাক্ষাতও ছিল না। কিন্তু আহ্, এখনকার ফাদার আর সে ফাদার নেই, লোকটা যে বাড়িতে আছে তা পর্যন্ত জানা যায় না। লোকটার একটা কী গোলমাল হয়ে গেছে, সারাদিন চুপচাপ, রাত্রেও ঘুমায় না, ঘর অন্ধকার করে বসে থাকে। দাদাদের কারুর সঙ্গেই কথা বলে না, অথচ আশ্চর্য এই, আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দু-একটা কথা হয়—তবে দিনের বেলা না, রাত্রে, যখন আমি মাল খেয়ে ফিরি। সত্যি ভাবা যায় না, আমি মাল খেয়ে ফিরলেও বাবা একদম চুপচাপ, আর তাতেই তো গোলমাল হয়ে গিয়েছিল একদিন!

আমি নিজেই কি জানতাম নাকি, দুম করে ফাদারের ঘরে ঢুকে যাব ওই অবস্থায়। কিন্তু ওই কী একটা পোকা একদিন মাথায় ঢুকেছিল, ওরকম চুপচাপ থাকা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আর পেটে রস পড়লে, মাথার মধ্যে এমন গোলমাল হয়ে যায়, কী করতে কী করে বসব,

কিছুই জানি না। একদিন রাত প্রায় এগারোটায়, ফাদারের অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, সুইচে হাত দিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। দিতেই দেখেছিলাম বাবা একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে, আর আলো দেখেই এমন চমকে উঠেছিল, যেন আচমকা কেউ মেরেছে, এমনিভাবে নিচু গলায় প্রায় ডুকরে উঠেছিল, 'কে ? আহ্‌, নেভাও, বাতি নেভাও তাড়াতাড়ি।'

এমনভাবে বলেছিল, না জানি কী ঘটেছে, যে জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আলো অফ করে দিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ পর্যন্ত একদম চুপচাপ, যেন আলোটা জ্বলে উঠে কী সব গোলমাল করে দিয়েছিল, সেটা ঠাণ্ডা হতে একটু সময় লেগেছিল। আমি তো ভেবেছিলাম, ফাদার উঠবে, একটি লাথি মারবে, কিক যাকে বলে। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি—কী বিচ্ছিরি অন্ধকার, মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে এক ফোঁটা আলো নেই, সব অন্ধকারে ডুবে গেছে আর সেই অন্ধকারে. বাবার গলা শোনা গিয়েছিল, 'কী চাই।'

আমি বলেছিলাম, 'কী করছেন অন্ধকারে বসে বসে।'

'সে খোঁজে তোমার দরকার নেই।'

কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার বাতিটা জ্বালতে ইচ্ছা করছিল, মানে অনেকটা বলতে গেলে, ফাদারের পেছনে লাগবার জন্যেই দেখতে ইচ্ছা করছিল, ফাদার কী রকম করে ওঠে আর কেমন করে ওঠে, সেটাও জানতে ইচ্ছা করেছিল। আমি বলেছিলাম, 'আমি আলোটা আবার জ্বালবো।'

'না, বারণ করছি আলো জ্বালবে না।' মোটেই ধমকের সুরে বলেনি বরং অনেকটা মিনতি বলতে যেরকম বোঝায় সেইভাবেই মোটা গলায় বলছিল আর যেন অনেক দূর থেকে বলছিল। আর সেই প্রথম যে কথা, আমি কাউকে বলিনি, সেই কথাই আমার মনে এসেছিল, কারণ সেখানে একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেই, আমার মনে হয়েছিল, ঠিক বুঝছি না, কিছুই ভাল লাগছে না, কেন আমি আছি, কেনই বা জন্মেছিলাম। তাই বলেছিলাম, 'আপনার ওপর আমার সব থেকে বেশী রাগ।'

'রাগ ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'কেন আমাকে এনেছিলেন।'

'এনেছিলাম ?'

'হ্যাঁ, কেন জন্ম দিয়েছিলেন।'

'ফাজলামি করো না, যাও।'

'ফাজলামি না, আমি জানতে চাই কেন এনেছিলেন। আপনি কি জানতেন, আমি আসব, আমি, এই আমি ?'

'তা কেউই জানতে পারে না।'

আমি প্রায় জেদ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, যেন অনেকদিনের একটা চেপে রাখা রাগ হঠাৎ একেবারে খেঁকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, 'জানতে

পরেন না তো এনেছিলেন কেন। আপনি তো এনে খালাস, এখন আমি কী করব।'

'তুমি—।'

ফাদার চুপ করেছিল খানিকক্ষণ, কোন কথাই বলেনি, যেন এমন একটা ধাঁধা দিয়েছিলাম তা সলভ্ করার উপায় ছিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, একটু পরে ফাদার বলেছিল, 'আমি কেন জন্মেছি, তাও আমি জানতাম না।'

'সে কথা আপনার বাবা জানতো।'

'না, বাবাও জানতো না। সে কথা কেউ বলতে পারে না।'

'বলতে পারবে না, অথচ আনতে পারবে, আর তারপরে?'

'তারপরে—তারপরে—যার যার নিজের ব্যাপার।'

'সে মরুক বাঁচুক কষ্ট পাক বা যা খুশি তাই হোক—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ফাদার বলেছিল, 'হ্যাঁ। তুমি এখন যাও।'

'না, আমি আলোটা জ্বালব, আপনাকে দেখব।'

'না না, বারণ করছি—'

ঠিক সে সময়েই শুলাদা এসে আমার হাত ধরেছিল, 'ছোটখোকা, চলে এস' বলে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে, প্রায়ই আমি বাবার অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ি। খুট করে আলো জ্বালিয়ে দিই, বাবা চমকে চোখে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আহ্, নেভাও নেভাও।' আমি খানিকটা মজা পাই, আমার অবাক লাগে, লোকটা কী করে ওরকম বসে বসে—অথচ মালও খায় না যে, ভোম হয়ে বসে থাকে, যেন বসে বসে কী ভাবে। কিছুই বুঝি না আমি, তার ওপরে রাগ ঝাল কিছুই নেই, এমন কি আমার তো অবাকই লাগে, আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও বলে না। বাইরে যা-ই করি, খাই তো বাড়িতেই, তার জন্যে কোন টাকা পয়সা দিতে হয় না, থাকিও বাড়িতেই। ইচ্ছা করলে ফাদার তো আমাকে যে কোনদিন তাড়িয়ে দিতে পারে, টাকা পয়সা চাইতে পারে, কিন্তু কিছুই বলে না। এইসব ব্যাপারগুলো সব মিলিয়ে ফাদারের ওপর আমার কেমন একটা মায়া-মায়া ভাব আসে। টাকা পয়সা কারুর কাছেই চায় না, কেশব পূর্ণেন্দুর কাছেও না, তবে ওদের সঙ্গে এখন কথা একেবারেই বন্ধ, আমার সঙ্গেই যা দু-একটা কথা হয়, নেহাত পেছনে লাগি বলে। পেছনে লাগি বটে, তবু কী রকম একটা মনের মধ্যে হয়, ওই মায়া মমতা ধরনের। কী জানি সেটা কী, ফাদারকেও বুঝি না, নিজেকেও না।



যাই হোক, সেই কলেজ-ছাড়া, তারপরে পুরোপুরি গুণ্ডা, শহরের এখন আমি নাম-করা সেরা মাস্তান, কিন্তু এই বড়দা, মেজদা ক্রমেই আমার সঙ্গে গোলমাল পাকিয়ে তুলছে, ওরা আমাকে রেগুলার শাসাচ্ছে, যে কারণে,

কারখানার ম্যানেজার চোপরা পর্যন্ত বলেছে, আমি যেন কেশবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলি। কাঁচকলা, ওসব ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই, আমি ওর সব কীর্তি জানি, ও রাজনীতির খচড়ামি ছেড়ে আসুক না, তা হলে আর ওর সঙ্গে আমার কতটুকু তফাত। যেমন শুটকা আজকাল প্রায়ই বলে, পূর্ণেন্দুদের দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে। কেননা, ওরা নাকি আমাকে একদিন হাপিস করে দেবে। দিলেই হল, কেন, ও কোথাকার পীর, গরীবদের নেতা সেজে বসে আছে। ওদের দলে গরীব কোথায়, ওরা যেসব গরবীদের কথা বলে, তারা তো ওদের চারপাশে নেই, নিজেরা গিলছে, কুটছে, দলাদলি করছে, আর বড় বড় বাত মারছে, ওই বাত মেরেই লোকের মন ভুলিয়ে রেখেছে, গরীবদের রাজা করে ছাড়ছে। ওদের দলের সব ক'টা ছেলেকে আর লোককেই আমি চিনি, জানি ওদের দলে গুণ্ডামি করবার ছেলেরও অভাব নেই, আমার সঙ্গে যে কোনদিনই লড়ে যেতে পারে, কিন্তু আমিও তো ওদের চিনি। মারামারি করবার লোক ওদের দুই দলেই আছে, কিন্তু আমি কেন যাব। আজ পর্যন্ত তো ওদের দলেব কোন মাস্তান আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি, বরং মার খেয়েই গেছে, তাতে আক্রোশ বেড়েছে, আর গালাগালি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমার দলের ছোঁড়াগুলো কেমন যেন একটু বেগড়বাই করছে, কোন-না-কোন দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে চাইছে। যাক, চলে যাক, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

বড়দাটা তবু এক রকম, ওর চরিত্র লোকে জানে, কোন গুণেই ঘাঁট নেই, দল করে, টাকা মারে, চোরাই ব্যবসা করে, সবরকম আছে। মেজদা কেন গরীবদের নেতা, ওর জোচ্চোরিও তো অনেকখানি। চাকরি করতে গেলে, সাহেব আলাদা মানুষ—এই সেদিনও খবর পেয়েছি, কোম্পানি আটাশ বিঘা জমি কিনেছে, জমির যারা মালিক ছিল, সেইসব গবীবদের টাকা ওর হাত দিয়েই পেমেন্ট হয়েছে, বিরাশি হাজার টাকা থেকে আট হাজার টাকা কম নিতে হয়েছে সবাইকে। ও নিজে কিছুই করেনি, ওর কেরাণীবাবুই, মানে শিখার এক দাদা, সব ব্যবস্থা করেছে, আর গরীবরা টাকাটা তাড়াতাড়ি পাবার জন্যে আট হাজার টাকা ছেড়েই ভাগাভাগি করে নিয়েছে, খবর আমার সব জানা। আর এখানে দেখ, ধুতি পাঞ্জাবি পরে, রাজনীতি করছে, তাও আবার গরীবদের দল। ঘরের আলমারিতে গিয়ে দেখ, স্কচ হুইস্কির বোতল লুকানো রয়েছে। এখন আবার বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নাকি, পুরো রাজনীতিই করবে, ইলেকশনে দাঁড়াবে, উহ্‌রে স্‌সাহ্‌, আরো মারাত্মক।

তা যা খুশি তাই করুক গে, আমার দেখবার দরকার নেই, তবে ওই গরীব কথাটা ওদের মুখে শুনলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। গরীব তো শিখার দাদার মত লোকেরা, যারা আসলে বুলি আর তেল দেওয়া, নচ্ছারিপনা ভাল জানে, জানি গরীবের থেকে ওরা সেটাই বেশী পারে, আর এদের দিয়েই বড়দা মেজদা'র দল চলছে, আর আসলি

আদমিরা সব জাহান্নামে চলে গেছে। তা হলে বাবাও তো একরকেমর নেতাই ছিল, একজন—কী বলে এদের খবরের কাগজে—আমলা, হ্যাঁ আমলা, মস্ত বড় সরকারী আমলারা যেমন ঘুঘুদের দিয়ে কাজ চালায় সেইরকম। একবার জেঁকে বসতে পারলেই হল একটা উঁচু জায়গায়, তখন তাকে সরাও দেখি, সে তখন নেতা, বাবার মতন একটা বড় আমলা। সবাই তখন তাদের মানে, ভয় পায়, কারণ তখন তারা বেশ জমিয়ে বসেছে, যেমন কেশব আর পূর্ণেন্দু। তা যা খুশি তাই করুক গে, আমি দেখতে চাই না, তবে আমার পিছনে লাগতে এলে, আমি ছাড়ব না। তোমরা সব ভাল, আর আমি খারাপ্, স্সাহ্ খচ্চর। তাই দেখেছি, দু'দলই এখন আমার পিছনে লাগছে, যেন ওরা হল, কী বলে, সুপ্রীম—সুপ্রীম, ওদের কবজায় থাকতে হবে, যা-ই করি না কেন।

এ সবের জন্যে আমি ভাবি না, এ সবে আমার কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু শিখা—এই শিখাকে নিয়ে এই অসহ্য একটা কষ্ট, একটা জঘন্য ঘেন্না আর রাগ, অথচ ছেড়ে যেতে পারি না, কেন তাও জানি না, এই একটা ভূতুড়ে ব্যাপার আমাকে যেন ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়। আমি জানি না, কেশবের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক, পূর্ণেন্দুর সঙ্গে কী সম্পর্ক, অনিলের সঙ্গে কী সম্পর্ক, ওরা মৌমাছির মত এখানে এসে জমেই বা থাকে কেন। অবিশ্যি, আরো অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, সেটা তো আমি জানি, আমার তো খালি শিখাই না, তবু আমি শিখাকে ছাড়া তো আর ভাবতেই পারি না—মানে শিখাকে পেলে, আর কাউকেই চাই না—জানি না, এটা আমার মিথ্যা কথা কিনা, কেননা, মঞ্জরী বলে যে মেয়েটার সঙ্গে মিশি, ওকে দেখলেই তো মনে হয় দিনরাত চটকাই, তবু শিখার ব্যাপারটা একদম আলাদা মনে হয়। আর আমার অন্য মেয়েদের ব্যাপারের মত যদি শিখার অন্য ছেলেদের ব্যাপার হয়—অসম্ভব, তার চেয়ে মেরে ফেলাই ভাল। একটু আগে, আমি জানি না, ওকে কী করতে যাচ্ছিলাম, হয়তো মেরে ফেলতেই চাইছিলাম, অথচ পারি না, আর এসব কিছু ঘটলেই, আমার সেই কথাটা মনে হয়, দিশেহারা হয়ে যাই, আর মনে হতে থাকে, 'কেন, আহ্, জঘন্য ব্যাপার, কেন আমি এসেছিলাম এই পৃথিবীতে।' এখন আমার সেই কথাটাই মনে হচ্ছে, কুকুর বেড়ালরা যেমন জানে না, তারা কেন এসেছে, আমিও তেমনি জানি না—না না, বাবা মায়ের জন্যেই আসা সেটা বুঝি, কিন্তু আমিই কেন—আমি এই সুখেন্দু-টুকু-আমিই কেন, যে জন্যে বাবার কথাও মনে পড়ে যায়, 'সে কথা কেউ বলতে পারে না,' অথচ এই যে এসব যন্ত্রণা, আমাকেই ভোগ করতে হচ্ছে।

শিখা এখন আর আসবে না, আর এই, চারদিকে নিঝুম চুপচাপ ঘরটাতে, এসব কথা আর ভাবতে পারি না। মনে হচ্ছে, কোথায় দু-একটা পাখী ওরকম চিকপিক করে ডেকে উঠছে, গিয়ে গলা টিপে দিয়ে আসি, কেননা, ঠাট্টার মতন লাগছে। আসলে আবার শিখাকে পাবার ইচ্ছাই

মনের মধ্যে জাগছে, কারণ নিজের এই কষ্টটা তা নইলে যেতে চায় না, এই যে দিশেহারা একটা ভাব—তার চেয়ে যাই, কোথাও গিয়ে কষে খানিকটা মাল টানি। সেই চেয়ারটার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি, একটু নড়তে পর্যন্ত ভুলে গেছি। বেলা যে বেড়েছে, বোঝা যাচ্ছে, ঘরের আলোটা বেড়েছে, তবে ঘরটার আশেপাশে এত গাছ আছে, যেন তাদের ছায়াও দেওয়ালের কোথাও কোথাও পড়েছে। যেখানে প্রজাপতিটা মার খেয়ে পড়েছিল, সেইদিকে একবার তাকিয়ে, আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম। তখনই, দরজায় শিখাকে আবার দেখা গেল, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, ওর হাতে এক কাপ চা। ও আমার দিকে তাকালো না, সোজা এল, টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রাখলো, কিন্তু চলে গেল না, টেবিলের কাছেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ওকে দেখে এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, অন্ততঃ জামা-কাপড়ে যে, ওকে একটু আগেই কীরকম চেয়ারে ফেলে চটকানো হয়েছে। তেমনি চুল খোলা, শিকের গরাদ আলগা আলগা জামা, গোলাপী গোলাপী আঁচলটা পিছনে ফেলা। কেবল, এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, ওর রাগ হয়েছে, কথা বলবে না, গম্ভীর আর ভার।

কিন্তু ও আমার জন্যে চা করে নিয়ে এসেছে এই দেখে, এই মনে হতেই, আমার একটা কষ্ট আর আনন্দ দুই-ই হল—জানি না, কষ্ট আনন্দ, দুই-ই এক সঙ্গে কী করে হয়—অথচ এর মধ্যে একটা অন্যরকম খচখচানিও আছে, কেন ও সব ব্যাপারটাকে এত সহজ করেই বা ফেলতে চায়।

আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, পিঠে হাত রাখলাম, ও মুখটা একটু ফিরিয়ে ওর বড় বড় চোখে আমাকে একবার দেখল, রাগ আর দুঃখ মেলানো থাকলে যেরকম হয় অনেকটা সেইরকম চাউনি। আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'চা।'

আমি দু' হাত দিয়ে ওকে আমার দিকে ফিরিয়ে নিলাম, আর আলতো করে ঠোঁটে একটা চুমো খেলাম, ও আবার বললো, 'চা খেয়ে নাও।' আমি আরো বেশী করে জড়িয়ে ধরে, ওর ঠোঁটের দিকে তাকালাম, যেখানে একটু আগেই রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। এখন আর একটুও রক্ত নেই, নিশ্চয় ধুয়ে এসেছে, বললাম, 'আমাকে একটু চুমু খাবে?'

'না।'

'খাও না, প্লীজ!'

ও একবার আমার চোখের দিকে তাকালো, তারপরে মুখটা তুলে আমার নিচের ঠোঁটে চুমো খেল, তখন ওর ওপরের ঠোঁটটা আমার মুখের মধ্যে। একটু পরেই, ঠোঁট খুলে নিয়ে আবার বললো, 'চা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

কিন্তু এখন আর আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে না, ওকে ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু পাছে ও আবার চলে যায়, তাই প্রায় এক ঢোকে চা খেয়ে নিলাম। নিয়ে কাপটা রেখে ওকে যখনই ফিরে ধরতে যাব, এমন কি মনে

মনে দরজাটা বন্ধ করে দেবার কথাও ভেবেছি, তখনই ও বলে উঠলো, 'তুমি একটা সর্বনাশ না করে ছাড়বে না, না ?'

জবাব দেবার আগেই, আমি ভাবতে আরম্ভ করি, এ কথা বলছে কেন, আর ও এভাবে কথা বললেই এমন একটা ভাব করবে, যেন ও আর শিখা নেই। আমি ভুরু কুঁচকে তাকাতে ও নিজেই বললো, 'তুমি তোমার ওই শুটকা বাঁদরটাকে বলেছ, কেশবদা এক জায়গায় দুশো কুইন্টল চাল আর একশো পাউন্ডের মত বেবী ফুড লুকিয়ে রেখেছে ?'

আবার সেই কেশব পূর্ণেন্দু। বললাম, 'কেন, মিথ্যা কথা বলেছি নাকি ?'

'সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, তোমার এসব কথা বলবার দরকার কী। তোমাকে আমি কতদিন বলেছি, তুমি এসবের মধ্যে থাকবে না। লোকে তোমাকে আগে খারাপ বলবে, ওদের বিচার পরে করবে, লোকদের তুমি জান না ?'

তার মানে, আমি তো গুণ্ডা, তাই একথা শিখা বলছে, আর কথাটা মিথ্যাও বলেনি, কারণ আমার ওদের মত রাজনীতির দল নেই, আমি নেতা না। কিন্তু একথা ভাবলেই, আমার মাথায় রক্ত উঠতে থাকে। আমি বললাম, 'ওসব আমি মানি না। জানি, তাই বলেছি। আমার পেছনে ওরা লাগতে আসে কেন।'

শিখা মাথা নাড়তে নাড়তে, কেমন একরকম কষ্ট লাগার মত গলায় বললো, 'না না, এসব করো না, মানতে তোমাকে হবেই। তোমাকে এত করে বলছি তুমি এসবের মধ্যে যেও না। তুমি শুটকাকে বলেছ, শুটকা আবার সে-সব পূর্ণেন্দুদাদের দলের কা'কে বলেছে, কেশবদা একেবারে ঝড়ের মত আমার কাছে ছুটে এসেছে। কাল রাত্রে বলে গেল, টুকুকে সাবধান করে দিও, ও সাপের গায়ে পা দিতে যাচ্ছে, ভাই বলে পার পাবে না।'

আমি শিখার দিকে চেয়ে বললাম, 'তোমাকে বলতে এল কেন ?'

শিখা ভুরুটা তুললো এমনভাবে, আর চোখ দুটো একটু বড় করলো, যেন খুবই অবাক হয়েছে। বললো, 'তোমার নামে সব নালিশ তো আমাকেই শুনতে হয়। কেশবদা, পূর্ণেন্দুদা সব নালিশ তো আমাকেই করে, নতুন নাকি ?'

আমি জানি তা, তবু আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি, ভাবি, কেন, ওরা দু'জনে দু' দলের হয়েও কেন শিখার কাছেই ছুটে ছুটে আসে। অবিশ্যি, জানি, আমার কথা শিখাকে বললে, ঠিক আমার কানে আসবে, হয়তো সেই জন্যেই বলে, কিন্তু যারা নিজেরা দলাদলি করে, তারা কেন এই একটা মেয়ের কাছেই আসে। এ সময়ে শিখার একটা কথা আমার মনে পড়ে যায়, 'পুরুষেরা সবাই এক, মেয়েদের কাছে ওদের চাইবার আর কিছু নেই।' অবিশ্যি জানি না, চাইবার কী থাকতে পারে, পুরুষদের কাছেই বা মেয়েদের কী চাইবার থাকতে পারে, একখানি জিনিস ছাড়া ; তবু

আমার মনের মধ্যে গোলমাল হতে থাকে।

শিখাও আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতেই, কাছে—আমার খুব কাছে এসে বললো, 'কী, ওরকম তাকিয়ে রইলে যে ? সবাই ভাবে, আমি তোমাকে সব কথা বলতে পারব, তুমি আমার কথা শুনবে, তাই আমাকে সব বলে।'

আচ্ছা, শিখা কি বেশ্যা নাকি, যেরকম থাকে না, অনেক পুরুষের সঙ্গেই লেনদেন, কিন্তু নিজের একটা আলাদা পেয়ারের লোক থাকে, কী যেন একটা বলে তাকে—আমি কি সেইরকম নাকি। কিন্তু তা ভাবতেও আমার ইচ্ছা করে না, কেননা, ভাবভঙ্গি তো সেরকম না, অথচ নাহ্, সারা জীবনে বোধহয় এর জবাব পাওয়া যাবে না। আমি বললাম, 'শুটকা যে বলেছে, কেশবকে সে কথা কে বললো। আমি তো শুটকাকে বলতে বারণ করেছিলাম।'

'তা আমি কী করে জানব, কেশবদা শুনে এসে, আমাকে বলতে এসেছিল। দেখলাম, চোখমুখ লাল ; বলেই চলে গেল।'

'ওহ্, তাই বড়বাবু কাল সারা বাত বাড়ি ফেরেনি, ভোর রাত্রে ফিরেছে, তার মানে চোরাই চাল আব বেবীফুড আবার অন্য জায়গায় পাচার করে দিয়েছে।'

বলতে বলতে স্‌সাহ্, দারুণ হাসি পেতে লাগলো, কিন্তু শুটকা, শুটকা হারামজাদা তো গোলমাল আরম্ভ করেছে। আমি বললাম, 'শুটকা শুয়োরের বাচ্চাকে আমি ছাড়ব না। ও সল্‌া মেজদাদের দলের সঙ্গে হব্‌নব্‌স্ আরম্ভ করেছে।'

শিখা বললো, 'ঠিকই করেছে, শুটকা কাজ গোছাচ্ছে, যে কোন একটা দলে তো যেতেই হবে, তাই পূর্ণেন্দুদাদের দলে চলে যাচ্ছে। তোমার মত বোকা নাকি কেউ, তোমাকেও একটা দলে চলে যেতে হবে ; তা নইলে টিকতে পারবে না। তা না, তুমি আবার পূর্ণেন্দুদার নামে কী সব বলেছ, কোম্পানীর টাকায় কেনা জমির টাকা মেরেছে, না কী করেছে।'

'তা তো মেরেছেই, তোমার দাদা তো সবই জানে, ওর হাত দিয়েই হয়েছে।'

'হোক, সে কথা তোমার বলার দরকার কী।'

'না, আমি বলছি, ও এত হাজার হাজার টাকা মাইনে পায়, গায়ে আঁচড়টি লাগে না, ও কেন গরীবদেব নিয়ে রাজনীতি করে।'

'ওসব পুরনো কথা, তোমার মুখে অনেক শুনেছি, কিন্তু পূর্ণেন্দুদা একজন নেতা, সে ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে, শুধু তা না, তুমি ওদের দলের রমেশকে নিয়েও নাকি যা-তা বলেছ।'

'কে রমেশ ?'

'কেন, যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আছে, কেরানী—।'

'ও, সেই মোটা কাচের চশমা, সব সময় কাটি দিয়ে দাঁত খোঁটে, আর শকুনের মতন এদিক ওদিক তাকায় ?'

সে সব আমি জানি না, তুমি রমেশের নামে বলেছ, "এই সাব-ডিভিশনের প্রাথমিক শিক্ষকদের কত হাজার টাকা গভর্নমেন্টের কাছে পাওয়ানা ছিল, সেই টাকা থেকে সে টাকা মেরেছে। আবার এ সব লোকেরা মিছিলে বেরোয় কী করে জানি না।" বলেছ তুমি ?'

'হ্যাঁ, বলেছি তো, প্রমাণ করে দিতে পারি, আমাদের এখানকার প্রাইমারী ইস্কুলের হেডমাস্টার নিরাপদবাবুই বলবে, আট মাস শুধু শুধু দেরী করেছে টাকাটা দিতে। অথচ সব রেডি হয়ে পড়েছিল, তারপরে যখন আড়াই হাজার টাকা মাস্টাররা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে, তখন চেক পাস্ হয়েছে।'

'প্রমাণ আবার করবে কী করে, লেখাপড়া আছে নাকি কিছু।'

'কেন, নিরাপদবাবু বলেছেন ; উনি কোনদিন মিথ্যা বলেন না।'

'ওটা বুঝি প্রমাণ হল, কী যে ছাই বল না। নিরাপদবাবুই বা কীরকম লোক, ওঁরা ছাড়লেন কেন ?'

'পেটে যে ইঁদুরে ডন মারছিল ওদিকে।'

শিখা হেসে ফেললো, হঠাৎ আর কথা যোগালো না মুখে। আমি আবার বললাম, 'ওরা আমাকে তো গুণ্ডা বলছে, ওরা কী ? ওরা কি সত্যি সত্যি গরীবের দল করে ? সেই সব আসল গীরবেরা কোথায়, কোনদিন দেখেছ ? সব তো ওরাই।'

'না, সবাই তো আর পূর্ণেন্দুদা বা রমেশ না।'

'সে তোমার, লোম বাছতে কম্বল ফাঁকা হয়ে যাবে।'

শিখা প্রায় ভুরু কোঁচকাতে যাচ্ছিল, আমি একটা খিস্তি করতে যাচ্ছি ভেবে। আমি আবার বললাম, 'আরে গুণ্ডা বলে তো কানা না, দেখগে, গরীবেরা নিজেদের মতই আছে, এরা ফাটাফাটি করে যাচ্ছে।'

শিখা ওর খোলা চুলে ঝাপটা মেরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললো, 'করুক, তুমি কিছু বলতে পারবে না। তুমি বলার কে ?'

তার মানে, এটা ওর রাগ না, মাথা ঝাপটানো মানে ঝগড়া না, ও আমাকে বকছে, মানে, আছে না একরকম, ভাব থাকলে যেমন জোর করে বলা যায়, সেইরকম যে কারণে, এখন ওর চোখ দুটোর চাউনিও কীরকম হয়ে গেছে, একটু বাঁকা বাঁকা। বললাম, 'ওরা আমাকে যা-তা বলে কেন।'

'বলবেই তো, তুমি তো যা-তাই-ই, তুমি ভাল নাকি। আর তা নইলে, তুমি ওদের কারুর একজনের দলে চলে যাও।'

কথাটা বলে, একটু একটু হাসতে থাকে শিখা। আমি বললাম, 'গেলে কী হবে ?'

'তবু তোমার একটা দল থাকবে। তোমাকে একটা দল বাঁচাবে।'

বলতে বলতে শিখার মুখটা কীরকম হয়ে গেল। আমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে, ও অন্যদিকে কীরকম আনমনাভাবে তাকিয়ে রইল, আঙুল দিয়ে আমার বুকের বোতামের কাছে একবার ছুঁয়ে দিল, আমার কোমরের বেল্ট একবার ছুঁয়ে দিল, বললো, 'না সুখেনদা, শোনো, তুমি সব ব্যাপারগুলোকে

এভাবে নিও না, প্লীজ, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না, দিন দিন কী রকম অবস্থা হয়ে উঠছে, তুমি সবাইকে শত্রু করে ফেলছ, দু'দলই তোমার ওপর ক্ষেপে যাচ্ছে, আমার ভাল লাগছে না।'

ওর এ কথাগুলো শুনে আমার যেন ভিতরে কীরকম একটা হতে থাকে, ঠিক কী, তা বুঝতে পারি না, কেবল মনে হয় ঘাড়ের কাছে কোথায় যেন একটা শিউরোনি শিউরোনি ভাব লাগে। ওরা আমার কী করতে পারে, তা জানি না, তবে হ্যাঁ, ওদের দল বড়, আমার কেউ নেই, কিন্তু ওরা কী করতে পারে আমার ! মারবে, খুন করবে—কেননা, শিখা যেভাবে বলছে, এটা ঠিক ও বোধহয় সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে। কিন্তু কেন যাব ওদের দলে। আমার থেকে কেশব পূর্ণেন্দু কিসে ভাল, আমি বুঝতে পারি না, অথচ দল আছে বলে, ওদের তাঁবে থাকতে হবে, কেন—ওরা কি আকাশ নাকি, মাটি নাকি, যার তলায়, যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি ! যেমন বলে, ঈশ্বরের বিধান মেনে নিতে হবে, সেইরকম নাকি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোন্ দলে ?'

শিখা অবাক হয়ে বললো, 'আমি কোন্ দলে ? আমি কোন দলে নেই, একটা সাধারণ মেয়ে, শিখা মজুমদার !'

'আমিও তো একটা ছেলে, সুখেন্দু—।'

'না, তুমি তা নও, তুমি কি সাধারণ নাকি। তোমাকে নিয়ে লোকের মাথাব্যথা, তোমাকে সবাই অন্য লোক বলে চেনে।'

তা ঠিক ; আমি হলাম এ শহরের একটা গুণ্ডা, বড় মাস্তান, আমার অনেক রোয়াব, অনেকেই আমাকে মানে। আমাকে ওদের দলের লোকেরা মানে না ঠিকই, কিন্তু অনেকেই মানে। আমাকেও অনেকের দরকার হয়, যেমন কারখানায় বড়দা, মেজদার দু' দল থাকলেও চোপরা আমাকে আলাদা ডেকে, বিশেষ বিশেষ লোকের কথা বলে, কেননা, চোপরা পৃথিবীর কাউকেই বিশ্বাস করে না। দরকার হলে কারখানার যে কোন লোককেই শায়েস্তা করতে যাই আমি। তবে আমার হল মাস্তান দল, আমার রাজনীতি নেই। শিখা ঠিকই বলেছে, আমি একটা ছেলে মাত্র না। ও যেমন বললো, ও একটা সাধারণ মেয়ে, কোন দলে নেই, আমি ঠিক তা না। আচ্ছা, আমি যদি একটা সাধারণ ছেলে হয়ে যাই, কোন দলেই যাব না—ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল আমার, আর হাসতে হাসতেই বললাম, 'তা হলে আমিও তোমার মত সাধারণ একটা ছেলে হয়ে যাই, কোন দলেই যাব না।'

শিখা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন অবাক না, হাসি না, কেমন একটা আনমনা আনমনা ভাবে। যেন কথাটা বুঝতেই পারেনি। বললো, 'কী করে হবে ?'

'তা কী জানি।'

'আমি জানি।'

'বল।'

'চাকরিবাকরি করবে— !'

'সে তো মেজদাও করে।'

'মেজদার মত না, শোন-না আমার কথা, তুমি সাধারণ লোক দেখনি ? চাকরিবাকরি করে, খায়-দায়, বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে।'

অবিশ্যি ভাবতেই পারছি না তা, কী করে ওরকম হওয়া যায়। তারপরে হয়তো শিখা বলবে, ঘাড়ে গর্দানে পাউডার দিয়ে, পান চিবুতে চিবুতে, রোববারে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা। দুপুরে তাশ পাশা খেলা, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরেই খাটুনির কেলান্তিতে কেলিয়ে পড়ে থাকা। ছেলেমেয়ের চ্যাঁ ভ্যাঁ নিয়ে হাড় কালি করা, উহ্‌রে স্‌সাহ্‌, গা ঘিনঘিনিয়ে উঠছে। তবে হ্যাঁ, ওদের দলে না গিয়ে এটাও ভাল—জেনেশুনে ওসব করতে পারব না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তখন ওদের খারাপ ব্যাপারগুলো বলতে পারব তো ?'

শিখা বললো, 'না। তা বলতে পারবে না।'

'বাহ্‌, তা হলে সাধারণ লোক হয়েই বা লাভ কী।'

শিখা ভুরু বাঁকিয়ে তাকালো, বললো, 'না, তোমার দ্বারা ওসব হবে না। আর তুমি যদি সব ছেড়েও দাও, তা হলেও ওরা তোমাকে কোনদিন বিশ্বাস করবে না, শহরে কিছু একটা ঘটলেই, তোমার কথা ওদের একবার মনে হবেই। কিন্তু তুমি কেন একটা সাধারণ ছেলে হলে না।'

এমনভাবে শিখা বলছে, যেন আমি সুখেন্দু না হয়ে কেন নিরাপদবাবু হলাম না। এমনভাবে হাত ঝাঁকানি দিয়ে মুখটা এমন ভাব করে বললো, যেন তাতে ওর কষ্ট হচ্ছে। অথচ আমার ভীষণ হাসি পেয়ে গেল, আমি ওকে দু' হাতে জড়িয়ে কাছে নিলাম, আর পায়রার মত ওর বুকটা ফুলে উঠলো, যেন ওরই চিবুকটা প্রায় বুকে ঠেকবে। ঠোঁট দিয়ে ওর একটা কানে ছুঁইয়ে দিলাম। ও কিন্তু মাথা নেড়ে আবার বললো, 'না না, তুমি জান না, আমার এ সব কিছুই ভাল লাগছে না, আচ্ছা, সত্যি তুমি কি— ।'

আমি ওর ঠোঁটে আস্তে চুমো খেলাম, ও আবার বললো, 'সত্যি, তুমি কি সব ছেড়ে ছুঁড়ে একটা সাধারণ ছেলে—।'

'চেষ্টা করব।' বলে, এবার অনেকক্ষণ ধরে খেলাম, আর ভাবলাম ওকে যে তখন রেগে গিয়ে এত কষ্ট দিলাম, সে বিষয়ে ও একটা কথাও বললো না। খালি এসব কথাই বললো। আর এখন যেন ও কী রকম নরম তুলতুলে হয়ে উঠেছে। আমি ওকে মেঝে থেকে তুলে ফেললাম গায়ের ওপরে, কোণের চৌকিটার কাছে নিয়ে গেলাম। শোয়াতে চাইলাম, কিন্তু ও জোর করে বসে বললো, 'না, দিদি এসে পড়তে পারে, অনেক বেলা হয়েছে।'

'দরজাটা দিয়ে আসি।'

'না, এখন না, তুমি একটা কী।'

বলে, চোখের দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন কী একটা কথা বলছে, আর তখনই আমার মনে পড়ে গেল, হুম্‌, অসুবিধা আছে। তাই উঠে পড়ে

ডান হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখে নিজেই চমকে উঠে বললাম, 'উহ্‌রে, বারোটা বেজে গেছে। চলি, ওবেলা আসব।'

বলে দরজার দিকে যেতে যেতে শুনলাম, শিখা আবার বলছে, 'আমার কথাগুলো একটু মনে রেখো।'

আমি কোন জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। বারান্দা দিয়ে ওদের বাড়ির বেড়ার কাছে গিয়ে যা ভেবেছিলাম তা-ই, মোটরবাইকটার ওপরে রোদ পড়েছে। যখন রেখেছিলাম, তখন ছায়া ছিল। হ্যাণ্ডেলে হাত দিতে গিয়েই একবার থমকে গেলাম, একটা প্রজাপতি উড়ে গেল হ্যাণ্ডেলের ওপর থেকে। কী জানি, আমার হ্যাণ্ডেলে বসে কী করছিল ওটা—দেখছি, শিখাদের পাড়ায় মেলাই প্রজাপতি। হাত বাড়িয়ে একবার ধরবার চেষ্টা করলাম, পালিয়ে গেল। এটা একটু হলদে হলদে মতন। মোটরবাইকটা ঠেলে, কেরিয়ার থেকে নামিয়ে, টিনের ঝাপের দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে গেলাম, আর পা ঠুকে স্টার্ট দিতেই গোটা পাড়াটা যেন চমকে উঠলো। লোকেরা নিশ্চয় বলাবলি করছে, 'গুণ্ডাটা যাচ্ছে।'

শহরের ঘিঞ্জিতে এসে প্রথমেই গেলাম পেট্রল পাম্পে, পাঁচ লিটার তেল দিতে বললাম। পাম্পের মালিক মণ্ডলকে দেখা গেল, ঘরের ভিতর কাচের মধ্য দিয়ে আমাকে দেখছে। তেল ভরতে ভরতেই, লোকটা খালি গায়ে, খালি পায়ে, গাবদা শরীরটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল। আসবে জানতাম—মেলাই টাকা আমার কাছে পাওয়ানা হয়েছে কি না। আশ্চর্য, লোকটা হিসাব কেন রাখে বুঝতে পারি না—চুরি করার এত ফন্দি জানিস, তবু আমাদের কাছে তাগাদা! এসেই গলার স্বর নামিয়ে বললো, 'সাড়ে তিনশো টাকার ওপর হয়ে গেল কিন্তু।'

আমি ট্যাংকের মুখ বন্ধ করতে করতে বললাম, 'তাতে কী হয়েছে, সেদিন যে আপনার সেই খচ্চর ভাড়াটেটাকে পেছনে লেগে উঠিয়ে দিলাম, সাত বছর ধরে তো পারছিলেন না, আমাকেই তো ডেকে নিয়ে গেছলেন।'

'তা ঠিক, তা ঠিক, তোমরা না হলে কি ওসব লোক সজুত হয়, তবে—।'

'তবে আবার কী, লোকটা ছিল সত্তর টাকায়, এবার তো দেড়শো টাকায় ভাড়া দিয়েছেন—ডবল যাকে বলে।'

বলে আমি স্টার্ট দিলাম, মণ্ডল বললো, 'তা ঠিক—তবে—।'

'ইচ্ছে হয় তেল দেবেন, না হয় দেবেন না।'

স্‌সাহ্‌, মুখটা আমার পাথরের মত হয়ে যাচ্ছে, আমি চলতে আরম্ভ করলাম, আর পিছনে শুনতে পেলাম, 'না না, তা বলছি না⋯।'

কী বলছ তুমিই জান স্‌লা। ই কি মাইরি, একটা কৃতজ্ঞতা বলে কথা নেই। একটা নিরীহ লোককে বিপদে ফেললাম ওর জন্যে—অবিশ্যি নিরীহ কি না জানি না. তবু এই মণ্ডলের থেকে ভাল। বাড়ি ভাড়া

কোনদিন বাকী ফেলেনি লোকটা, পাড়ার লোকেরা খারাপ বলেনি। কোনরকম এদিক ওদিক ছিল না—এক-একজনের যেমন থাকে, পাড়ার মধ্যে একটু গেরামভারি চাল, একটু হিড়িক মেরে চলা, সেরকম কিছু না। এমনও না যে, লোকটার দু' চারটে বড়সড় মেয়ে আছে, যাদের জন্যে পাড়ার ছোঁড়ারা দিন-রাত্রি হিড়িক দিচ্ছে, রক আর আশপাশ ছেড়ে নড়ছে না, যাতে মেয়েগুলোকে ঢলানে বলে, বাপকে তাড়ানো যায়। তবু লোকটার পিছনে লেগে, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি, কেননা, মণ্ডলের আরো মোটা টাকার ভাড়া চাই। আর বেইমানটা বলে কিনা, পেট্রলের অনেক টাকা বাকী পড়ে গিয়েছে। বাকী পড়ল কী করে চাঁদ, এতদিন কাজ বাগাবার মতলবে ছিলে, তাই টাকার কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাওনি। এখন হাসিল, এখন তাগাদা—দিচ্ছি তোমাকে টাকা। এই শহরে করে খেতে হলে আমাকে তেল না দিয়ে তোমার উপায় নেই, তোমার চোরাই পথের ঠিকানা আমার জানা আছে। যাক্ গে এসব কথা, তেল ওর বাবা দেবে—কিন্তু—আচ্ছা আমি ভাবছি, সত্যি, আর দশটা সাধারণ লোকের মত আমি না-ই বা হব কেন, হওয়াটা কি খুবই কঠিন। এই, চাকরিবাকরি করলাম, একটা বিয়ে—কিন্তু শিখাকে ছাড়া তা হবে না, বিয়ে করতে হলে ওকেই চাই। বেশ, ওকেই বিয়ে করলাম···দেখ দেখ স্‌সাহ্‌, গরুর গাড়িটা কীভাবে আসছে, আর একটু হলেই ওই কাঠের চাকায় ধাক্কা লাগতো, আর একেবারে উল্টে গিয়ে নর্দমায় পড়তাম। আমি একটা চিৎকার করলাম, 'হে-ই স্‌সাহ্‌ বয়েলগাড়ি!'···

বললে কী হবে, গাড়ি টানছে বলদে, চালাচ্ছেও বলদেই, তা নইলে এই বেলা বারোটায় কেউ গান গাইতে গাইতে যায়। তার ওপরে যেমন রাস্তার ছিরি, ঠিক চোট্টা চেয়ারম্যানটার মতই খুবলানো গা, সেটা আবার কেশবের দলের লোক। এইসব মফস্বল শহরের মিউনিসিপালিটির কোন চেয়ারম্যান সম্পর্কে আজ অবধি আমি ভাল কথা শুনিনি। আর দু' একটা ভাল লোক, যাদের কথা শুনেছি, যেমন ডাক্তার গঙ্গাপদ রায়, বিচ্ছিরি সোজা আর সাচ্চা লোক, একটু ন্যালাখ্যাবলা মত আছে। ছারপোকার মত ডাক্তার না যে, খালি রুগীর ট্যাকের দিকে নজর, বরং লোকটাকে জগ্ দেয় অনেকেই, তাকে একবার সবাই মিলে চেয়ারম্যান করেছিল, আর গঙ্গাপদ ডাক্তার ছ' মাসের মধ্যেই কাছা খুলে পালিয়ে এসেছিল, যেন জীবনে এমন ভয় সে আর কখনো পায়নি। বলেছিল, 'মাথা খারাপ, ও সব কাজ করতে গেলে যে প্যাঁচ-পয়জার জানা থাকা দরকার, সে এলেম আমার নেই। আমি চুরি করতে পারব না, করতে দিতেও পারব না, তার চেয়ে বাবা তাঁতীর তাঁত বুনে খাওয়াই ভাল।' তার মানে, গঙ্গাপদ ডাক্তারকে নিরীহ লোক ভেবে, তাকে সামনে রেখে, যে যার গোছাবার তালে ছিল। ব্যাপার দেখে, ডাক্তার দে দৌড়, বোধহয় চোর ধরিয়ে দিতেও পারবে না, অথচ নিজেকেও দলে থেকে যেতে হবে, এই সব দেখেশুনে, কেটে এসেছে। আচ্ছা, কেন এরকম হবে, আমি বুঝতে পারি না, মিউনিসিপালিটির টাকায়

গড়বড় হবেই, চেয়ারম্যানের নিজের পাড়ার রাস্তা ভাল হবেই, দশটার জায়গায় কুড়িটা লাইট পোস্ট হবেই, আর বাদবাকী সব গোল্লায় যাক, যেন বাপের জমিদারিতে এসে বসলেন উনি। দেখ দেকিনি শহরের রাস্তার ছিবি—যেখানে হাত দেবে চোরের উৎপাত—তবে কি না, লোকগুলো ভদ্দরলোক, আমার ইয়ে। শুটকা হারামজাদাটা এখন কোথায় আছে কে জানে, ওকে আমার চাই—এই যে, থানার বড়বাবু, ভ্যানের মধ্যে, ড্রাইভারের পাশেই বসে আছে, 'হ্যাল্লো স্যা— !' আমি হাত তুললাম, লোকটা কোনরকমে একবার হাতটা নাড়লো মাত্র, ভুরুটা তুললো একবার, যেন হাতে কুষ্ঠ হয়েছে, ঠুটো জগন্নাথ, ওর বেশী তোলা যায় না ! তা না, আসলে শহরের রাস্তায় দশজনের সামনে গুণ্ডাটাকে বেশী খাতির দেখানোটা ঠিক হবে না, তা-ই। আমার বয়েই গেল, যাক গে, ওটাও ভদ্দরলোকের চুক্তির মধ্যেই পড়ে, কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না, ডিসটার্ব করবে না।...এটা আবার কী হচ্ছে, বেলা বারোটার পর। মোড়ের মাথাতেই, গাড়ি ঘোড়া থামিয়ে কাদের মিটিং হচ্ছে এটা। আর দেখতে হবে না, পূর্ণেন্দু—মানে মেজদাদের দল, রমেশ বক্তৃতা দিচ্ছে : 'ভাই, বন্ধুগণ, মহকুমা শাসকের এই জুলুমের জবাবে আমরা আগামীকাল আমাদের সমস্ত মহকুমাব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছি। আপনারা...।' রাস্তাটা এমনভাবে জুড়ে দাঁড়িয়েছে সব, যাবার পথ রাখেনি একটু। দেখছি যশোদাবাবুর দলও আছে, কত দল যে আছে, যাক, তার মানে কাল হরতাল—কাল কী বার যেন—হ্যাঁ, বেস্পতিবার। আমি মেশিনটা বন্ধ না করেই দাঁড়ালাম, শব্দে অনেকেই পিছন ফিরে তাকালো, আমি রমেশের দিকে তাকিয়েছিলাম—আর কেন জানি না, হঠাৎ কিছু লোক সরে পড়তে লাগলো। আমি রাস্তার পাশে, কয়েকটা দোকানের সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম, আর রমেশ তখন গলা আরো তুলে বলে উঠলো, 'আমি জানি বন্ধুগণ, শহরের অসামাজিক লোকেরা গুণ্ডা এবং দালালেরা নানাভাবে আমাদের...।' তার মানে, আমাকে দেখেই আমার সম্পর্কেই বলছে, আমি রমেশের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতেই মেশিন বন্ধ করলাম, আর তখন একদল লোক আমার দিকেই বারে বারে তাকাতে লাগলো—যেন আমি একটা সঙের পেরু—কিন্তু আজ বুধবার এত বেলায় এ লোকগুলো কারা, যারা ভিড় করে আছে ! তারপরেই দেখি, নিরাপদবাবু একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর মোটা কাঁচের চশমাটা প্রায় নাকের ডগায়, তাই রমেশকে দেখবার জন্যে মুখটা তুলেছেন প্রায় আকাশের দিকে, আর মুখটা কুঁচকে হাঁ-মুখটা এতখানি খুলে রেখেছেন, আর জিভটা বেরিয়ে পড়েছে, জিভটা নড়ছে এমনভাবে যেন উনিও কথাগুলো বলছেন, না কি ওভাবে গিলছেন, কে জানে। এমন সময়ে, কে যেন আমাকে ডাকলো, 'সুখেনদা।' পাশ ফিরে দেখলাম, একটা জুয়েলারির দোকানের ছোকরা আমাকে ডাকছে, বললো, 'মোটর-সাইকেলটা রেখে দোকানে এসে বসুন না।' তার মানে, এ শুধু গুণ্ডার খাতির না, মেজদাদের দলের উপর রাগ

আছে নিশ্চয় কোন কারণে, আর বুঝতে পারছে তো, রমেশ আমাকেই গালাগাল দিচ্ছে, তা-ই একটু দেখিয়ে দেওয়া। স্‌সাহ্‌ চোরাই সোনার কারবার করছে, আর খদ্দেরের মালে যত খুশি পান্‌ দিচ্ছে। আমি ঘাড় নেড়ে বলি, 'না ভাই, এখন যাব।'

বলে আমি আবার স্টার্ট দিই। ভিড়টা একটু পাতলা হয়েছে, একটু যেন কেমন ছানা কেটে যাওয়াই, আমি আবার রমেশের দিকে তাকালাম। ও কি নিরাপদবাবুকে দেখতে পাচ্ছে, আর নিরাপদবাবু কী ভাবছেন, আমার একটু জানতে ইচ্ছা করছে। এই রমেশই তো প্রাথমিক শিক্ষকদের পাওয়ানা টাকার থেকে টাকা মেরেছিল। অবিশ্যি জানি না, ওদের অফিসারও সেই টাকা থেকে টাকা খেয়েছিল কি না। না খেয়ে কি আর সই করেছিল, ছাহেব কি আর তাঁর কেরানী বাবুদের ছেনেন না, তাও কি কখনো হয়। এমন কি অফিসের বেয়ারাটাও নিশ্চয় সে টাকার ভাগ থেকে বাদ যায়নি। ফাইল-টাইল সব তো আবার ওদের হাতেই থাকে, কোথায় কোনটা আছে, খোঁজ-খবর ওরাই ঠিক রাখে। আসল প্রস্তাবটা তো বেয়ারার মারফতই এসেছিল, নিরাপদবাবু তো সেভাবেই বলেছিলেন, 'সেদিনও আশা ছেড়ে দিয়ে চলেই আসছিলাম, ভিখিরির মত মনে হচ্ছিল নিজেদের। হঠাৎ বেয়ারাটা বাইরে এসে বললে, "মাস্টেরবাবু, এতগুলো সরকারি টাকা কি আর এমনি এমনি বেরয় ? আপনারা দাবী করলেন, বলতে গেলে মুফতেই তো পেয়ে গেলেন। কিছু যদি ছাড়েন-টাড়েন—মানে খুশি হয়ে একটু খাওয়ানো-টাওয়ানো আর কি, বোঝেনই তো কোন্‌ দেব্‌তার কী পুজো, শুধু শুধু কেন এতগুলো টাকার চেক পড়ে থাকবে, রাজী থাকেন তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" প্রথমটা ভাবলাম, লোকটা বদমাইসি করছে, এ কি কখনো হয়, যেখানে রমেশ রয়েছে, আমাদের আন্দোলন সমর্থন করছে, যে-আন্দোলনের জন্যে টাকাটা পাচ্ছি, সেই টাকার ভাগ দিতে গেলে রমেশই তো ক্ষেপে যাবে। বেয়ারার বেয়াদপিতে আমি গিয়ে রমেশকে সব বলে দিলাম, রমেশ অমনি অফিসারের নামে গালাগাল দিতে লাগল, তারপরে বললে, "তবে ও ব্যাটা যখন একবার তাল করেছে, তখন না ঝেড়ে সই করবে না। তা নইলে আরো দশ মাস ফেলে রাখবে।" "আরো দশ মাস !" "হ্যাঁ, একেই তো বলে লাল ফিতের ফাঁস, জানেন না ? আঠারো মাসে বছর কি আর এমনি বলে। বেশি বললে দেখবেন চব্বিশ মাসে বছর হয়ে যাবে, হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ··· । তাই বলছিলাম, ও ব্যাটাকে যা দেবার দিয়েই দিন, নইলে ছাড়বে না, তারপরে দেখুন না, ওর বিরুদ্ধে তো শীগ্‌গিরই আমরা লড়াইয়ে নামছি, ওর অত্যাচার আমরা মুখ বুজে সইব না··· ।" কিন্তু রমেশ একটা দলের লোক হয়ে যে টাকাটা দিতে বলবে, ভাবতে পারিনি। আর আমাদের তো জান, এদিকে আনতে ওদিকে কুলোয় না, আমরা মাস্টাররা সবাই মিলে ঠিক করে ফেললাম, নিয়েই নিই, নিয়েও নিলাম। কী জানি, বাবা, শেষে মূলে হা-ভাত হবে। সব দেখেশুনে কেমন যেন লাগে, ভিরমি যাকে বলে, কিছুই বুঝি না।'···

মাস্টারমশাই এখনো যেভাবে রমেশকে দেখছেন আর ওর বক্তৃতা শুনছেন, তাতেও বোধহয় ভিরমিই খাচ্ছেন। দেখলাম, রমেশ আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, ও বোধহয় একটা বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখগুলো ধক্ ধক্ জ্বলছে, ওর আশেপাশে আরো কয়েকটা চোখও ঠিক সেইরকম জ্বলছে, যেন আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। হঠাৎ আমার ঘাড়ের কাছে কী রকম শিউরে উঠলো—কীরকম একটা অস্বস্তি অস্বস্তি ভাবের। আমি এগিয়ে চলে গেলাম, রমেশ চিৎকার করে চলেছে—শিখার মুখটা আমার মনে পড়ে গেল, আর ওর কথাগুলো, কিন্তু—হ্যাঁ, আমি যদি একটা সাধারণ মানুষই হই—নিরাপদবাবুর মতন। আমরা তো ছেলেবেলায় নিরাপদবাবুর কাছে পড়েছি, অনেকবার ওঁর বাড়িতেও গেছি, তখন মাস্টারমশাই অন্যরকম ছিলেন, ওঁর গোঁফ ছিল, আর গোঁফের রঙ কালো ছিল, আর ওঁর বউ দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন। একটা ছোট বাড়ি, দু তিনটে ছোট ছোট ঘর, উঠোন জুড়ে গাদা কেষ্টকলির ঝাড়, তিনটে নারকেল গাছ—এখনো সেই বাড়িতেই আছেন—ওটা ওঁর বাবার বাড়ি। এখনকার নিরাপদবাবুকে দেখলে, সেই মাস্টারমশাইকে ভাবাই যায় না। ওঁর বউ খুব মিষ্টি মিষ্টি হাসতেন, সব সময়েই—অথচ মাস্টারমশাই কিন্তু বেশীর ভাগ সময় মুখটা ভার করেই রাখতেন, যেন রাগ রাগ ভাব, যে কারণে আমরা ভাবতাম, উনি খুব রাগী, আমাদের মত উনি নিশ্চয়ই বউকে খুব বকেন। কিন্তু ছেলেবেলায় একদিন দেখেছিলাম, মাস্টারমশাইয়ের চোখ থেকে ওঁর বউ কাপড়ের আঁচল দিয়ে পিচুটি মুছিয়ে দিচ্ছেন—মাস্টারমশাইয়ের অসুখ করেছিল, তাই। শুধু তাই না, মাস্টারমশাইয়ের চোখ মুখ মুছিয়ে, একটা ন্যাকড়া দিয়ে সিকনি অবধি ঝাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওঁর বউ, আবার বলেছিলেন, 'আর একটু জোরে ঝাড়ো।' মাস্টারমশাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলেন, 'পারছি না যে।' ঠিক যেন ছেলেমানুষ, আর ওঁর বউ নাকটা ভাল করে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, যেন, যেমন মায়েরা দেয় না মুছিয়ে-মাছিয়ে, সেইরকম, অথচ মুখে হাসি হাসি ভাবটাও ছিল। ওঁদের তিনটে ছেলেমেয়ে তখন এদিকে ওদিকেই খেলে বেড়াচ্ছিল। সেই কালো গোঁফওয়ালা ভয়ংকর মাস্টারমশাইকে কীরকম আদুরে আর ছেলেমানুষের মত লাগছিল, আমি হাঁ করে দেখেছিলাম, যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তখন মাস্টারমশাইকে ভয় করছিল না। তারপর থেকে, কোন কারণে উনি রেগে গিয়ে বকলে, আমার এই ব্যাপারটা মনে পড়তো, মনে হত, রাগী লোকটা যেন আসল লোক না, সেই লোকটাই আসল। এখন যেমন মনে হয়, সেই ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন একটা প্রেম প্রেম—ভালবাসাবাসি জড়িয়ে আছে, যেটা আমরা ভাবতেই পারি না—মানে, আমরা তো অন্যরকম ভাবি, আর বুঝি, আমাদের যেমন প্রেম করার রকম-সকম একেবারে অন্য রকম, তার জেল্লাই আলাদা, ছবির মতন। বয়স কাঁচা না হলে আবার ভালবাসা কী, যেন ওটা আমাদের হয়, যে জন্যে এক-এক সময় আমার মনে হয়, প্রেম

করাটাও একটা ফুটানি করার মতই ।··· আচ্ছা; আমি যদি নিরাপদবাবুর মতই একটা সাধারণ মানুষ হই—শিখা হয়তো আমার পিচুটি সিকনি মুছিয়ে দেবে না—না না, তা অবিশ্যি জোর করে বলা যায় না, ওর মধ্যে আবার একটা কীরকম আছে, হয়তো দিতে পারে, মাস্টারমশাইয়ের বউয়ের মতই হয়তো আমাকে ভালবাসবে । লোকে হয়তো বলবে, শহরের একটা এঁটো মেয়েকে, নিজের দাদাদের এঁটো মেয়েটাকে—নাহ্, কী বিচ্ছিরি একটা ভাব লাগে এসব ভাবলে, ইচ্ছা করে বাইকটা নিয়ে লাফ দিয়ে উঁচুতে উঠি, আর ঠাস করে রাস্তায় পড়ে, ছেতরে ছরকুটে মরি । কিন্তু আমি—আমিই বা কী একেবারে নৈবেদ্যের আস্ত কলাটি । লোকেরা কী না বলে, বলুক গে, আমি তো জানি, লোকেদের বলার থেকে শিখা অনেক বেশী, অনেক বড়—কারণ ও যদি আমাকে মাস্টারমশাইয়ের বউয়ের মতন ভালবাসে—যেখানে কোন লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই, আর আমি চাকরি করি—আমাদের কয়েকটা ছেলেমেয়ে—আমি একটা সাধারণ মানুষ—কী রকম সেই অনশনের দিনের মত মনে হচ্ছে, খবরদার আমাকে কেউ ছুঁতেও পারবে না—কাজ করি, খাই, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকি··· । কিন্তু রমেশ আমার দিকে ওভাবে তাকাচ্ছিল কেন ; ও কি আমার থেকে ভাল !

এখন আমার মনে পড়ছে, মেজদা একদিন আমাকে বলেছিল, গুণ্ডামি না করে খেটে খা, খেটে খা ।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তাতে তোর কী সুবিধা ।' ও বলছিল, 'যেদিন খেটে খাবি, সেদিন আমাদের দলের মর্ম বুঝবি ।' আমি বলেছিলাম, 'কেন, তোরা কি খেটে খাওয়া মানুষদের দল করিস নাকি ।' 'নিশ্চয়ই ।' 'ওসব, শালুককে গিয়ে গোপাল ঠাকুর চেনাস । তুই ঘরে বসে স্যাণ্ডউইচ প্যাঁদাবি, এদিকে ওদিকে মাল মেরে বেড়াবি, আর আমি খেটে শুকনো বাসো রুটি চিবুবো, আর তোকে নেতাগিরি করতে দেব, তা মোটেই ভাবিস না ।' ও যেন বেশ মজা পেয়ে হাসছিল, বলেছিল, 'কী করবি ?' 'কেন, খেটে খাওয়া মানুষদেব কী ভাবিস তোরা, তোদের চ্যাঙ নাকি যে, তোরা নেতাগিরি না করলে তাদের চলবে না । তাদের নেতা তারাই হবে ।' ও বলেছিল, 'গাধা, বুলি তো শিখেছিস মেলাই, আমরাও তো তাই চাই ।' আমার একেবারে ফ্যাক করে থুথু ফেলতে ইচ্ছা করছিল, বলেছিলাম, 'চাস নাকি, মাইরি, ছত্যি ! তোর এই কাঠামোয় ? যা পান্‌সি চালাচ্ছিস চালা, ওসব বলতে আসিস না । মনে করেছিস, এই করেই চালিয়ে যাবি, আর বাকীরা চোখে ঠুলি এঁটে থাকবে ।' বলে অ্যায়সা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়েছিলাম না, জাদুর চোখে একেবারে আগুন জ্বলে উঠেছিল । চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, 'নোঙরা, ইতর ।' 'আর তুই একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা, ভারী স্‌সভ্য ।' ওর যে আর কিছু বলার ছিল না, তা জানতাম, তাই গালাগালি দিয়েই সরে গিয়েছিল । সে কথা আমার এখন মনে পড়ছে—হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ, মানে খেটে খাওয়া মানুষ আমি যদি হই, তখনো ওদের কারুর মোড়লি মানতে আমি রাজী না ।

খেটে খাওয়া গরীবদের সবাই রাজা করে দিচ্ছে। যাত্রার দলের সঙের মত, খালি তলোয়ার ঘোরাচ্ছে আর তড়পাচ্ছে—কিন্তু দেখ ময়দানে সে নেই। যেন খালি পার্ট বলে হাততালি নেবার তাল, মুখে বুলি মেরে যাচ্ছে, শুনলে মনে হবে, কালকেই গরীবদের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। যেন চিরদিনই কিছু না করে হাততালি পেয়ে যাবে, আর খেটে খাওয়া গরীবেরাও চিরদিন ওদের কথায় আশায়-আশায় কাটিয়ে দেবে। গরীব লোকেরা সব বোকা, তোমাদের চেনে না, না? দিব্যি রসেবশে চালিয়ে যাচ্ছে, দূর থেকে ফতোয়া দিচ্ছে, গরীবেরা উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে। যেন গরীবেরা জানে না, তাদের জন্যে পূর্ণেন্দু রমেশের মত লোকেরা লড়ে দেবে না, নিজেদের জন্যে তারা নিজেরাই লড়বে। নিজের পেটের ক্ষুধা, অন্যের খাওয়া দিয়ে ভরে না। স্‌সাহ্‌ খচ্চর! কিন্তু শুটকা হারামজাদা গেল কোথায়, আশেপাশের একটা দোকানেও তো দেখতে পাচ্ছি না, ওদের ওই সভার মধ্যেই ছিল নাকি।…কিন্তু এ আবার কোথায় চলে এলাম, হঠাৎ এদিকে চলেছি কেন। আজ তো বাজারের দিকে বা বাজারের মহাজনদের কারুর সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবিনি, তবু দেখছি, সেই রাস্তাতে চলে এসেছি। এ রাস্তায় আসতে আমার ঘেন্না করে, এমন জঘন্য রাস্তা-ভিড় আর ধারে ধারে রাস্তা জুড়ে যমপেয দোকান, যেন গোটা রাস্তাটাই গিলে বসে আছে। বাজারের এই রাস্তাটা দেখলে মনে হয়, লোকেরা কেবল খেয়ে পরে বাঁচবার জন্যেই হন্যে হয়ে আছে, খালি কিনছে—জামাকাপড়,খাবার, যেন কোন অভাবই নেই, পয়সা টগবগাচ্ছে, আর ঘরে গিয়ে দেখ, হাঁড়িতে ইঁদুরের ডন। তা করুক গে, কিন্তু লোকজন চলাফেরা করবে তো, রাস্তাটা তো আর বাজার না যে, মেয়েরা মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে খিক খিক করে হাসবে আর ছিট কাপড় দেখবে , খাবার গিলবে, আর ছোঁড়ারা এপাশে ওপাশে ভিড় জমিয়ে হিড়িক দেবে। কোন কোন মহাজনের কাছে যাবার জন্যে, এ রাস্তায় আমাকে আসতে হয়—মালকড়ির জন্যেই আসতে হয়, কারণ শহরের যে-সব কাঁচাখেকো দেবতাদের ঠাণ্ডা রেখে, মহাজনদের স্বাধীন ব্যবসা চলে—চুরির স্বাধীনতা যাকে বলে, খুশি খুশি দর, নেবে তো নাও, নইলে কাটো, ওসব আইনকানুন দেখিও না, ওসব আমার ট্যাঁকে বাঁধা, এরকম রোয়াবে ব্যবসা চালাতে হলে যাদের পুজো দিতে হয়,আমি তাদেরই একজন। ওই সেই ভদ্দরলোকের চুক্তি যাকে বলে আর কি, এরকম চুক্তি না থাকলে কি ভদ্দরলোকদের চলে!

কিন্তু আমার তো আজ সেরকম কোন মহাজনের কাছে আসবার কথা ছিল না। তবু কেন যে এ রাস্তাটায় ঢুকে পড়লাম জানি না। নাহ্‌, মাথার কোন ঠিক নেই, শিখার মুখটা খালি মনে পড়ছে, আর অন্য সব কথা—তা-ই ঠিক জানি নাকি কী সব কথা। এলোমেলো সব কথা, যেমন শিখার সেই কথাটা, 'আমার কী রকম ভয় হয়' অথবা 'আমি তো একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ে।' মোটর বাইকের চিৎকারে অনেকে ফিরে তাকাচ্ছে, রাস্তা করে দিচ্ছে, কিন্তু যেন সেই রাস্তায় শুয়ে থাকা কুকুরের

মত, গা নেই, তবু উঠতেই হয়, আর ভিতরে ভিতরে দাঁতে দাঁত পেষে, মনে মনে গালাগাল যা দেয়, চেহারা আর জামাকাপড় দেখলে তা বিশ্বাসই করা যায় না, এত খারাপ। তবে, সেই কী বলে, 'মার্জিত রুচিবান' মানুষ তো সব, তাদের বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। তবে, আমার কাঁচকলাটা, এঞ্জিনের আওয়াজটা আমি আরো বাড়িয়ে দিই, যাতে ভয় পেয়ে সরে যায়। তবে, এর মধ্যেই কেউ কেউ ডাকাডাকি করছে, 'সুখেন', 'সুখেনদা'—না, বসবার জন্যে না, জানান দেবার জন্যে, তারা আমাকে দেখেছে, বেশীর ভাগই দোকানদার, আমি হাত তুলে তাদের জবাব দিয়ে, এগিয়ে চলেছি—কিন্তু আচ্ছা, আমি কেন এরকম হলাম—মানে এইরকম একটা লোফার গুণ্ডা—সবাই ভয় পায় আর ঘেন্না করে—একমাত্র একজন ছাড়া। আমি বুঝতে পারি, আমাকে সবাই তা-ই করে, ভয় আর ঘেন্না, যেন তারা সবাই ভাল, ভাল ভাল কথা ভাবে, চিন্তা করে, ভাজার মাছটি উল্‌টে খেতে জানে না, রাজ্যের যত খারাপ কাজ, সব আমি একলা করছি, আর ওরা সব দেশটার মঙ্গলস্‌সাধন করছে। তবু যদি গোপালঠাকুরগুলোকে না চিনতাম, কিন্তু সে যাক গে, আমি কেন এরকম হলাম, আমি কেন একটা সাধারণ বাঙালী ছেলে হলাম না, শিখা যেরকম…

ডানদিকের রাস্তায় বেঁকে গেলাম, তবু যা হোক একটু ফাঁকা—কিন্তু এ কী রে স্‌সাহ্‌, আমি কি মালের ঘোরে আছি নাকি, তা না হলে, ন' কড়ি হালদার, 'দেশটা অধঃপাতে গেল, চারদিকে অসততা, ছেলেমেয়েরা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে' এইসব বলে বলে সব সময় এগলি ওগলির মোড় গরম করে রাখে, 'গভর্নমেণ্টের উচিত'—মাইরি, কেন যে লোকটা লাট বা মন্ত্রী হয়নি, কে জানে। সবাইকে সব শিখিয়ে দিতে পারে ; সে-ই লোক কি না আমার দিকে চেয়ে চেয়ে গলে যাওয়া ভাবে হাসছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আবার হাত তুলে থামতে ইশারা করছে ! এ যে বাবা ইতিহা—স্‌ ! যে-লোক কোনদিন আমার সঙ্গে একটা কথা বলেনি, ছুঁচিবেয়ে বিধবাদের মত এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, যেন আমি স্‌সাহ্‌ রাস্তার পেঁয়াজের খোসা, মাছের কাঁটা, ডিমের খোলা ; যে-লোক সব সময় সততা আর কী যেন—হ্যাঁ, 'বিহিত করতে হবে' বলে, সে কি না আমার দিকে চেয়ে হাসছে, উহ্‌রে বাবা, হাসিটিতে যেন আবার একটু স্নেহও গলে পড়ছে, হেঁ হেঁ হেঁ, দাঁড়াতেই হয়। হালদারের কাছে গিয়ে, রাস্তার ধারে মোটরবাইক থামিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম, কী বলছেন।' ওহ্‌রে বাবা, আরো গলে পড়ছে যে হাসিতে। কী হতে পারে, কেউ পিছনে লেগেছে নাকি ন' কড়ি হালদারের, না কী রাত্রে বাড়িতে ঢিলটিল ছুঁড়ছে কেউ, ভয় দেখাবার জন্যে বা মেয়েদের জন্যে—বড় মেয়েও তো দু-একটা আছে, সে-ই একটাকে তো চিনি, প্রায় আমাদের সমবয়সী, বীণা না কী যেন নাম। শহরে খুব নামডাক অবিশ্যি সেই মেয়েটার, হিড়িক্কি মেয়ে যাদের বলে। রাস্তা-মজানো।

হেঁ হেঁ, কোথায় চললে, বাড়িতে নাকি ?'

নাদ্‌সনুদুস চেহারায়, মোটা জামা গায়ে দিয়ে, ফরসা লোক ময়লা দাঁতে হেসে এভাবে কথা বললে কী বিচ্ছিরি যে লাগে। তার ওপরে সে লোক যদি গলির মোড়ের লেকচারবাজ হয়, আবার এভাবে হাসতেও পারে, তখন কেমন যেন চোরা চোরা খচ্চর বলে মনে হয়। বললাম, 'এই ফিরব এবার আস্তে আস্তে। কিছু বলছিলেন নাকি ?'

আবার সেই গলে পড়া হাসি, আর তার মধ্যেই ফোলা ফোলা মাংসের মধ্যে ঢাকা চোখ দিয়ে চারপাশে একবার দেখে নিল। কী মতলব রে বাবা, লোকটা আমাকে দিয়ে কাউকে খুন করাতে চায় নাকি, সেই কথাই বলবে নাকি, যে-ভাবে ফাঁকা রাস্তায় আশেপাশে তাকাচ্ছে, যেন প্রাইভেট কথা কিছু বলবে। বলল, 'কাল রাত্তির থেকেই তোমাকে খুঁজছি, একটু বিশেষ দরকার, বুঝলে না ? সকালে তোমাদের বাড়িতেও গেছলাম, শুনলাম বেরিয়ে গেছ—বিশেষ দরকার, মানে—।'

আর মানে করতে হবে না, যথেষ্ট পেঁয়াজি হয়েছে, এবার বাত ছাড় তো বাবা, আসলে কী বলতে চাইছ। কিন্তু আবার সেই মানে দিয়েই বলতে থাকল, 'মানে, সব কাজ তো সবাইকে দিয়ে হয় না, হেঁ হেঁ হেঁ, দেশটা একেবারে রসাতলে চলে গেছে, সব জায়গায় দেখবে জোচ্চোরি, সে তোমার ক্যালিবার থাকুক না থাকুক, টাকা বের করলে, দিনকে রাত করতে পার …।'

মরেছে, স্‌সাহ ন' কড়ি হালদার যে আমাকেই বুঝাতে আরম্ভ করল সব—দেশ রসাতলে, টাকাই ক্যালিবার, কিন্তু ঝেড়ে কাশো না বাবা !—'তা কী আর বলব বাবা, কথাটা যখন কানে এসেছে—আমাকে কাল রাত্তিরে শশধর বোস বললে, সে বাজে কথা বলবার নয় জানো তো বাবা, খবরটাও সে নিয়ে এসেছে, সে-ই তোমার কথা বললে, বললে যে, সুখেনকে দিয়ে কাজটা হতে পারে। তাই তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি—মানে, ও সব হেঁজিপেঁজি মেনীমুখো ছেলে দিয়ে এসব কাজ হয় না। আমার ছেলেগুলো যেমন হয়েছে ! আর আমার তো বুঝতেই পারছ, হেঁ হেঁ, শরীরে পোষাবে না, তবে বীণাটার জন্যে, আমার মেয়ের কথা বলছি···।' ওহ্‌ রে স্‌সাহ্‌, মেয়ের কথা বলছে যে, তার আবার কী হল, কারুর সঙ্গে সটকে পড়েছে, তা-ই আমাকে খুঁজে দিতে হবে নাকি ! মেয়ের নাম করে, থেমে আবার চারপাশে যে-ভাবে দেখে নিচ্ছে, আবার আমার মুখটাও দেখছে—মানে আমি কী ভাবছি, কেমুন কেমুন য্যান লাগে, বাগিয়ে বসে নেই তো, এখন খসাবার তাল, অথচ নিজে কোন ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করতে পারছে না, তাই আমাকে দরকার, কারণ জানে, আমার হাতে ডাক্তার আছে—আছে মানে, আমি বললে ডাক্তার না বলতে পারবে না, টাকার বেলাতেও একটু কমসম হবে। সেই যেমন হয়েছিল, শিবু—শিবের বোন মঞ্জরীর বেলা, ওর প্রথমবার এ্যাবরসনের ব্যবস্থাও তো আমিই করে দিয়েছিলাম, যার জন্যে ডাক্তার ভেবেছিল, ওটা আমারই কর্ম, অথচ তখনো মঞ্জরীর গায়ে কোনদিন হাতই লাগাইনি, এখন যেমন

গেলেই লাগাই। তারপরে অবিশ্যি আরো দু' বার না তিন বার খালাস করতে হয়েছে, আর ডাক্তারও সেই একই—সেই ডাক্তার, অনশনের সময় যে আমাদের দেখাশোনা করেছিল। তবে মঞ্জরীটা একটা বলের মত, দেখলে কিছু বোঝা যায় না, কোন রকমেই না। মঞ্জরী ছাড়াও কয়েকজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যে জন্যে ডাক্তার আমাকে খুব পেয়ার করে, আর সেই কথাটা হয়তো ন' কড়ি হালদার শুনেছে, তাই এখন বীণার জন্যে—'বে-থা তো আজ অবধি দিতে পারলাম না, যা দিনকাল পড়েছে, এদিকে ছেলেদের মেলাই বক্তিমে শুনবে, সব মুখেন মারিতং জগৎ, পণ ছাড়া বে করতে বল, অমনি গুটি গুটি সরে পড়বে, তার ওপরে আবার মেয়ের রূপ চাই, গুণ চাই, নিদেন ইস্কুল ফাইনাল পাশ না হলে তো, সে মেয়ে জাতেই উঠল না। তা আমার তো আর পণ দিয়ে বে দেবার ক্ষ্যমতা নেই, কোনরকমে একবার যদি ইস্কুল ফাইনালটা পাশ করাতে পারি, হেঁ হেঁ হেঁ ...' হেঁ হেঁ হেঁ, তো আমি কী করব! কী খিস্তি যে করতে ইচ্ছা করছে না, অথচ লোকটা কোনদিন ডেকে কথা বলে না, তাই কাঁচকলা দেখিয়ে কেটে পড়তেও পারছি না, তা ছাড়া মালটিকে একটু বোঝাও দরকার, কিন্তু আমি তো আর ইস্কুল ফাইনাল পাশ করিয়ে দিতে পারব না। লোকটা কী আমাকে পড়াতে বলবে নাকি, মরেছে স্‌সাহ্‌, বীণার মুখটা এখন আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, ড্যাবরা ড্যাবরা চোখ, ছোট মত একটা নাক—হ্যাঁ, ওর নাকটা বোঁচা বোঁচা, অথচ ছোট ছোট মনে হয়, পাতলা পাতলা ঠোঁট আর লম্বা চিবুক, ঠিক বাঙলা পাঁচ-এর মত লাগে মুখটা, দেখলেই মনে হয়, ইস্কুল ফাইনাল তো অনেক দূরের কথা, ওর দ্বারা প্রেম করাও হবে না, কেমন যেন ভিখিরিদের মত লাগে ওকে, একটা কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব, যেন ও একটা দুঃখিনী মেয়ে, দেখলে কষ্ট হয় ... 'আর অনেক বছর তো হয়ে গেল ঘষতে ঘষতে, বয়সকালের একটা ইয়ে আছে তো, এদিকে দেখতে তো ক্রমেই বুড়ি হয়ে যাচ্ছে, কোন্‌দিন কী একটা করে-টরে বসবে, একেবারে মাথা কাটা যাবে, সেই জন্যেই বুঝলে তো বাবা, ছেলেমেয়েদের সব সময়ে একটা কিছুতে লাগিয়ে রাখতে হয়। আমিও তাই রেখেছি, কিন্তু, তুমি বাবা এ মওকাটা আমাকে ধরিয়ে দাও, মানে তুমিই পারবে!'

ন' কড়ি হালদারের গলা আরো চেপে এল, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল, বললো, 'আমি খবর পেয়েছি, ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কলকাতায় লুকিয়ে বিক্রী হচ্ছে, একশো টাকায় সব পেপার, বুঝলে তো। আজকের মধ্যে না হলে আর পাওয়া যাবে না, ফুরিয়ে যাবে। এখন মুশকিল হয়েছে, ওসব লোকজন ঘাত্‌ঘোত্‌ আমি তো জানি না, শুনলাম, তোমার দাদা কেশব সব জানে—আর সে তো জানবেই, ওদের দলের ক্ষ্যামতা বেশী, ওপরের সব বড় বড় ব্যাপারে ওদের হাত আছে, মানে প্রশ্নপত্র বের করতে হলে, ওদের হাত না থাকলে হয় না, ওদের দয়াতেই তো সব ...।'

যত শুনছি, আমারই ভিরমি খাবার যোগাড়। মোড়ের লেকচারবাজ ন'

কড়ি হালদার, স্‌লা মহাস্‌সত্যবাদী, একটি অন্যায় বা খারাপ কথা বলেছ তো তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে, এমন গরম গরম বাত ছাড়বে, সে কিনা চোরাই প্রশ্নপত্র কিনে এনে দিতে বলে মেয়ের জন্যে। ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল, এই লোক কিনা ছুঁচিবেয়ে বিধবাদের মত, আমাকে পেঁয়াজের খোসার মত ডিঙিয়ে চলে। আমি বললাম, 'তা হলে কেশবকেই বলুন না, ও-ই তো এনে দিতে পারবে।'

'হেঁ হেঁ হেঁ, সেটা বাবা একটু ইয়ে লাগছে, মানে, আমি আবার বলতে যাব, এই আর কী। তোমার হাত দিয়েই যদি হয়ে যায়, মানে, আবার কলকাতায় যাওয়া-টাওয়া, তার চেয়ে তুমিই যদি খবরটবর নিয়ে একটু এনে দাও। তুমি ঠিক পারবে। তোমার ওপর ভরসা করা যায়, বুঝলে না। যেমন করে হোক, এই মওকাটা ···।'

বুয়েছি বাওয়া, তুমি ডুবে ডুবে জল খাবে, শিবের বাবাও টের পাবে না, যে কারণে আমাকেই বেছে নিয়েছ। কেশব নেতা, ক্ষমতাবান, ভদ্রলোক, তার কাছে গিয়ে নাক কাটার চেয়ে গুণ্ডাটাকে কাজে লাগানোই ভাল। কোনদিন যদি কথাটা ফাঁসও হয়, তখন অস্বীকার করলেও চলবে, 'আরে দূর, গুণ্ডা বদমাইসের কথায় কেউ কান দেয়' এই রকম বলবে, শহরে ন'কড়ি হালদার যে ভদ্দরলোক সেই ভোদরলোকই থাকবে। হুম্‌, ওদিকে মোটা জামাটার পকেটে টাকার কর্‌কর শব্দও শোনা যাচ্ছে, টাকা বের করছে। বললো, 'সব টাকাটাই তোমাকে দিয়ে দিলাম, একশো টাকা, আজকের মধ্যেই এটা তোমাকে করে দিতে হবে।'

লোকটার কোন তন জ্ঞান নেই দেখছি। আমি যে আমি, তাও ভাবছি টাকাটা নেব কিনা, আব লোকটা জীবনে আমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলেনি। আজ একশোটা টাকাই হাতে তুলে দিচ্ছে, একে কী বলে, বুঝতে পাবি না। একেই বোধহয়, সেই কী বলে, লোভীর মরণ, না কী জানি, না কি প্রাণের দায়ে আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নেই—তো দে স্‌সাহ্‌। আমি কী করব, আসছে যখন নিয়ে নিই, তারপরে দেখা যাবে, কাকে বল প্রশ্নপত্র, কোথায় তা পাওয়া যাচ্ছে। দেখছি, পুরো একশো টাকার একটা নোট—মুখটা আমাকে একটু ইয়ে করতেই হয়, মানে খুবই সীরিয়াস ভাব, এত বড় একটা কাজ, বীণা ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে, চোরাই প্রশ্নপত্র থেকে আগেই সব দেখে রাখবে, তারপরে কে ঠেকায় পাশ, একেবারে স্‌স্বামীর ঘরে চলে যাবে। টাকাটা নিয়ে, পকেটে গুঁজতে গুঁজতেই মোটরবাইক স্টার্ট দিই আমি, একবার শব্দ করি, 'আচ্ছা', কিন্তু ন' কড়ি হালদার যে কী বললো, ইঞ্জিনের হাঁকাড়ে তা ডুবে গেল, আমি এগিয়ে চলে গেলাম। উস্‌, কী রাস্তা পাড়ার মধ্যে, প্রায় নাচতে নাচতে চলেছি, কিন্তু আশ্চর্য, অন্ধকারের মধ্যে যেমন মেঘ করলে, অনেক দূরে—অনেক দূরের আকাশে চিরিক্‌ চিরিক্‌ করে বিদ্যুৎ চমকায়, আমার ভিতরে যেন সেই রকম হচ্ছে। তার মানে, ওই সেই কথাটাই, আমি আর যেন ঠিক থাকতে পারছি না, কোথায় একটা গোলমাল লেগে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে,

আমার চারপাশে কারা যেন ঘোরাফেরা করছে, ছায়া ছায়া মত, অথচ চোখে দেখতেই পাচ্ছি, কেউ নেই, তবু মদ খাওয়ার খোয়ারির মত একটা ব্যাপার যেন। শিখার মুখটাই আবার আমার মনে পড়লো, আর ওর কথাগুলো, 'কিন্তু কেন তুমি একটা সাধারণ ছেলে হলে না', অথচ, তাই যদি আমি হতে পারি, তবু দাদাদের কারুর বিষয় কিছু বলতে পারব না। কেন, এটা আবার কী রকম ব্যাপার যে, গুণ্ডা না, বদমাইস না, একটা অর্ডিনারি লোক। কোন্ দলের লোকেরা কী কী শয়তানি করছে, তা বলতে পারবে না, যেন তারা সব গরু ভেড়া। কারুর মন্দ ব্যাপারে কিছু বলত পারবে না। তার মানে, একমাত্র দল থাকলে, কোন দলের লোক হলে, অন্য দলের লোকদের গালাগালি দিতে পারে। যেমন পূর্ণেন্দু দেয়· কেশবকে বা এ ওকে, কিন্তু তুমি চুপ করে থাক। তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। ব্যাপারটা কি এরকম নাকি, শিখা কি তা-ই বলছিল। ওর কথা থেকে, ঠিক তা তো মনে হয় না, বরং ওর কথা থেকে এই মনে হয়, ব্যাপারটা যেন খুব কঠিন। আর সত্যি, কঠিন তো বটেই, কারণ আমি তো ঠিক জানিই না, কী করে একটা সাধারণ মানুষ হওয়া যায়, কারণ, সাধারণ মানুষ মানে, সব ছেড়েছুঁড়ে টাটের ঠাকুর হয়ে বসে থাকা না। যেমন কি না, শিখার বাবাকে যদি কেউ সাধারণ মানুষ বলে—অসম্ভব, ওরকম একটি ফেরেববাজ রাম খচ্চর লোক তা হতেই পারে না, কিন্তু লোকটাকে তো সাধারণ বলেই মনে হয়। আসলে, আমি যাদের দেখছি, যাদের কথা ভাবছি, তারা কেউ শিখার সেই 'সাধারণ লোক' না। যেমন নিরাপদবাবু, অনেকটা সাধারণ মানুষ বলেই মনে হয়। একটা লোক, সারা জীবন মাস্টারি করলেন, চুরি জোচ্চোরি বা ইস্কুলের পয়সা চুরি, কারুর পিছনে লাগা, মাস্টারি করতে করতে অন্য কোনরকম ব্যবসা করা, যা অনেকেই করে—বই বিক্রী করা থেকে সুদ খাটানো, কিছুই না, যেটা ভাবাই যায় না, এরকম একটা লোক থাকতে পারে। অন্ততঃ কিছু না হোক, অন্য মাস্টারদের হিংসে করা, ছাত্রদের বাপ মাকে বা ইস্কুল কমিটির কাছে কোন মাস্টারের নামে লাগানো, যে-সব আখচারই ঘটছে, সে সবও ওঁর সম্পর্কে কেউ শোনেনি। জামাকাপড় চিরদিন একরকমই দেখলাম, কোনদিন যে একটু সাজগোজ করেছেন, তাও দেখিনি, সিগারেট বিড়ি খান না, অন্য কোন নেশা তো অনেক দূরের কথা, এক বউ ছাড়া কোন মেয়েমানুষের কথা ওঁর ব্যাপারে ভাবাই যায় না, কেউ কোনদিন শোনেনি। এই সমস্ত ব্যাপারটাই তো আমার কাছে ইম্‌পসিবল্ বলে মনে হচ্ছে। অসম্ভব, একটা মানুষ কী করে এরকম হতে পারে, সারা জীবন কাটাতে পারে, আমি ভাবতেই পারি না। আমাকে ওরকম হতে হলে, আমি মরেই যাব। কী করে ওরকম হওয়া যায় জানি না। মাস্টারমশাই অনেকটা শিখার 'সাধারণ মানুষের' মত। কেননা, রমেশ যখন মাস্টারদের টাকাটা মেরে দিল, তখনো উনি কিছুই বললেন না। হয়তো মনে মনে খুব রাগ করেছিলেন, কষ্ট পেয়েছিলেন, কারণ আমাকে যখন চুপি চুপি ব্যাপারটা বলেছিলেন, তখন

ওঁকে কী রকম কাঁদো-কাঁদো লাগছিল। রাগের থেকেও অনেক সময় ওরকম হয়। কিন্তু শিখা যে বলেছিল, 'নিরাপদবাবুরাই বা কী রকম লোক, ওঁরা ছাড়লেন কেন,' যে-কথা থেকে মনে হয়, সাধারণ মানুষেরা তা ছাড়ে না, একটা সাধারণ মেয়ে হিসাবে শিখা হলেও ছাড়তো না। তার মানে, সাধারণ মানুষ—কিন্তু, একি, কারখানার রাস্তায় কখন চলে এলাম আবার। আমি তো এখন এ রাস্তায় আসবার কথা ভাবিনি বা কারখানায় কারুর সঙ্গে দেখা করবার চিন্তাও করিনি—ওহ্ বাবা, কেশববাবুদের দল যে পোস্টার সাঁটছে দেখছি দেওয়ালে। গাড়িটা থামালাম, পোস্টারটা পড়লাম। 'আগামীকাল প্রকাশ্য অধিবেশন, দলে দলে যোগ দিন।'…হুম্, তার মানে আগামীকাল শহরটি গরম। ওদিকে হরতাল, এদিকে প্রকাশ্য অধিবেশন, একেবারে জমজমাট ব্যাপার। যে দুজন পোস্টার লাগাচ্ছিল, দুটোকেই চিনি, বড়বাবুর চেলা, আর একটা সেই কিষেণ, যেটাকে জুয়ার আড্ডায় একদিন পেঁদিয়েছিলাম। এসব কাজের জন্যে, কেশবের এরাই চেলা—কিন্তু বড়বাবুটি গেলেন কোথায়, এখনো চোরাই মাল সামলাতে ব্যস্ত নাকি। কাল রাত থেকে তো মাথার ঠিক নেই—কিন্তু শুটকাটা গেল কোথায়—ওকে তো আমি বলতে বারণ করেছিলাম, কারণ আমার কী কাঁচকলা যায় আসে, কারুর চোরাইমাল আছে না আছে। আমার পেছনে লাগতে এলে আমি বলব।

গাড়ির মেশিনটা চালু থাকায়, শব্দ পেয়ে কিষেণরা তাকালো, আর তাকাতেই ওদের দুজনের চোখ দুটো ঠিক রমেশদার মতই জ্বলে উঠলো, যেন আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। আবার দুজনে বিড়বিড় করে কী যেন বলাবলি করছে, স্‌সা, চোরের দালালি করছে, তার আবার কুলোপানা চক্কর। 'হেই কিষেণ, কিসের পোস্টার লাগাচ্ছিস রে' ডেকে জিজ্ঞেস করলাম।

বেশ তেরিয়ান হয়ে, ঝেঁজে জবাব দিল, 'চোখ থাকে দেখে নাও।'

আচ্ছা, খুব রোয়াব দেখছি, আবার চোখ পাকিয়ে দেখছে, স্‌লা—কিন্তু আমার ঘাড়ের কাছটা এরকম শিউরে উঠছে কেন, আবার, আর যেন শিরদাঁড়ার কোথায় একটা চিক চিক করে কেঁপে গেল। কেন, এরকম হচ্ছে কেন, শিখার মুখটা আমার মনে পড়ছে, আর ওর সেই কথাটা, 'আমার কী রকম ভয় হয়।' একটা কীরকম অস্বস্তি হচ্ছে, তবু আমি মাটি থেকে পা তুলে নিতে নিতে বললাম, 'খুব বেড়েছিস মনে হচ্ছে।' বলে চলে যেতে শুনলাম, 'তুমিও বেড়েছ, তোমারও বেশী দিন নেই আর।' আচ্ছা, হবে, জবাব পরে হবে, কিন্তু আমি দেখছি সেই কারখানাতেই এলাম, গেলাম একেবারে সোজা অফিসের কাছে।

মোটরবাইক রেখে চোপরার চেম্বারে গেলাম, ঠাণ্ডা ঘর, বেশীক্ষণ থাকলে শীত করে। আমাকে তো আটকাবার কেউ নেই, দারোয়ান না, বেয়ারা না, চোপরার হুকুম, আমার অবাধ গতি। লোকটা বাঙলা বলে মন্দ না। এমনিতে দেখলে মনে হয়, বেশ ঝক্‌ঝকে চোখা মানুষ, কিন্তু ওর

আমি ক্ষ্যাপা বাঘের চেহারাও দেখেছি, চাকরি রাখতে সব করতে পারে। এখনো সাহেবের লাঞ্চ টাইম হয়নি দেখছি। বাড়িতে তো যায় না, খানা চোপরা-বউদি এখানেই পাঠিয়ে দেয়—তবে একটাই যা রেয়াত, চেম্বারে বসে মাল খায় না, ওটা ছুটির পরে—সন্ধ্যাবেলায়। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, 'হ্যালো সুখেন, এখোন কী মনে কোরে, বস বস।'

'এই—এদিক দিয়ে যেতে যেতে একবার এসে পড়লাম।'

'হালচাল ?'

'খারাপ, কাল তো হরতাল।'

'সে তো জানি।'

'চালাবেন নাকি !'

'ইচ্ছে তো আছে, তবে তোমরা কোন মদদ দেবে না তো কী কোরে হোবে। তোমার বড়দার দলের সঙ্গে মেজদাদারা লড়ছে, আমরা মার খাচ্ছি।'

খচ্চর। এ ছাড়া কিছু মনে আসে না আমার, তোমরা সব সাধু, তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছ। চালিয়ে যাও, যদ্দিন এই দুই দাদারা আছে ; চিরদিন এই চার হাজার টাকা মাইনে, আরো অনেক আমদানি, মেলাই র‍্যালা রপোট চলবে না। তবে আমার এসব কথা আজ ভাল লাগছে না, বললাম, 'আমাকে একটা চাকরি দেবেন !'

চোপরা হেসে উঠলো, 'ইউ আর আসকিং সামথিং নিউ, উম্ ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, ভাবছি একটা চাকরিবাকরি করব।'

'কেনো, তোমার টাকার কম হচ্ছে নাকি।'

'না, তার জন্যে না, আর এসব ভাল লাগে না।'

চোপরা বোম্বাই হিরোর মতন হেসে উঠলো, বললে, 'সচ ? ক্যায়া বাত বোলা তুম নে। তোমার বাবা এতো বড়লোক, তোমার দাদারা এতো বড় লীডর—'

আমি বলে উঠলাম, 'তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো গুণ্ডা।'

চোপরা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করবার মত শব্দ করলো, 'উম্ ?' তারপরে যেন অবাক হয়ে বললো, 'তুমি গুণ্ডা আছে ? না না না, আজ তোমার মেজাজ খারাপ আছে, তা-ই ও বাত বলছে। তোমাকে লোকে কতো রেসপেক্ট কোরে, ভয় পায়।'

শুয়োরের বাচ্চা, এই কথাই আমার মনে হচ্ছে, তবু আমি বললাম, 'কিন্তু এসব আর আমার ভাল লাগছে না।'

'কেনো, আমাদের তোমাকে ভাল লাগে। আমরা তোমাকে মদদ দেব সব সময়।'

কথা বলছে না, যেন ঠোঁট বাঁকিয়ে ভেংচাচ্ছে, আর ঘাড় নাড়ছে। আমি বললাম, 'সেইজনেই তো আপনাদের কাছেই একটা চাকরি চাইছি।'

চোপরা হাসতেই লাগলো, আর আমার দিকে বারে বারে তাকাতে

লাগলো—যে তাকানোটা আমার একটুও ভাল লাগছে না, কারণ মনে হল, সেখানে হাসির হা-ও নেই, একটা অন্যরকমের চাউনি, যে চাউনি দেখে আমার আবার যেন ঘাড়ের কাছটা কেমন শিরশির করে উঠলো, সেই রকম শিউরোনি ভাব। চোপরা আবার বললো, 'তোমার মেজাজটা কেনো খারাপ আছে।'

'কিছু ভাল লাগছে না।'

'আমাদের ক্লাবে যাও না একবার।'

মাল খেতে যেতে বলছে। মন্দ হয় না একবার গেলে, ওর অ্যাকাউন্টেই প্রচুর গিলে আসা যায়, আর আমি গেলে, এই অসময়েও বেয়ারা ঠিক খুলে দেবে, কিন্তু আমার যেন কেমন, কিছুই ঠিক ভাল লাগছে না। বললাম, 'এখন যাব না।'

'রিয়ালি, ইউ আর আসকিং ফর এ সার্ভিস?'

'সত্যি।'

'হুম্।'

চোপরা হঠাৎ গম্ভীর হল, চোয়াল দুটো শক্ত করলো, যেন সত্যি ভাবলো কিছু, কিন্তু কিছুই বললো না, কেবল একটা ফাইল দেখতে লাগলো চুপচাপ। এরকম একটা ভাব—একেবারে নতুন লাগছে আমার কাছে, এরকম, আমাকে সামনে বসিয়ে রেখে, চুপচাপ ফাইল দেখে যাওয়া, স্সাহ্ যেন আমি ওকে চিনি না। আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, 'এখন চলি তা হলে।'

'হুম্, পরে কোথা হবে!'

স্লা, মুখই তুললো না। আমি চেম্বারের দরজাটা টেনে ধরে, আবার ওর দিকে ফিরলাম, আর তৎক্ষণাৎ, দেখলাম, চোখ দুটো কুঁচকে, খুঁচিয়ে আমাকেই দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই বললো, 'কী?'

আমি বললাম, 'ওবেলা আসব আমি।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে।'

যেন তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত, অথচ আমি এলে, কত কথা জিজ্ঞেস করে, উঠতে চাইলে খালি 'বস বস' করে, হঠাৎ যেন গিদ্ধড়টার কী হয়ে গেল। চাকরি করতে চাই শুনে যেন লোকটা বিগড়ে গেল—তার মানে, আমার আবার চাকরিবাকরি, এ সব কী, আমি তো একটা গুণ্ডা, ওটাই আমার চাকরি। বাইরে বেরিয়ে আমি মোটরবাইক স্টার্ট দিয়ে কারখানার ভিতর থেকে রাস্তায় এসে পড়ি।



কিন্তু কী, ব্যাপার কী, সকলেরই যেন চোখ জ্বলছে। কেন, সব কি বাঘ হয়ে গেছে নাকি, আমাকে ছিঁড়ে খাবে? বিম্‌লেটা তো ঠিক সে ভাবেই

যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কারখানার খাবার ছুটি হয়েছে। তাই অনেকেই বাইরে। ছোটখাটো চায়ের দোকানগুলোকে ঠিক গুড়ের ওপর মাছির মত ছেঁকে ধরেছে। বিম্‌লে—ভাল করে বললে বিমল—বিমল ব্যানার্জি, আসলে বিম্‌লে-ই। ওর চেহারা চরিত্র ফিটার মিস্তিরির কাজ, সব মিলিয়ে, তা ছাড়া আর কিছু না। সেই জন্যেই তো পূর্ণেন্দুদের গরীবদের দলের, ও হল—কী যেন—উস্—কী যেন কথাটা—হ্যাঁ, লড়াক্কু ! আসলে বাঁড়ুজ্জেদের আকাট মুখ্‌খু ছেলে, ছেলেবেলা থেকেই কারখানার কাজে লেগে গিয়েছে। ওর কেরানী বাবা আর দোকানদার দাদা আবার অন্যরকম। তারা সব ভদ্দরলোক, আর বিম্‌লে ছোটলোক। ও হল খাঁটি গরীবদলের লড়িয়ে, দলের মধ্যে ওব খুব খাতির, কেননা, ওদের তো গরীবদের দল, আর বিম্‌লে তেলকালি মাখা হাফপ্যাণ্ট পরে, তেলকালি মাখা ছেঁড়া জামা গায়ে দেয়, কচর কচর পান চিবোয়, লাল ছোপ ধরা দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরে নাকের পাটা ফুলিয়ে, ও চিৎকার করে বক্তৃতা দেয়, 'বন্ধুগণ, আমরা সবাই এক। আমরা গরীবরাজ কায়েম করব, শেষ লড়াইয়ের জন্যে আমরা তৈয়ার।' ওহ্‌রে বাস্, কথা শুনলে মনে হয়, করলো বলে, কিন্তু আমি ভাবি, ওরা গরীবদের নিয়ে নিজেরাই যে সব বাত মারে, তার সঙ্গে বিম্‌লের মিল কোথায়। রাত পোহালেই তো তুই নেয়েধুয়ে, পৈতাটাকে ঘস্ ঘস্ করে মেজে ঘষে, মন্তর-টন্তর জপে পুজোয় বসিস, প্রসাদ খাস, তোর বউ তোকে পান দেয়, চিবোতে চিবোতে বউকে বলিস, 'কারখানার ধোকড়াগুলোন দাও তো।' যার মানে, ওটা হল কারখানার পোশাক, পরে ঠাকুর চললেন কারখানায়, গরীব লড়াক্কুটি, যে-কারণে ওর বাবা দাদা ওকে রেগুলার সম্মান দিয়ে কথা বলে, অর্থাৎ নেতা তো, পূর্ণেন্দু রমেশের তুলনায় তাদের ছেলে কম কিসে—একদিন হয়তো ভোটে দাঁড়াবে, চাই কী, মন্তীরও হতে পারে—লে হালুয়া ! আমি তো জানি ওদের বাড়ির সবাইকে, বিম্‌লেকেও ছেলেবেলা থেকেই চিনি, লড়াক্কুটির এখন বেজায় গ্যাস্, কারখানায় এসে সারাদিন কাজের চেয়ে বেশী বকে, তারপরে বক্তিমে-টক্তিমে দিয়ে, আবার যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তিনি অন্য মানুষ—রোজগেরে ছেলে, নেতা, ইস্তিরি সোয়ামি—ই বাব্বা, এমনি এমনি নয়, করকরে হাজার টাকা পণ, হাতঘড়ি, স্‌সোনার বোতাম নিয়ে লড়াক্কুটি বিবাহ করিয়াছেন। একঠো সাইকেল ভি মাঙিয়েছিলেন। মগর শ্বশুর মস্‌সাইয়ের ধকে কুলোয়নি। গরীব নেতাটি বাড়ি ফিরে গিয়ে, ধোয়া-মোছা করে, আদ্দির পাঞ্জাবী পরে, ঘাড়ে গর্দানে পাউডার মেখে বউকে নিয়ে চললেন সিনেমা দেখতে, পান চিবোতে চিবোতে তখন ও খাঁটি ভদ্দরলোক, 'কারখানা-টারখানার কথা এখন ছাড়'—রাজকায়েমের লড়াই এখন না—যার মানে, কী যেন বলে একে, সেই কী একটা সুন্দর কথা আছে না—আহ্, সেই যে—হ্যাঁ হ্যাঁ, যাকে বলে, দ্বৈত সত্তা। স্‌সাহ্ পানের পিচ্। আমি ভাবি, আসল গরীবেরা কি সত্যি ধোকাখোর, তারা এসব বোঝে না। কী জানি বাবা, কিন্তু খচ্চরটা

আমার দিকে ওরকম করে তাকিয়ে আছে কেন, যেন পাড়ার কুকুর বে-পাড়ার কুকুরকে দেখে কটমট করে তাকায়, আর গর্‌গর্‌ করে।

যাবার আগে আমি ইচ্ছা করেই, মোটরবাইক ঘুরিয়ে ওর পাশে একবার দাঁড়াই। এঞ্জিন বন্ধ না করেই, জিজ্ঞেস করি, 'কী রে ফটিচার। আমাকে দেখিসনি কোনদিন ?'

লড়াকুটি সব সময়ে এত লড়াইয়ের কথা বলে, যে-জন্যে আমি ওকে ওই নাম দিয়েছি। ফটিচার—মানে গুল্‌ আর বোকাবাজ। ওর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। আর পান চিবিয়ে কালো হয়ে যাওয়া মোটা ঠোঁট দুটো ঠিক ক্ষ্যাপা শুয়োরের মত করে খুলে বললো, 'দেখছি বৈ কি, তবে তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে, ফটিচার কে, সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'তাই নাকি রে ?'

'হ্যাঁ, দালালি বেশীদিন চলবে না। গরীবরা তাদের লড়াইয়েই তোর মত দুষমনকে হালাল করবে।'

ছত্যি, আ কুতু কুতু। ইচ্ছা হল, ওর গরীবের পোশাক হাফপ্যাণ্টটা নেড়ে দিয়ে, ছেলেমানুষের মত আদর করে দিই। কিন্তু তা করতে গেলে, ওদের দল এসে পড়বে। একলা পারব না—হারামজাদা শুটকা, শিবে—ওরা যে কোথায় থাকে ! বললাম, 'আর তুই তো সেই গরীব, না ? ব্যাটা লেখাপড়া শিখলি না কেন, তা হলে পূর্ণেন্দু হতে পারতিস। বিম্‌লের মুখটা সত্যি ভয়ংকর হয়ে উঠলো, আমি ওর দাঁতের কিড়মিড়ি পর্যন্ত শুনতে পেলাম, বললো, 'তোর মত লোচ্চা আর গুণ্ডার কাছ থেকে লেকচার শুনতে চাই না, তোকে আমরা—'

কথা শেষ করলো না, আর একবার দাঁত কড়মড় করলো, মানে, আমাকে চিবিয়ে খাবে। আমি হেসে শিস্‌ দিয়ে মোটরবাইক নিয়ে এগিয়ে চলে যাই, কিন্তু আমার ঘাড়ের পিছনটা কেমন শিরশির করছে, সেইরকম শিউরোনি শিউরোনি ভাব। শিখার কথাগুলো আবার আমার মনে পড়ছে, 'তুমি সবাইকেই শত্রু করে ফেলছ'—তা হবে হয়তো, তা বলে, এইসব ফটিচারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমি চলতে পারব না ; আমার চেয়ে ওরা কিসে ভাল ! যাক গে, তার কোন দরকার নেই, শিখা যাকে একটা সাধারণ মানুষ বলে, একটা সাধারণ বাঙালী ছেলে—ও যেমন একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ে, বিম্‌লে কি তাই ! কিন্তু, তা কী করে হবে, সাধারণ লোক তো আর বিম্‌লের মত একটা খচ্চর না। তবে, আচ্ছা, এটাই বা কেমন কথা যে, সাধারণ লোকেরা এদের বা কেশবদের বিশ্বাসই বা করে কী করে। সাধারণ বলতে কি তাই বোঝায় ! কিন্তু নিরাপদবাবু—কী বিচ্ছিরি ঘাড়ের কাছে শিউরোনি ভাবটা লেগেই থাকছে, ঠিক যেন, সেই ছেলেবেলায় শ্মশানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হত, যেন ভয়ংকর ভয়ংকর ভূতগুলো হাওয়ায় চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকটা যেন সেইরকমই মনে হচ্ছে আমার। শহরের প্রায় বাইরে, একটা রাস্তা দিয়ে আমি বাড়ির দিকে চললাম। এদিকে আমাদের একটা আড্ডা মারবার জায়গা আছে,

আর এখানে এসেই দেখলাম, শিবে বসে আছে। এটা একটা চায়ের দোকান—তবে, অন্যান্য জিনিসও পাওয়া যায়। থামিয়ে শিবুকে জিজ্ঞেস করলাম, শুটকাকে দেখেছে কিনা ; ও বলতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'এক পাত্তর চা হবে গুরু ?'

বললাম, 'হোক'। তারপরে একটা বেঞ্চে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। হাতটা কপালের কাছে তুলে আনতে গিয়ে দেখলাম, দুটো বাজে। আর ঠিক এ সময়েই সেই—

সেই যে একটা গুরগুরনো ভয়, না, ঘাড়ের কাছে না, আমার ভিতরটা কীরকম করে ওঠে, সেই রকম করে উঠলো অনেকদিন পরে, যে ভয়টা ভিতর থেকে গুরগুরিয়ে উঠলেই, মনে হয় হাত পা অবশ হয়ে যাবে, আর আমি মূর্ছা রুগীর মত পড়ে গিয়ে মাটি খামচে ধরে, মুখ ঘষটাতে থাকবো, ঠিক সেই রকম। ঠিক যেন মনে হল, চারিদিকটা খা খা করছে, আর কে যেন আমার ঘাড় মুচড়ে দিতে আসছে—অথচ আজ এখন তো আমি একলা ঘরে বসে নেই, কয়েকজন তো রয়েছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে বসলাম, আর তখনই দেখলাম, আমার সামনে চায়ের গেলাস, সেটাকে হাতের এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'হটাও চা, আমাকে এক পাঁট মাল দাও দয়ালদা।'

দয়ালদা, যে এ দোকানের মালিক, তাড়াতাড়ি গদির নিচে থেকে একটা রাম-এর পাঁট বের করে দিল, এক মোচড়ে মুখটা খুলে, কাঁচাই খানিকটা ঢেলে দিলাম, এক ঢোক, দু ঢোক, তিন ঢোক, চার—পাঁচ—ছ ···। শিবে বলে উঠলো, 'এই গুরু, ওরকম খাসনি মাইরি, কলিজা ফেটে যাবে।'

আমিও ওর দিকে একবার তাকালাম, হয়তো কিছু বলতাম, কিন্তু আমার সেই ভাবটা যেন কেটে যাচ্ছিল, গা-টা গরম হয়ে উঠছিল, তবু আমি বোতলের মুখটা আমার মুখে লাগিয়ে বসে রইলাম, একটু একটু খেতে লাগলাম, শিবেটা হা করে তাকিয়ে রইলো, আর দয়ালদা—সত্যি দয়ালু মাইরি, রসের দয়াল, যখন চাইবে, তখনই পাবে, দয়ালদাও আমার দিকেই চেয়েছিল, আর যে ছোকরাটা চা নিয়ে এসেছিল, সে তো একেবারে দেওয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি বোতলটা মুখ থেকে সরিয়ে, একবার দয়ালদার দিকে তাকালাম। হাসলাম একটু,আর বোতালটা শিবের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। শিবে বোতলটা নিতে নিতে বললো, 'কী হল রে গুরু, ওরকম করলি কেন ?'

'কী আবার, মাল খেতে ইচ্ছা করলো, তাই।'

'তাই বলে ওভাবে, তোর মুখটা আর চোখ দুটো দ্যাখ দিকিনি, কী রকম হয়েছে ?'

'কী রকম ?'

'লাল, আর খুনীর মতন।'

'খুনীর মতন ?'

কাকে খুন করব, তা তো বুঝতে পারছি না, আজ সকালে, সেই

প্রজাপতিটাকে ধরবার সময়, শিখাও বলছিল, আমাকে নাকি খুনীর মত দেখাচ্ছে, আমাকে খালি খুনীব মতই দেখায়। শিবে বাকী মদটা খেতে খেতে বললো, 'বাড়ি যাবি না? অনেক বেলা হয়েছে।'

'তুই কোথায় যাবি।'

'বাড়ি।'

'চল।'

শিবের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে বেশী দূরে না। ও মুখটা কুকুরের পাছার মত করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। মোটরবাইকে আমার পিছনেই বসলো, এটাই ওর আসল দরকার ছিল, আমি মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'দয়ালদা, দামটা কাল নিও।'

দয়ালদা ঘাড়টা দোলালো, জানে, ওর টাকা আমরা বিশেষ ফাঁকি দিই না, তা ছাড়া দয়ালু দাদাটির দাম একটু আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, ন'কড়ি হালদারের একশো টাকার নোটটা আমার পকেটে রয়েছে—আশ্চর্য, ভুলেই গিয়েছিলাম। বীণার মুখটা আমার মনে পড়লো, 'কী করব বীণা, তোর বিয়ের পাসপোর্ট আমি এনে দিতে পারলাম না'—পকেট থেকে নোটটা বের করে দয়ালদার দিকে ছুঁড়ে দিলাম, বললাম, 'পরে হিসাব হবে।' তবু তো মালের জন্যে খরচ হচ্ছে, এ টাকাটা মাটিতে রেখে পেচ্ছাব করতে আরো ভাল লাগতো, কিন্তু তারপরে আবার হাতে করে তুলতে হবে তো। কিন্তু বীণা—মাইরি, সেই বাঙলা পাঁচের মত মুখটা—যাচ্ছেতাই। একটা ছেলে ঘায়েল করতে পারছে না ও। কত মেয়ে তো কত কী করছে! গাড়িটা স্টার্ট দিতেই আমার আবার শিখার কথা মনে পড়লো, 'যা দিনকাল হয়েছে ...' তার মানে কী, সকলের চোখ আমার দিকে বাঘের মতন জ্বলবে! শিবে বলে উঠলো, 'একটু আস্তে চালা গুরু, কাঁচা মাল টেনে চালাচ্ছিস।'

'স্লা ভয় লাগে, নেমে যা।'

'না, তা তোর মত হাত আছে কারুর, তবে—!'

কথা শেষ করলো না ও—কিন্তু আমি ভাবছি, একটা সাধারণ মানুষ হওয়াটা কি খুব কঠিন? আমার তো যেন তাই মনে হচ্ছে, একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন শিখার মুখটা সেই কষ্টের ভাব করে বলার মতন, 'কেন তুমি একটা সাধারণ ছেলে হলে না।' কিছুই তো না, কাজ করা, খাওয়া, ছেলেমেয়ে নিয়ে আর বউ, মানে শিখার মত বউ নিয়ে, নিরাপদবাবুর মত—উহ্‌রে স্‌সাহ্‌, কী করে তা হব, ভাবতেই পারছি না। কেননা, আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা যা ভাবছি, ঠিক তা না।

'দাঁড়া।'

শিবেদের বাড়ি। মোটরবাইকটা দাঁড় করাতেই ও নেমে গেল, আমি এঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম, তাই দেখে শিবে বললো, 'কী হল, বাড়ি যাবি না?'

'না, একটু ঘুমোব তোদের বাড়িতে।'

'ঘুমোবি ? খাবি না ?'

'না, খিদে নেই।'

আমিই আগে ওদের বাড়ি ঢুকি। এককালে ওদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, এখন হাফ-গেরস্থদের থেকেও খারাপ, ওর বোনই তো মঞ্জরী। প্রকাণ্ড এই পুরনো বাড়িটা ওদের নিজেদেরই, বোধ হয় দেড়শো দুশো লোক আছে—ভাড়াটে না, ওরা নিজেরাই, অবিশ্যি অত লোক নাও হতে পারে, আমার মনে হয়। শিবে বোধহয় এখন আমাকে মনে মনে গাল দিচ্ছে—দিক গে স্‌লা, তোর খাবারে তো ভাগ বসাতে যাচ্ছি না, আমি চিৎকার করে বললাম, 'মঞ্জরী, আমাকে এক গেলাস খাবার জল দিও তো।' বলে শিবের অন্ধ কুঠরিটাতে ঢুকে পড়লাম। স্‌সাহ্‌, ব্যাঙও থাকে না এরকম ঘরে, একটা তক্তপোষ পর্যন্ত নেই, খালি মাদুর আর কাঁথা মেঝেয় পাতা। গিয়েই চিত হয়ে পডলাম, আর একটু পরেই মঞ্জরী এল একটা ফাটা কাচের গেলাসে জল নিয়ে। গেলাসটা ধরে, খাবার আগেই, মঞ্জরীর শাড়ির আঁচলটা ধরলাম—যে কাপড়টা থেকে কাপড়-কাচা সাবান আর তেলের বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছে, তারপর খেলাম। মঞ্জরী আঁচলটা টেনে বললো, 'কী করছেন, দাদা আসবে।'

'আসুক গে, দাদা কি জানে না!'

মঞ্জরীর যেন হঠাৎ খেয়াল পড়ে, বলে, 'এ কি, খেয়ে এসেছেন নাকি ?'

'কী ?'

'কী আবার। যা খান, গন্ধ বেরুচ্ছে!'

আমি মঞ্জরীর দিকে তাকালাম। সাবান আর তেল মেশানো চকচকে শাড়িটার মধ্যে শুধুমাত্র ব্রেসিয়ার। কোলের কাছে ওকে টেনে নিলাম—এরকম অনেকবারই নিয়েছি, শিবেও জানে, আর মঞ্জরী তো জানেই। আমি শিখাকে কখনো কিছুই দিইনি, কিন্তু ওকে প্রায়ই দিই, যা পারি জিনিসপত্র, কাপড়চোপড়, টাকা-পয়সা, যখন যা পারি, কিন্তু শিখাকে কোনদিন দিইনি। শিখা চায়নি আমিও দিইনি—ওকে কিছু দেবার কথা মনে হলেই আমার ঘাড়টা যেন কেমন বেঁকে যায়, 'না, থাক' এইরকম মনে হয়। মঞ্জরীকে দিই, ও চায়, ওকে আমি দিই, অনেকেই দেয়, শিখাকেও হয়তো অনেকে দেয়,আমি দিই না। মঞ্জরীকে আমি দিই, ও আমাকে দেয়, অথচ শিখাকে আমি দিই না, শিখা আমাকে দেয়, সেইজন্যে আমি ওদের মেলাতে পারি না, আমি কখনো মঞ্জরীকে মারতে পারি না, থাপ্পড় বা ওইরকম কিছু, কিন্তু শিখাকে মেরেওছি। মঞ্জরীকে আমার শুধু ডলতে পিষতে কাতুকুতু দিতে ইচ্ছা করে, শুতে ইচ্ছা করে, এখনো তাই করতে লাগলাম; ওর গা-টা ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা, জলে ভেজানো বলের মতন। ও এখন চান করে এসেছে, তাই বললো, 'এইমাত্র চান করে উঠেছি।' তা হোক, ওকে আমি আটকে রাখব না, এখুনি ছেড়ে দেব,—কিন্তু এই মেয়েটার এই এক বিচ্ছিরি, মুখে কী রকম উনুনের ছাই ছাই গন্ধ। তা হোক গে, ওকে কাঁথার ওপরে টানলাম। ও কী বুঝলো, বললো, 'দাঁড়ান,

দরজাটা দিয়ে আসি।'

তাই এল, আমি ওকে টেনে নিয়ে বললাম, 'তোমার ঠাণ্ডা গা-টা খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা, তুমি একটা বে-থা করতে পার না, মানে সাধারণ মেয়েরা যা করে—!'

মঞ্জরী বললো, 'দাঁড়ান, আমার চুলে টান লাগছে।'

চুলটা ছাড়িয়ে নিতে আবার বললাম, 'বে-থা করে ঘর-সংসার যদি কর।'

ও বললো, 'খুব খেয়েছেন নাকি ?'

'না। আচ্ছা, এখন সেটা তোমার পক্ষে খুব শক্ত, না ?'

'আমি একটু খেয়ে আসি, কেমন ? আড়াইটা বেজে গেছে।'

'আচ্ছা, যাও।'

আমার গা-টা যেন নরম হয়ে এলিয়ে পড়ে গেল, আর চোখটা বুজে কোথায় তলিয়ে যেতে লাগলাম, আর কী আশ্চর্য, দেখলাম, প্রজাপতিটা দেওয়াল ঘেষটে ঘেষটে পড়ছে, শিখা শব্দ করে উঠলো, 'ইস্ !'...



যখন চোখ মেলে চাইলাম, তখন একেবারে অন্ধকার। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না, উঠে বসলাম, আর তখনই বুঝতে পারলাম শিবেটার শ্মশান চাটাইয়ে শুয়ে আছি। এখান থেকে অন্ধকারে, আর একটা দালান পার হতে হয়, তবে উঠোন, অন্ধকারে যেতে পারব তো ! মঞ্জরীর নাম ধরে ডাকলাম, কেউ জবাব দিল না, তারপরে শিবের। তাও না। তখন শুনতে পেলাম, কে যেন শিবের নাম ধরে ডাকছে। গলা শুনেই চিনতে পারলাম শুটকা ডাকছে—আর ডাকতে ডাকতে ও একেবারে ঘরের কাছে এসে পড়লো, আর বলতে লাগলো, 'ধূ-র, ভূতের বাড়ি মাইরি, কেউ নেই !'

'আমি আছি।'

'কে, গুরু ?'

'হ্যাঁ।'

'আরে, আমি তো তাই দেখলাম, তোমার মোটরবাইকটা রয়েছে দরজার কাছে, অথচ কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।'

তখন শুটকার কথা আমার মনে পড়লো, ওকে আমি খুঁজেছিলাম, কেশবের লুকনো মালের কথা বলে দেবার জন্যে কিন্তু এখন ওর ওপরে আমার রাগ হচ্ছে না, কেন তা জানি না। মিথ্যা কথা তো বলেনি। শুটকা আবার বললো, 'সারাদিন কি এখানেই ছিলি ?'

'না, দুপুর থেকে।'

শুটকা ফস করে একটা দেশলাইয়ের কাটি জ্বালালো, আর এগিয়ে গিয়ে, একটা কুলুঙ্গিতে মোমবাতি ধরালো। ও সব জানে এ ঘরের। বললো, 'একটা দিশি রেখে গেছলাম, দেখি আছে না সেঁটে দিয়েছে!'

টিমটিমে আলো, আমাদের দুজনের ছায়া দুটোই ঘর জোড়া, তার মধ্যেই কোথা থেকে একটা বোতল টেনে বের করলো। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'খাবি?'

বোতলটা নিয়ে খানিকটা খেলাম। পেটটা কীরকম জ্বালা জ্বালা করে উঠলো, কিছু তো নেই পেটে। আরো খানিকটা খেয়ে, বোতলটা ওকে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ছিলি রে সারাদিন, দেখতে পেলাম না।'

যেন খেতেই ব্যস্ত, এইভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়ে বললো, 'বাড়িতেই।' মনে হল মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু আমার রাগ হল না। উঠে পড়ে বললাম, 'চলি। এদের বাড়িতে কেউ নেই নাকি? বোনেরা, ওদের মা?'

'কাউকে তো দেখতে পেলাম না। তুই এখন কোথায় যাবি গুরু?'

'বাড়ি।'

'চ', তোর সঙ্গে চলে যাই।'

শুটকার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম, ও পিছনে উঠলো, ডায়নামোটা অন্ করে এগিয়ে চললাম। রাস্তায় বেশ ভিড়, কাল তো হরতাল, তাই সবাই বাজার-টাজার করে নিয়ে যাচ্ছে, সিনেমাও নিশ্চয় বন্ধ থাকবে, তাই সেখানেও ভিড়, কালকেরটা আজই মিটিয়ে নিতে হবে।

শুটকা বলে উঠলো, 'বাড়ি যাবি বললি যে?'

তা-ই নাকি, কিন্তু আমি তো শিখাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছি, শিখাকে বলে এসেছিলাম, এবেলা যাব। হাত তুলে ঘড়ি দেখলাম, সোয়া আটটা। বললাম, 'শিখাদের বাড়ি যাব।'

'তবে আমাকে এখানেই নামিয়ে দে।'

ব্রেক কষে দাঁড়ালাম, আর তখনই দেখলাম, কেশব দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারজনের সঙ্গে। একবার কোনরকমে চোখাচোখি হতেই, চোখ দুটো সরিয়ে নিল ও। আর আমার মনে পড়লো, 'ওকে বলে দিও, ও সাপের গায়ে পা দিচ্ছে।'...রোয়াব! চোট্টা কোথাকার, বেশী বললে, আজই শহরের সব লোককে বলে দেব। ওর চোখ জ্বলছিল, আর তখন রমেশের চোখ দুটোও আমার মনে পড়ে গেল, গরীবদের নেতা। নিরাপদবাবুরা কিছু বলেন না কেন, ভয় পান, না কি ভাবেন, রমেশদের কথা ফাঁস করে দিলে তাঁকে বিশ্বাস করবে না? আচ্ছা, আসলে কেশবের আলমারি থেকে সেদিন মালের বোতল ফাঁক করেছিলাম বলে ওরকম চটে নেই তো! না, তা হলে শিখা বলতো।

শিখাদের বাড়ির ভিতরে গাড়িটা রেখে, বাইরের ঘরে দেখি, শিখা একলা বসে আছে। তার আগেই, কোথা থেকে যেন ডাক্তারের হাসি-কাশি মেলানো শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। বোধ হয় বেলাদির আসরে। শিখা

আমার দিকে চেয়েই চমকে উঠলো, বললো, 'এ কি, কোত্থেকে এলে ?'

আমি বসে পড়ে বললাম, 'কী জানি স্‌লা, মনে পড়ছে না।'

শিখা আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, আমার আপাদমস্তক দেখলো, যেন বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো, তারপরে জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়ি যাওনি তখন থেকে ?'

'না।'

শিখা বারে বারে আমার প্যান্টের দিকে তাকাতে, আমিও তাকালাম। বিচ্ছিরি, তাড়াতাড়ি বোতাম লাগালাম, খেয়ালই ছিল না। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় ছিলে ?'

'শুটকাদের বাড়ি।'

মিথ্যা কথা না বলে উপায় ছিল না, কারণ আমি জানি, শিবেদের বাড়ির কথা বললেই, মঞ্জরীর কথা ওর মনে হবে। অবিশ্যি জানি না, ও বিশ্বাস করলো কিনা, সেরকম ভাবেই তাকিয়ে রইলো, যেন বিশ্বাস করছে না, ও চোখ দুটো নামিয়ে রাখলো।

বললাম, 'বড্ড খিদে পেয়েছে।'

ও আবার অবাক হয়ে বললো, 'খাওনি সারাদিন ?'

'না।'

সেই মুহূর্তেই নাক কোঁচকালো, ঠোঁট কুঁচকে বললো, 'কাড়িখানেক মদ গিলে এসেছ দেখছি।'

'কিছু ভাল লাগছিল না।'

শিখা আমার দিকে একবার তাকিয়ে, ঘরের বাইরে চলে গেল, খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললো 'রুটি আর কুমড়োর তরকারি খাবে ?'

'খাব।'

'তবে একটু বস।'

বলে আমার হাতখানেক দূরের চেয়ারে বসলো। আমি শিখার দিকে চেয়ে কী যেন বলব বলব ভেবে বললাম, 'আমি শিবেদের বাড়িতে ছিলাম দুপুরে।'

বলে যেন নিজেই অবাক হয়ে গেলাম, আর শিখার ভুরু দুটো কেমন একরকম ওপর দিকে ঠেলে উঠলো, জিজ্ঞেস কবলো, 'কোন্‌টা সত্যি ?'

'এটা।'

'বলতে গেলে কেন ?'

'কী রকম খারাপ লাগছে।'

শিখা চেয়ে রইলো। এখন ওর চুলে বিনুনি, কালো আর চকচকে, বাসন্তী রঙের জামা, সবুজ একটা এমনি সাধারণ শাড়ি। কিন্তু ওবেলার মতন শুধু জামা না, নিচেও কিছু আছে। আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম, একটু পায়চারি করে হঠাৎ বললাম, 'জান শিখা, ছেলেবেলা থেকে-না, আমার-না, আমার কীরকম একটা ভয় ভয় ভাব আছে, আমি কোনদিন কারুকেই বলিনি, কীরকম একলা একলা থাকলে—মানে একা একা

লাগলে, বুক গুরগুরিয়ে ওঠা একটা ভয় হয়, তখন আমি চেঁচামেচি করি, যা-তা ...।'

শিখা যেন কীরকম অবাক হয়ে গেছে, আর শক্ত হয়ে বসে আছে। সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী হয়েছে ?'

আমি কীরকম একটা চাপ ফীল করছিলাম বুকের কাছে, তাই বুকের কাছে হাত রেখে শিখার সামনে এসে বললাম, 'জানি না, কিছু ভাল লাগছে না। আমি আজ চোপরার কাছে কাজ চাইতে গেছলাম, মানে চাকরি—শুয়োরের বাচ্চাটা কীরকম যেন প্রায় তাড়িয়েই দিল, মাইরি—আচ্ছা শিখা—!'

শিখা উঠে দাঁড়ালো, আর বুকের ওপর রাখা আমার হাতটার ওপরে ওর একটা হাত রাখলো, আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে তোমার বল তো ?'

আচ্ছা, কেন, শিখা আমার মুখের এত সামনে, মদের গন্ধ তো পাচ্ছে, বলছে না তো। যেন এখন ওর সেকথা মনেই নেই। আমি বললাম, 'আচ্ছা, আজ তুমি একলা কেন ?'

'আজ তো সবাই ব্যস্ত, কাল হরতাল, কেশবদাদেরও কী একটা আছে, আমার খুব খারাপ লাগছে, কাল একটা কাণ্ড না ঘটায়। কিন্তু শোন—।'

'আচ্ছা শিখা, আমি তো খুব খারাপ—তবু আজ আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি নিরাপদবাবু হয়ে যাই—তুমি হয়তো আমাকে—উহ্, শিখা, আমার ভীষণ বমি পাচ্ছে—।'

কিন্তু শিখা আমাকে ছাড়লো না, হাতটা ধরে তাড়াতাড়ি বাইরে টেনে নিতে গেল, বললো, 'চল, কুয়াতলায় চল।'

যেতে গিয়েও পারলাম না, শিখার গায়ের ওপরেই বমি করে ফেললাম—ভাবলাম, শিখা ছিটকে সরে যাবে। কিন্তু ও আমাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললো, 'এখানেই কর। ইস্, কেন এসব ছাইপাঁশ খাও, কী দুর্গন্ধ।'

'ওয়াক-ও-ও-ওয়াক্, শিখা, আমি তোমার গায়ে—ওয়াক্ ...।'

তখন আমি বসে পড়েই বমি করছি মেঝেতে। আর শিখা আমার ঘাড়ের কাছে হাত রেখেছে, বললো, 'আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি, উঠো না যেন।'

আমি মেঝেতে একটা হাত রেখে, শুধু মদ বমি করতে লাগলাম। মনে হল, কে যেন একবার এল, কার যেন একটা ছায়া পড়লো, আবার সরে গেল, তারপরেই শিখা এল, বেলাদিকে সঙ্গে নিয়ে। বেলাদির হাতে একটা জলের বালতি আর ঘটি। শিখা তখন একটা অন্য শাড়ি পরে এসেছে। জিজ্ঞেস কবলো, 'হয়েছে ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

ঘটি থেকে ও আমাকে জল ঢেলে দিল, আমি মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপরে ও জল-হাত দিয়ে আমার মুখে মাথায়, জামার কয়েক জায়গায়

বুলিয়ে দিল, বললো, 'যাও, বস গে ওখানে।'

বলেই, আবার আমার কোমরের বাঁ দিকে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কী ?'

আমি জবাব দেবার আগে, ও নিজেই আবার বললো, 'আবার তুমি ছুরিটা নিয়ে বেরিয়েছ। বারণ করেছি না ?'

এখন আর জবাব দিতে পারছি না, আসলে ওটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, সারাদিনই ওটা আমার কোমরে আছে, ওবেলা শিখা টের পায়নি। আমি উঠে গিয়ে চেয়ারে বসলাম।

পাখাটা খুলে দিল, আর দুজনেই জল দিয়ে বমি ধুয়ে পরিষ্কার করলো। বেলাদি তিনবার তিন বালতি জল নিয়ে এল, শিখা একটা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করলো। বেলাদি একবার বললো, 'কেন যে খাও।'

বেলাদি যেন আমাকে বললো না, হয়তো ওর বাবার বন্ধু সেই ডাক্তারকেই বললো, তবু বেলাদির বলাটা যেন কষ্টের মত। তারপরে শিখা এসে আবার বসলো, বেলাদি চলে গেল। আমি চেয়ারের পিছনে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছিলাম—এমন কিছু না, একটু দুর্বল লাগছিল। মাথাটা আস্তে আস্তে তুলে তাকালাম, দেখলাম, পাশে শিখা আর-একটা চেয়ারে বসে আছে, আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কী যে বলতে যাচ্ছিলাম, কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। শিখা জিজ্ঞেস করলো, 'খাবে বলছিলে ?'

'এখন আর খেতে পারব না। আমি বাড়ি যাই।'

'না, না, এখন না, একটু বস। এখন তুমি মোটর-সাইকেল চালাতে পারবে না।'

'পারব।'

'একটু বস-না।'

'আস্তে আস্তে যাব। শিখা—।'

'বল।'

কিছু না বলে, হাত বাড়িয়ে আমি ওর একটা হাত ধরলাম, তারপরে উঠে দাঁড়ালাম। শিখাও উঠলো। আমি ওর হাত ধরে বাইরে গেলাম, সেখানে অন্ধকার—বিশেষ করে এ বাড়িটার চার পাশেই, গাছপালার জন্যে অন্ধকার। বারান্দা থেকে নামবার সময়, তখনো ওর হাতটা ছাড়িনি, ও বললো, 'কাল বাড়ি থেকে বেরিও না, বলা যায় না, কী গোলমাল হবে।'

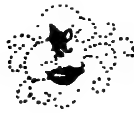
'বিকেলের দিকে টুক করে একবার তোমার কাছে চলে আসব।'

ও বললো, 'সত্যি চালিয়ে যেতে পারবে ?'

'পারব। এইমাত্র বমি করেছি—সত্যি, মদের গন্ধ, তবু একটা চুমু খেতে দেবে ?'

নিশ্চয়ই দেবে না, কিন্তু ঠোঁটটা অন্ধকারে এগিয়ে নিয়ে এসে, নিজেই খেল, বরং আমাকেই দিল না। গাড়িটা ঠেলতে আমার কষ্ট হল, তবু ঝাঁপের বাইরে নিয়ে গেলাম, ডায়নামো অন করে আস্তে আস্তে এগিয়ে

গেলাম, মনে হল, একবার যেন শিখাব গলা শুনতে পেলাম, 'সাবধান



মনে হয়, মোটরবাইক-এব এঞ্জিনেব সঙ্গে আমার রক্তের কী একটা মাখামাখি আছে, শব্দটা কানে গেলেই প্যাডেলে পা রাখলেই, মনে হয়, আমার শরীর-খারাপ বলে কিছু নেই. একেবারে ঈজি চলে যেতে পারি। তা হলেও. বুকের কাছটা কী রকম ঢকস ঢকস করছে, যেমন কোনো আলগা জিনিস ধাক্কা খেলে ঢকস্ ঢকস্ করে, সেই রকম। ওবেলা যে-রাস্তা দিয়ে ফিরেছিলাম, সে-ই রাস্তা ধরেই ফিরে চলি, এবার বাড়ি যেতেই হবে, আমাব চান করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আবাব—আবার সেই শিউবোনি ভাবটা ঘাড়ের কাছে শিবশিবিয়ে উঠছে, স্‌সাহ্, কী যে হচ্ছে! প্রায় সেই জায়গাটায় চলে এলাম, শহরের রাস্তাটা যেখানে সব থেকে চওড়া, ওবেলা রমেশ যেখানে গরীবদের উদ্ধার করছিল। এখানটায় শহরের দুটো বড় রেস্টুরেন্ট, সিনেমাটাও কাছে. তাছাড়াও বড় বড় দোকান, তাই এখানে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েই শহরের ছোঁড়ারা আড্ডা দেয়—এই আব কি মেয়েটেয়ে দেখা, টিকা-টিপ্পনি কাটা, হিড়িক মারা যাকে বলে আর কী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, রেস্টুরেন্টের সামনে বেঞ্চি পেতে বসে, একটু ব্যালা না করলে চলবে কেন, আমিও করি। কিন্তু বিজে ছোঁড়াটা আমার দিকে ওরকম তাকিয়ে আছে কেন, খালি তাকিয়ে না, হাসছেও যেন, হাসছে অথচ চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না, ব্যাপার কী। ওদের একটা নেড়ি মাস্তানের দল আছে, আসলে কেশবেরই ফাইফরমায়েস খাটে। এই—এই সেই জিনিস, আবার আমার ভয়ের গুবগুরোনিটা চেপে এল—না, ঘাড়ের শিউবোনি না, সেই ভয়, শিরদাঁড়ার কাছটা কী রকম করে ওঠা, যেটা হলেই হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চায়, কে যেন আমার ঘাড় মুচড়ে ধরতে আসে, মূর্ছা রুগীর মত মুখ গুজরে পড়ে যাবে হয়তো।...

মনে হতেই, রাস্তার ধারে, একেবারে পাঁচিলের পাশে, মোটরবাইকটা কোনরকমে থামিয়ে, ঠেকিয়ে রেখেই, প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে উঠলাম, আর বিজে—বিজয়টাকে ক্যাত করে একটা লাথি কষলাম, 'শুয়োরের বাচ্চা, বড় যে হাসি দেখছি।' বলতে বলতেই, ঘুষিও চালালাম, নাকে মুখে পেটে, আর সঙ্গে সঙ্গে এদের দলের দু-তিনটে নেড়িও ছুটে এল, 'খবরদার সুখেন' বলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আমি তখন কী যে করছি, নিজেই জানি না, ভয়ের ভাবটা কাটাবার জন্যে পাগলের মত হাত চালিয়েছি। আমার সেই চেহারাটা দেখে, বিজেদের নেড়ি দলটা প্রায় হকচকিয়ে যাবার মত, তবু পাল্টা দু-একটা ঘুষি আমার গায়ে লাগতেই,

ভয়ের ভাবটা যেন কেটে যেতে লাগলো, ভীষণ চিৎকার করে আমি আরো জোরে হাত চালালাম। এ সময়ে আমার দলেরও কেউ নেই, হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোমরে ছুরি আছে। মনে হতেই, সেটা টেনে বের করলাম, একটা নেড়িকে তার আগেই পাঁজরায় লাথি মেরেছি, বাকীরা দৌড়ুতে আরম্ভ করেছে। শুধু নেড়িগুলোই না, রাস্তার লোকেরাও দৌড়ুতে আরম্ভ করেছে। কে যেন 'খুন খুন' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, আর কয়েকটা দোকানের ঝাঁপ ঝপ ঝপ বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। আমি তখন ভয়ের ভাবটা একেবারে কাটিয়ে উঠেছি, আর ঠিক এ সময়েই আমার চোখে পড়লো রমেশ একলা দূর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে, ঠিক একটা ল্যাজ গুটানো কুকুরের মত। আসলে একলা বলেই ভয় পেয়েছে, ভেবেছে, গুণ্ডাটা চোখে পড়ে গেলে যদি ভুকিয়ে দেয়! 'কেন, এখন আয়!' মনে হল রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা, আর ট্রাফিকের জন্যে যে-সেপাইটা দাঁড়িয়েছিল, সে ছুটে এল আমার কাছে, বললো, 'এই সুখেনদা, কী করছেন, ছুরিটা রাখুন।' হ্যাঁ, এখন আর আমার কোন ভয় নেই। ছুরিটা বন্ধ করে, আস্তে আস্তে কোমরে গুঁজে রাখি, সেপাইটা তখনো বলতে থাকে, 'ওরা কখন চলে গেছে। যান চলে যান, থানায় খবর গেলে আবার ও· সি· আসবে, একটা হাঙ্গামা হুজুক ...।' ও বলেই যাচ্ছে, আর আমি মোটরবাইকটা সোজা করে, চেপে স্টার্ট দিই। এখন ভবসা পেয়ে, অনেকেই আড়াল-আবডাল থেকে বেরিয়ে আসে, ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়, স্সুখেন গুণ্ডাকে দেখছে সবাই। আমি বলতে থাকি, কিন্তু কি জানি, আমার যে কী রকম একটা হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। বিজে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসবে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে, সেটা টলারেট করতে পাবি না, কিন্তু আসলে তো আমার সেই ভয়ের কাঁপুনিটা লেগেছিল বলেই ওরকম করছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, আমি দুর্বল, হাঙ্গার-স্ট্রাইকের পরে যেরকম হয়েছিল, সেই রকম, অথচ তার সঙ্গে আরও একটা যেন কী হচ্ছে—কী একটা—কে জানে স্সাহ্, কেঁদেই ফেলব কি না। লাও, দেখ আবার কোথায় চলে এলাম। আবার সেই দয়ালদার দোকানেই। আসলে, সেই টাকাটার কথা ভুলতে পারিনি বলেই বোধহয় এসেছি, কিন্তু মদের কথাই তো বেশী মনে হচ্ছে। তা হলে বোধহয়, মদ খেতেই এসেছি।

এখানে, এ রাস্তার নিরিবিলি ভাবটা আমার এখন বেশ ভাল লাগছে, একটা লোকও দেখছি না, কেবল দয়ালদা টিমটিমে লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে রয়েছে, তার কাছেই বেঞ্চির ওপর একটা মেয়েমানুষ, শুনেছি দয়ালদা নাকি এ মেয়েমানুষটার সঙ্গেই সারা জীবন রয়েছে। বউ তো না, এ শহরেরই বেশ্যা ছিল, তারপরে দয়ালদার সঙ্গেই সারা জীবন—ছেলেপিলে কিছু নেই। রোজই সন্ধ্যেবেলা আসে, আর রাত্রে ঝাঁপ বন্ধ করে দুজনে একসঙ্গে ঘরে ফিরে যায়—কী জানি এদের স্বামী-স্ত্রী বলে কি না। মোটরবাইকটা দাঁড় করিয়ে বললাম, 'একটা পাঁট দাও তো দয়ালদা।' বললাম, কিন্তু দোকানের পিছনে, ঢালু বেয়ে, নদীর দিকে নেমে গেলাম।

নদীর ধারেই এ রাস্তাটা। দোকানের পিছনে একটা ভাঙা ঘাট আছে, সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না, ভাঙা ধাপের ওপর দিয়ে সাবধানে নামতে লাগলাম, আর প্রায় জলের কাছে গিয়ে, হঠাৎ একটা মানুষ দেখে, থম্‌কে দাঁড়ালাম। থম্‌কে দাঁড়াতে গিয়েই, একটা শব্দ হল, বসে-থাকা লোকটা আমার দিকে ফিরে তাকালো, আর তখুনি আমার বাঁ পা একটা গর্তে পড়ে যেতে, আমি হুমড়ি খেয়ে প্রায় লোকটার ঘাড়ের ওপর পড়লাম। লোকটা আমাকে পড়তে না দিয়ে ধরে ফেললো। আর একটু হলেই আমি জলে পড়ে যেতাম। এটাই সব চেয়ে নিচের ধাপ, আর না ধরলে, জুতোসুদ্ধ আমার পা মচকে যেত। লোকটা আমাকে বললো, 'বস একটু। মেলাই খেয়ে এসেছ মনে হচ্ছে।'

কে রে লোকটা, গলার স্বরটা অদ্ভুত, যাকে বলে ভরাট আর মোটা। তা ছাড়া, আরো একটা কী ভাব আছে যেন, যে-ভাবটা শুলাদার কথায় প্রায়ই ফুটে ওঠে। যেন—এই আর কী, একটা ভালবাসা-ভালবাসা ধরনের। মদের গন্ধটা ঠিক টের পেয়েছে, ভেবেছে আমি মাতাল বলেই পড়ে গেছি, কিন্তু পেটে তো মদের আর ম-ও নেই, সবই তো বমি হয়ে গেছে। রাস্তার ওপরে বুড়োদের চোখের মত যে টিমটিমে আলো ছিল, তাতেই আমি লোকটার মুখ দেখতে পেলাম, মনে হল, মুখটা ধুলোমাখা, পাতলা বড় বড় চুলগুলো উসকোখুসকো, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মস্ত বড় গোঁফ। চিনতে পারলাম, বচন, কারখানায় কাজ করে, পূর্ণেন্দুদের দলের লোক। আমি বসলাম না, দাঁড়িয়েই রইলাম খানিকক্ষণ, তারপরে জলের দিকে পা বাড়াতেই, বচন—বচন ক্যাওরা, লোকে তা-ই বলে ওকে, আমার হাতটা চেপে ধরলো। বললো, 'একটু বসই না স্থির হয়ে, এখুনি পেছল সিঁড়িতে পা দেবার কী দরকার, আবার পড়ে যাবে হয়তো।'

কথা শুনলে, এ লোকটাকে ঠিক দলবাজদের মত মনে হয় না, তার ওপরে আবার আমার সঙ্গে, যাকে ওরা শত্রু মনে করে। আর সত্যি বলতে কি, না কি, এও আমার সেই ভুতুড়ে বিদঘুটে ব্যাপারের মতই একটা কিছু। লোকটা যে আমার হাত ধরেছে, তার মধ্যে কেমন যেন একটা—কী বলব—একটা মন-টানা মন-টানা ভাব, ওই আর কি, ভালবাসাবাসি মত। ও যদি মেয়ে হত, আর বয়স কম হত, তা হলে এই হাত ধরাটা শিখার হাত ধরার মতই মনে হত বোধহয়। অথচ ও হচ্ছে পূর্ণেন্দুদের গরীব দলের লোক, আমাকে কেন ঘেন্না করছে না কে জানে! হয়তো ঘেন্নাই করছে মনে মনে, আসলে বুড়ো খচ্চরটা আমাকে ঠাট্টা করছে। আমি বললাম, 'তুমি তো আবার গরীব দলের নেতা?'

'নেতা?'

লোকটার কয়েকটা দাঁত নেই, শব্দ না করে হাসতে বোঝা গেল। যেন এমন মজার কথা সে কোনদিন শোনেনি। হাসিটাও এমন, লোকটাকে কেমন চালাক চালাক বিটলে বলে মনে হচ্ছে। বললাম, 'তোমরা তো মাতালদের ঘেন্না কর।'

'ঘেন্না করব ? কেন, আমিও তো মাল খাই, মাতাল হই।'

ওহ্ স্‌সাহ্, তাও তো বটে, অনেকদিন তো নিজের চোখেই বচনকে মাল খেতে দেখেছি। বললাম, 'তবে, গুণ্ডাকে তো ঘেন্না কর।'

'তা করি, সে তো তোমার গুণ্ডাদের সবাই ঘেন্না করে।'

'তবে আর কি, এবার আমাকে ছেড়ে দাও, আমিও তো গুণ্ডা।'

লোকটা এ কথার কোন জবাব দিল না। বলল, 'একটু বস না।'

খচরামি করছে নাকি আমার সঙ্গে। বললাম, আমি মাতাল না, মাল সব বমি করে ফেলেছি।'

'সেটা তো আরো খারাপ। খেলে, আবার পেটেও রাখতে পারলে না। তা হলে তো নদীর ধারে একটু বসাই ভাল, ভাল লাগবে।'

এ-সব, কথাবার্তা নেই, হুটাপুট পীরিত আমার ভাল লাগে না। 'নাহ্, ছাড়।'

হাত টানলাম, আশ্চর্য, লোকটা হাত ছাড়লো না, তেমনি করে হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, আর মনে মনে সন্দেহ হলেও, আমি যেন রাগ করতে পারছি না। আচ্ছা, লোকটা বোধহয় বোকা, নিশ্চয়ই বোকা, ভাবভঙ্গিটা বোকার মতই। একথা মনে হতেই আমি বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, পূর্ণেন্দু রমেশ বিম্‌লে, এরা তোমাদের দলের লিডার কেন।'

লোকটা খানিকক্ষণ একেবারে চুপচাপ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপরে সেইরকম বিটলে ভাবে হেসে বললো, 'ওরা লিডার হয়েছে, তা-ই।'

'ওরা আবার লিডার কিসের ? ওরা তো সব জুচ্চোর-ফেরেববাজ।'

'তবু, গরীবদের জন্যে বলে তো।'

'ও, বললেই নেতা ?'

বচন কোন জবাব দিল না, চুপ করে, আগের মতই খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর বললো, 'তোমার আবার এসব কথা কেন। তুমি অত বড়লোকের ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে, দাদাদের মত হলে না কেন।'

'কী জানি, আমি তা জানি না, ওদের সঙ্গে আমার মিল নেই। তুমি তো চাঁদ আমার কথার জবাব দিলে না। তার মানে ধোকা খেয়ে খেয়ে মগজে কিছু নেই।' বচন কয়েকটা দাঁত দেখিয়ে হেসে বললো, 'তা হবে। আমার তো দেখ, তিন পুরুষ কারখানায় কাজ করছি, তার আগে, ঠাকুর্দার বাপেরা শুয়োর চরাত—অই, কী আর বলব বল, অনেক তো দেখলাম, দিন এক রকম যায় না। গায়ে ঘা থাকলে একদিন সে ধরা পড়েই।'

আমার বলতে ইচ্ছা করলো, 'ইয়ে পড়ে', কিন্তু লোকটার গলার স্বরটা আর কথাগুলো এমন যে, সেরকম কিছু বলতে পারছি না, অথচ রাগ হচ্ছে এই ভেবে যে, এ যেন বচন ক্যাওরা না। একজন, কী বলে—জ্ঞানী সাধু-সন্ত। ধৃ-র স্‌সাহ্, হাতটা ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে, সাবধানে পেছল ধাপে নেমে চোখে মুখে জল দিই। দিয়ে, একবার অন্ধকার

নদীটার দিকে তাকাই, একটাও নৌকা নেই, একেবারে ফাঁকা, কোন শব্দ পর্যন্ত নেই, যেমন অন্য সময় ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ করে। আমার যেন মনে হয়, জলের তলায় কারা সব চুপিচুপি চলাফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। এইসময়ে যদি শিখা এখানে আসতো—আচ্ছা, মা কি এখানে কাছাকাছি বা জলের তলায়-টলায় কোথাও আছে। বাবার কথা আমার মনে পড়ে গেল—ঠিক বাবা যেন এইরকম অন্ধকার নদীর তলার লোক। আমি এবার বাড়ি যাব। ফিরে, উঠতে যাব, দেখলাম, বচন ক্যাওরা আমার দিকে ঠিক তেমনি চেয়ে আছে। আমি বললাম, 'তোমরা সব বোকা।'

বলে, উঠতে লাগলাম, আর বচনের যেন হাসি হাসি ভাবের কথা শুনতে পেলাম, 'তুমি আমাদের চেয়ে বেশী।'

সে কথার আর জবাব দিতে ইচ্ছা করলো না, লোকটা শুলাদার মত মনে হচ্ছে, ওর কাছে বেশীক্ষণ থাকা বা চোখে চোখ রাখতে ভাল লাগে না। ওপরে উঠেই মোটরবাইক-এ চেপে স্টার্ট দিলাম, দয়ালদা চেঁচিয়ে বললো, 'পাঁট বের করতে বললে যে?'

'না, খাব না।'

চলতে চলতে, প্রথমেই আমার মনে হল, না, ও স্‌লা চোপরার কারখানাতে আমি চাকরি করব না। আচ্ছা, আমি যা লেখাপড়া শিখেছি, তাতে যদি একটা গাঁয়ে গিয়ে প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারি করি, কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে, মাস্টারমশাইয়ের মত একটা জামা গায়ে দিয়ে—স্‌সাহ্‌, মারাত্মক হাসি পাচ্ছে মাইরি। নিজেকে ওরকম ভেবে, দারুণ হাসি পাচ্ছে, ঠিক যেমন বাঁদরনাচওয়ালাটা বাঁদরকে পায়জামা পাঞ্জাবী পরিয়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়, সেটা যেমন অদ্ভুত—সেই রকম। কিন্তু আমাদের বাড়ির রাস্তার মোড়ে, লোক তিনটে কে যে, বাইক-এর শব্দ শুনেও সরছে না। শেষটায় আমাকে দাঁড়াতেই হল। উহ্‌, শরীরটা ঢিলঢিল করছে, জিজ্ঞেস করলাম, 'কে রে?'

তিন জনেই ফিরে দাঁড়ালো। ওহ্‌ বাব্বা, বড়বাবু যে, দুজন পেটেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মানে আমার বড়দা কেশববাবু। আমি থামতেই, দুজন সরে গেল, কেশব আমার দিকে এগিয়ে এল। মতলব কী। উহ্‌রে বাব্বা, আমার মায়ের মত সুন্দর মুখ হয়েও, কেশবকে এখন ছুঁচোর মত দেখাচ্ছে। বললো, 'একটা সত্যি কথা বলবি?'

'কী?'

'চাল আর ফুডের কথা কার কাছ থেকে জেনেছিস তুই?'

ও, বাছাধনের ভাবনা ধরেছে, এমন সিক্রেট খবরটা আমি পেলাম কোথা থেকে। তাও আবার জানতে চাইছে আমার কাছ থেকে, অততো সহজ না চাঁদ। বললাম, 'যার কাছ থেকেই শুনি, তোকে বলব কেন?'

'আমাদের কেউ কী?'

সেটাই আমার—কী বলে, জ্যেষ্ঠ স্‌সহোদরের ভাবনা হয়েছে, সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে নাকি। বললাম, 'বলব না, যেতে দে।'

উ-উ—উ-স্লা, মুখখানি দেখ একবার, বিমলের থেকেও যেন বেশী দাঁত কড়মড় করছে। বললে, 'দ্যাখ্ টুকু, একটা কথা বলে দিই, ভাগ চাস তো দিতে পারি—একদিন তোকে আমার কাছে আসতেই হবে, তোর আর কোন ফিউচার নেই, কিন্তু যদি এভাবে—।'

আ রে লে লে, আমি গিয়ারটা হ্যাঁচকা ছেড়ে এগিয়ে চলে যাই, আর যেতে যেতেই বলি, 'বেশী পেঁয়াজি করিস না।' কিন্তু আমার ভিতরটা যেন কী রকম হয়ে গেছে, শুকিয়ে সব কাঠ। তবু কেমন যেন জ্বলছে শরীরটা--মনটাও, খচ্চর আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে। না, আমি একটা কথা জানতে চাই, রাজনীতির দল না-হয় একটা মন্দিরের মত—যেমন কেষ্ট বা বিষ্টু বা কালী, দুর্গা, যা হোক, আর লোকেরা তো তাদেরই চায়—মানে দেবতাকে—মানে আসল পাওয়া যেটা, কিন্তু পূজারীগুলো যেমন ভাব দেখায়, দেবতারা সব ওদের হাত-ধরা, ওদের চাল-কলা দিতে হবে, ওরা ঘণ্টা নাড়লেই ঠাকুর চোখ মেলে তাকাবে, তা-ই ওদের পুষতে হবে, ওদের কথা শুনতে হবে—অর্থাৎ দেবতা মানেই স্লা গজুরাম হরেরাম পূজারী। সে-ই সব। এইসব পূর্ণেন্দু কেশবরাও তা-ই যেন। যেমন পূজারীই মন্দিরের মালিক, সে-ই সব পাইয়ে দেয়, এ খচ্চরগুলোও সেই রকম, ওরাই যেন দলের সব। পূজারীর মন্দিরের মত দলটাও ওদের দখলে, ওরা যেমন মন্দির চালাবে, তেমনি চলবে। স্সাহ্, গোপালঠাকুর!



বাড়ি ঢুকে রান্নাঘরের কাছেই, ছোট ঘরটায়, যেখানে মোটরসাইকেলটা থাকে, রেখে বারান্দায় উঠে ঘরের দিকে গেলাম। তখনই বাবার কথা মনে পড়ে গেল, খোলা দরজা দিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে, আগেই সুইচটা অন্ করে দিলাম। বাবা অমনি বলে উঠলো, 'আহ্ নেভাও, নেভাও বলছি।'

'আচ্ছা, অন্ধকারে কেন বসে থাকেন, বলতে পারেন?'

'না, তুমি বাতি নেভাও।'

বলছে, কিন্তু তেমন রাগ রাগ ভাবে না, কখনোই আজকাল তা বলে না, কেবল দেখি চোখ দুটো, অবাক অবাক, চমকানো, যেন হঠাৎ কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে। আমি বললাম, 'আপনি মার কথা ভাবেন, না?'

'বাতি নেভাও আগে, কথা শোন।'

সুইচটা অফ্ করে দিলাম, বললাম, 'বলুন না, রোজ রোজ এরকম বসে থাকেন কেন?'

'ভাল লাগে।'

'অন্ধকারে?'

'হ্যাঁ।'

'মায়ের সঙ্গে কথা বলেন ?'

'জানি না। তুমি সারাদিন বাড়ি আসনি আজ ?'

'না, আমার ভাল লাগছিল না। আমি চাকরি খুঁজছি, জানেন !'

'তাই নাকি। তুমি চাকরি করতে চাও ?'

'চাই।'

'বেশ তো, তা হলে—'

'না, আপনার কাছে চাই না, নিজেই যোগাড় করে নেব। আপনি মেজদা বড়দা, আপনাদের কিছুই চাই না …। আমি যে কেন আপনার ছেলে, আর ওদের ভাই, কিছুই বুঝতে পারি না।'

বলতে বলতে আমি বেরিয়ে এলাম, বাবা যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, 'তুমি—।' থাক্ দরকার নেই, শুনতে চাই না, গুড্‌নাইট ! কিন্তু একটু মাল খেতে ইচ্ছা করছে, আগে মেজদার ঘরটাই দেখলাম, বাতি জ্বেলে, নাহ্, আলমারিতে তালা। তারপরে, বড়দার ঘরে—একই অবস্থা, স্‌সাহ্—খচ্চরগুলো সব বন্ধ করে রেখে গেছে।

ঘরে ঢুকেই শুয়ে পড়লাম। এমন কি জুতোও খোলা হল না, কিন্তু আমি চিত হয়ে শুতে পারলাম না, যেন কেমন সব ফাঁকা লাগছে। তাই বুকটা মুখটা বিছানায় খুব জোরে চেপে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালিনি, দরজাটাও খোলাই রইল। এ সময়ে শুলাদা এল, গায়ে হাত দিয়ে বললো, 'ছোট খোকা, খেতে চল।'

'না।'

'সারাদিন খাওনি, এখন আবার—'

এ লোকটা নিশ্চয় আমার মাকে মনে মনে পুরুষের মত ভালবাসতো, কথাটা এখন আমার আবার মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি পা দাপিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'না, বলছি ঘুম পাচ্ছে, উঠতে পারছি না।'

টের পাই, একটু পরেই শুলাদা চলে গেল। কিন্তু সত্যি আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, আর শিখার মুখ দেখতে পাচ্ছি, 'আমাকে একটা চুমো দেবে।'…

পরদিন ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা তুলে নিতে দেখি, এগারোটা বেজে গেছে। এখন মনে পড়ছে, কাল শুলাদা খাবার জন্যে যেন ডাকাডাকি করেছিল, কী জানি, ওকে বকেছি না মেরেছি, কী করেছি। তারপরেই শিখার কথা মনে পড়লো, তারপরে মনে পড়লো আজ হরতাল আর বড়বাবুদেরও কী একটা পেরকাশ্য অধিবেস্‌সন।

উঠে চান করে, খেয়ে, আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখলাম, পাঁচটা বাজে। বড়বাবু মেজবাবু যে কখন এলেন খেলেন কিছুই জানি না। প্যান্ট জামা পরে, মোটরবাইকটা নিয়ে বেরুলাম, এখন শিখার কাছে যাব।

আমাদের গলিটা থেকে বেরিয়ে, বড় রাস্তা দিয়ে খানিকটা উত্তরে যেতেই মোড়ের কাছে এসে দেখি, দু দিক থেকে দুটো মিছিল আসছে। আমি থেমে গেলাম। মোটরবাইকটা সরিয়ে নিয়ে, একটা দোকানের বারান্দায় দাঁড়ালাম, আর এতক্ষণে আমার খেয়াল হল, রাস্তায় প্রায় লোক নেই, গাড়ি ঘোড়া নেই, দোকানপাট সব বন্ধ, সব যেন শ্মশানের মতন খা খা করছে। আমার সামনের রাস্তাটা দিয়ে—মানে পুবদিকের রাস্তাটা দিয়ে মেজদাদের মিছিল আসছিল, আর উত্তর দিক থেকে বড়দাদের। দু দলই এমন জেদের গলায় চিৎকার করছিল, নিশ্চয় মোড়ে মাথায় এসে একটা কিছু করবে। আর কী আশ্চর্য, ওরা আসছে যেন, সমান সমান দূর থেকে, যেন মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। দু' দলেই মেলা পোস্টার ফেস্টুন নিশান। কেউ নেই, আমি কী করব, দাঁড়িয়ে দেখব নাকি। রমেশের মুখটা তখন আমি দেখতে পেয়েছি, আর ওদিকে কিষেণ, ওদের চোখ জ্বলছে। কারা যে কোনদিকে যাবে, বুঝতে পারছি না, আমার ঘাড়ের কাছে সেই জায়গাটা শিরশির করছে, অনেকগুলো চোখকে যেন আমি জ্বলতে দেখছি আমার দিকে, যেন আমাকে ছিঁড়ে খাবে। বড়দা মেজদা কোথায়। মিছিলের মধ্যে নাকি। ওরা প্রায় মুখোমুখি এসে গেছে, আমি নেমে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইলাম—আচ্ছা, ওরা যাক, তারপরে যাব। কিন্তু ওদের মধ্যে কীরকম কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে, আর ঠিক তখনই, কোথা থেকে একটা আধলা ইঁট আমার মাথায় এসে পড়লো। কে যেন বললো, 'মার্ ওকে।' দেখতেই পেলাম না, কারা মারামারি করছে, কারণ আমার মাথা ফেটে চোখের ওপর দিয়ে রক্ত পড়ছিল, আমি দোকানের দরজায় হেলান দিলাম, বোধ হয় আবার সেলাই করতে হবে—কিন্তু আহ্, আমি খালি একটা আগুনের ঝিলিক দেখলাম চোখের সামনে, আর কান ফেটে যাওয়া একটা শব্দ। মনে হল, একটা ঝটকা লাগলো, আর ডানদিকের কী যেন একটা হালকা হয়ে গেল আমার শরীর থেকে, ডান চোখ দিয়ে একবার এক পলকেই দেখে বুঝলাম, আমার ঘড়ি-পরা ডান হাতটা নর্দমায় পড়ে গেল। কারা মারলো—আচ্ছা সেই প্রজাপতিটার কথা আমার মনে পড়লো, চোখে ভাসছে, সিল্ক নীলাম্বরী, রুপোলী ফুটকি ফুটকি—শিখার সেই শাড়িটার মতন, কে দিয়েছিল ...! বুঝতে পারছি, পড়ে গিয়েছি বারান্দার ওপরে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আর, শিখাকে বলেছিলাম, আজ বিকালে—আর ও বলেছিল, 'কাল বাড়ি থেকে বেরিও না', আমি বলেছিলাম, 'টুক করে একবার তোমাকে দেখে যাব' ... উহ্ স্‌সাহ্, কী একটা কষ্ট—কিছুই ভাবতে পারছি না ... কিছুই না...।

কী ? কী ? কীরকম যেন বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে চোখে কিছু বাঁধা, আর একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধও পাচ্ছি, আর গোটা শরীরটা যেন একটা টনটনে ফোড়ার মতন। বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি, 'তুমি বলতে চাও তোমার দল মারেনি ?'

'না। আপনি নিকুকে জিজ্ঞেস করুন, ওরাই টুকুকে বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। তা নইলে আমি হাসপাতালে আসতাম না।'

মেজদার গলাও শোনা গেল, 'হাসপাতালে তো আমিও এসেছি। টুকুকে তোরাই তো মেরেছিস।'

ওরা আমাকে এখনো 'টুকু' বলছে—মানে আমি তো সত্যি ওদের ভাই।

তারপরেই আশ্চর্য—আশ্চর্য, আমি শিখার গলা শুনতে পেলাম, মাইরি, শিখা বলছে, 'থাক, এসব প্রসঙ্গ থাক কাকাবাবু। এদের যেতে বলুন, টুকুর এখনো জ্ঞান হয়নি।'

টুকু! শিখা আমার নাম ধরে বলছে, আমি শিখাকে ডাকতে চাইলাম, কিন্তু কোন শব্দ করতে পারছি না। শুনতে পেলাম, বাবা বলছে, 'টুকু খুব খারাপ ছিল, মানি, কিন্তু—কিন্তু—।'

শিখার গলা শোনা গেল, 'কাঁদবেন না কাকাবাবু।'

উহ্‌রে বাব্বা, বাবা কাঁদছে, কিন্তু আমি শিখাকে ডাকছি, শব্দ করতে পারছি না। তারপরেই হঠাৎ শিখা বলে উঠল, 'ডাক্তারকে ডাকা দরকার, মনে হচ্ছে জ্ঞান হয়েছে, কী রকম শব্দ হচ্ছে গলায়।'

ছাই হচ্ছে, আমি তো তোমাকেই ডাকছি, তোমাকেই, শিখা শিখা শিখা। হঠাৎ মনে হল, আমার ঠোঁটের কাছে যেন কিছু ছুঁয়ে গেল, ছুঁয়েই রইল, আমি টের পেলাম, শিখার আঙুল, আমার রক্ত জানে। তখন সব ভুলে আমি হাত তুলতে গেলাম, ডান হাতটা—কিন্তু কিছুই সেখানে আছে বলে মনে হল না, আর তখন সেই ঘড়িসুদ্ধ ডানহাতটা নর্দমায় পড়ে যাবার কথা আমার মনে পড়লো। আরে, এটা কার মুখ, মায়ের নাকি—হ্যাঁ, তাই তো—আরে, মায়ের পাশে একটা জ্যান্ত লোক, সেই বচন ক্যাওরার মুখটাও দেখতে পাচ্ছি যেন, কী রে বাবা! শিখার গলা আবার শুনতে পেলাম, 'কোথায় যে একটু হাত দেব, বুঝতে পারছি না—ওকে কত বারণ করেছিলাম না বেরুতে।' এই কথা শুনেই প্রজাপতিটার কথা আমার মনে পড়ে গেল—কী আছে বাপু, আমি জন্মেছি, আমার খাবার আমিই খুঁজে নেব—ওই প্রজাপতিটার মনের কথা বলছি—যেন আমিও ওইরকমই কাল ভাবছিলাম—আমি ঠিক আমার মতই, বাঁচব, খাবার খুঁজে খাব—মানে, প্রজাপতির যেমন দু'বার জন্ম হয়, আমারও সেইরকমই হবে—আমি—অন্য মানুষ হব—এই ছেলেটা আর না, শিখা যেমন চেয়েছিল, সেইরকম।—কিন্তু, 'তুমি রাক্ষস'। শিখার কথাটা মনে পড়ে গেল। শিখা তখন বলেছিল, আজ যেমন আমাকে মার খেতে হল, হয়তো মরব, কেননা, আমিও বোধহয় একটা ছেউটি ছুঁড়ির মতই ছটফট করছিলাম। উহ্‌ এত করে যে ডাকছি, ও জানতেও পারছে না। কেন, জানতে পারছে না কেন। শিখার গলা আবার শোনা গেল, 'উহ্‌, কাকাবাবু, ওর সারা গায়ে মাথায় বড্ড কাঁচা রক্ত উপচে আসছে। কী রকম গোঙাচ্ছে।

কিন্তু শিখা, এত করে তোমাকে ডাকছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ না নাকি। দেখছ, আর পারছি না ডাকতে, আর ডাকতে পারছি না। আমি শুধু ওর চুড়ির শব্দ পাচ্ছি, ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্।... শিখা, হাতটা সরিয়ে নিও না, কোথাও যদি হাত রাখবার জায়গা না থাকে, তবে রক্তেই রাখ, রক্তেই রাখ-না না-হয়, সেই প্রজাপতিটা পায়ে চেপটে যাবার পরে কুয়াতলায় গিয়ে পা ধুয়ে ফেলার মত হাত ধুয়ে ফেলো। শিখা—তোমার পা দুটো তখন কী রকম ঠাণ্ডা ছিল। শিখা, হাত সরিও না।...